সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

অনুবাদ : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
সম্পাদনা : আবদুস শহীদ নাসিম
মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম

শতাব্দী প্রকাশনী

শ: প্র: ৪৪

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ISBN 984-645-004-0

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ ওয়ারলেস রেলগেইট

বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭

ফোন ৮৩১১২৯২

সম্পাদিত নতুন সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ২০০২

শব্দ বিন্যাস

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

৪৩৫/এ-২ বড় মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট

ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৯৩৪২২৪৯

মুদ্রণে

আল্ ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড

মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

নির্ধারিত মূল্য : ৭০.০০ টাকা মাত্র

শতাব্দী প্রকাশনী

Islam O Paschatto Sabhotar Donda By Sayyed Abul A'la Maudoodi, Published by Shotabdi Prokashani, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy, 491/1 Elephant Raod, Bara Moghbazar, **Dhaka-1217**, Phone : 8311292, Edition : Dec. 2002, Fixed Price : 70.00 Only.

আমাদের কথা

ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব গ্রন্থটি পাঠক মহলে ব্যাপক পরিচিত ও বিপুল সমাদৃত। গ্রন্থটি মূলত বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক ইমাম আবুল আ'লা মওদূদী (র.) প্রণীত চিন্তার রাজ্যে ঝড় সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'তানকীহাত'-এর বংগানুবাদ। 'তানকীহাত' মানে - অনুসন্ধান, পরিষ্কার করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা প্রদান করা। এ গ্রন্থে সাইয়েদ মওদূদী (র.) :

১. মুসলমানদের দুর্দশার কারণ ও তার প্রতিকার অনুসন্ধানের ফলাফল তুলে ধরেছেন।

২. ইসলামের উপর যেসব বিভ্রান্তি ও ভ্রান্ত ধারণা আরোপ করা হয়েছে, সেগুলো থেকে ইসলামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও অনাবিল করে পেশ করেছেন।

৩. ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসরণ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নই যে মুসলিম উম্মাহকে যাবতীয় দুর্দশা, লাঞ্ছনা ও অধো:পতন থেকে মুক্তি দিতে পারে, কুরআন সুন্নাহর অকাট্য দলিল ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে সেই মীমাংসা পেশ করেছেন।

এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এটি মুসলমানের সুপ্ত ঈমানকে দীপ্ত করে তোলে, ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করে তোলে, মুমিনের হৃদয়কে সকল প্রতিকূল অবস্থায়ও আল্লাহর পথে চলতে ব্যাকুল করে তোলে। এ গ্রন্থ মর্দে মু'মিনকে বাধার বিন্দাচল, ঘাতক জগদ্দল, হিংস্র অরণ্য আর অকূল সমুদ্র পাড়ি দেবার মতো দু:সাহসী করে তোলে।

এ গ্রন্থে পাশ্চাত্য সভ্যতার পলিশ করা খোলস খসিয়ে দিয়ে তার কুৎসিত চেহারাকে উন্মুক্ত করে রেখে দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

এতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ত:সারশূণ্যতা এবং ইসলামের শক্তিমত্তার সন্ধান দেয়া হয়েছে।

গ্রন্থটি অতীতেও যেমন সত্য সন্ধানী বিদগ্ধ পাঠকদের তীর্যক চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করেছে, এখনো তেমনটি করবে বলে আমরা আশা রাখি। যারা Samuel P. Huntington-এর The Clash of Civilizations গ্রন্থটি পড়েছেন, তাদেরকে অনুরোধ করবো তারা যেনো সেই সাথে এই গ্রন্থটিও পাঠ করেন। আমরা আশা করি এর ফলে তারা একটি বিশেষ উপলব্ধি অর্জন করবেন এবং নিজেদের ব্যাপারে একটি নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন।

১৯৬৫ সালে গ্রন্থটি প্রথম বংগানুবাদ হয়। এরপর ৪/৫ বার প্রকাশও হয়। এবার আমরা গ্রন্থটি প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমি ঢাকা।

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১.	মুসলমানদের মানসিক গোলামি ও তার কারণ	৭
২.	উপমহাদেশে ইসলামী সভ্যতার বিপর্যয়	১৮
৩.	আধুনিক কালের ব্যাধিগ্রস্ত জাতিসমূহ	২৪
৪.	মানবীয় আইন বনাম আল্লাহ্র আইন	৩২
৫.	পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মহত্যা	৪৩
৬.	পাশ্চাত্য সভ্যতার আর্তনাদ (লর্ড লোথিয়ানের ভাষণ)	৫৩
৭.	তুরস্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাত	৬৪
৮.	যুক্তিবাদের প্রতারণা (এক)	৭৪
৯.	যুক্তিবাদের প্রতারণা (দুই)	৮৬
১০.	প্রগতিবাদের ফাঁকা বুলি	৯৫
১১.	জাতীয় পুনর্গঠনের সঠিক পন্থা	১০৮
১২.	বিদ্রোহের আত্মপ্রকাশ	১১৬
১৩.	সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ ও বাঁচার উপায়	১২৫
১৪.	ঈমান ও আনুগত্য	১৩৫
১৫.	মুসলমান শব্দের প্রকৃত মর্ম	১৪১
১৬.	মুসলমানদের শক্তির আসল উৎস	১৫১
১৭.	ধর্ম বীর পুরুষের জন্যে, কাপুরুষের জন্যে নয়	১৬২
১৮.	ব্যাধি ও তার প্রতিকার	১৭১

بسم الله الرحمن الرحيم

১

মুসলমানদের মানসিক গোলামি ও তার কারণ

রাষ্ট্রশাসন, বাদশাহী এবং বিজয় ও আধিপত্য দু'প্রকার : প্রথমটি মানসিক ও নৈতিক আধিপত্য, আর দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক ও বস্তুগত। প্রথম শ্রেণীর আধিপত্য হলো, কোনো জাতি যখন চিন্তা, গবেষণা আবিষ্কার ও মানসিক শক্তিতে বিপুলভাবে উন্নতি লাভ করে, তখন অন্যান্য জাতি স্বভাবতই তার চিন্তাদর্শের প্রতি ঈমান পোষণ করে। তার ধ্যান-ধারণা, ধর্মবিশ্বাস ও মতাদর্শ তাদের মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলে; তারই ছাঁচে তাদের মানসিকতা গড়ে উঠে। তার সভ্যতাই তাদের আপন সভ্যতায় পরিণত হয়। তার জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই তারা নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করে নেয়। এমনকি, তার ভালোমন্দ ও সত্যাসত্যই তাদের কাছে ভালোমন্দ ও সত্যাসত্যের মানদন্ড বলে বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার আধিপত্য হলো, কোনো জাতি যখন বস্তুগত সমৃদ্ধির দিক থেকে অতীব শক্তিশালী হয়, তখন তার মোকাবিলায় অন্যান্য জাতি নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সামগ্রিকভাবে কিংবা আংশিকভাবে অন্যান্য জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর জেঁকে বসে।

পক্ষান্তরে গোলামি বা পরাধীনতাও দু'প্রকার : প্রথমটি মানসিক আর দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক। উপরে আধিপত্য প্রসঙ্গে দু'টো শ্রেণীর যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, গোলামির এ দু'টো শ্রেণী ঠিক তার বিপরীত।

এক হিসেবে আধিপত্যের এই দু'টো শ্রেণী সম্পূর্ণ আলাদা। কোথাও মানসিক প্রাধান্য বিস্তৃত হলে রাজনৈতিক আধিপত্যও প্রতিষ্ঠিত হবে, এমনটি অনিবার্য নয়। কিংবা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে মানসিক প্রাধান্যও কায়েম হয়ে যাবে, এরও কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। তবে প্রকৃতির নিয়ম এই যে, কোনো জাতি চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা এবং জ্ঞান সাধনা ও তথ্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হলে, মানসিক উন্নতির সাথে সাথে বৈষয়িক অগ্রগতিও সে অর্জন করে। পক্ষান্তরে কোনো জাতি চিন্তা ও জ্ঞান-গবেষণার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়লে মানসিক অবনতির সাথে সাথে তার বৈষয়িক অধ:পতনও শুরু হয়ে যায়। পরন্তু আধিপত্য, শক্তিমত্তা আর পরাধীনতা দুর্বলতার পরিণতি বিধায় মানসিক ও বৈষয়িক দিক থেকে দুর্বল ও নির্বীর্য জাতিগুলো তাদের দুর্বলতা ও নির্বীর্যতার পথে যতো এগিয়ে চলে, সেই অনুপাতেই তারা গোলামি ও পরাধীনতার শিকার হতে থাকে; আর এই উভয় দিক থেকে শক্তিমান জাতিগুলো তাদের মন-মগজ ও দেহ-সত্তার ওপর কর্তৃত্বশীল হয়ে বসে।

আজকের দিনে মুসলমান এই দ্বিবিধ গোলামিরই শিকার। কোথাও উভয়বিধ গোলামি পুরোপুরি বর্তমান, আবার কোথাও রাজনৈতিক গোলামি কিছুটা কম হলেও মানসিক গোলামি সমধিক। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে কোনো মুসলিম জনপদই সত্যিকারভাবে রাজনৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে পুরোপুরি স্বাধীন নয়। কোথাও তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করলেও নৈতিক ও মানসিক গোলামি থেকে আদৌ মুক্ত নয়। তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, হাট-বাজার, সভা-সমিতি, ঘরবাড়ি, এমনকি তাদের আপন দেহ পর্যন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তাদের ওপর পুরোমাত্রায় কর্তৃত্বশীল। তারা পাশ্চাত্যের মগজ দিয়ে চিন্তা করে, পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে দেখে, পাশ্চাত্যের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলে। তারা উপলব্ধি করুক আর নাই করুক তাদের মগজের ওপর এই ধারণাই চেপে রয়েছে যে, পাশ্চাত্য যাকে সত্য মনে করে, তা-ই সত্য, আর সে যাকে মিথ্যা ঘোষণা করছে, তা-ই মিথ্যা। তাদের মতে সত্যতা, যথার্থতা, সভ্যতা, নৈতিকতা, ভদ্রতা, শালীনতা ইত্যাদি ব্যাপারে পাশ্চাত্যের নির্ধারিত মানদন্ডই হচ্ছে একমাত্র নির্ভুল মানদন্ড। এমনকি, নিজেদের দীন ও ঈমান, চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা, সভ্যতা ও শালীনতা, চরিত্র ও রীতিনীতি, সব কিছুই তারা ঐ মানদন্ডে যাচাই করে। যে জিনিস এই মানদন্ডে পুরোপুরি উত্তীর্ণ, তাকেই তারা যথার্থ বলে মনে করে; তার সম্পর্কে তারা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে যায় এবং জিনিসটি পাশ্চাত্য মানদন্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে গর্ববোধ করে। আর যা কিছু এই মানদন্ডের বিচারে উত্তীর্ণ নয়, তাকে তারা সচেতনভাবে হোক কি অচেতনভাবে - ভ্রান্ত বলে মনে করে। কেউ তাকে প্রকাশ্যে বর্জন করে, কেউ মনে মনে বিরক্তি বোধ করে এবং কোনো রকম টেনে হিচড়ে তাকে পাশ্চাত্য মানদন্ডে উতরিয়ে নেবার চেষ্টা করে।[১] আমাদের স্বাধীন জাতিগুলোর অবস্থাই যখন এই, তখন পাশ্চাত্য জাতিগুলোর অধীনস্থ মুসলমানদের মানসিক গোলামির কথা আলোচনা করে আর কি লাভ?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই গোলামির কারণ কি? এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে হলে একটি আলাদা গ্রন্থই রচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে সংক্ষেপে বললে তা নিম্নরূপ দাঁড়ায়ঃ

মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় চিন্তা-গবেষণা ও জ্ঞান সাধনার ওপর। যে জাতি এ পথে অগ্রগামী, সে-ই দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন অলঙ্কৃত করে; তার চিন্তাধারাই গোটা দুনিয়াকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পক্ষান্তরে যে জাতি এক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকে, তাকে স্বভাবতই অন্যের অনুবর্তী ও অনুসারী হয়ে থাকতে হয়। তার চিন্তাধারা ও মতাদর্শে লোকদের মস্তিষ্কের

---

১. গ্রন্থকার এ মন্তব্য করেছেন আজ থেকে ৪১ বছর আগে। এ দীর্ঘ সময়ে মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক গোলামি কিছুটা শিথিল হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের মানসিক গোলামি হ্রাস পায়নি এতোটুকুও। - সম্পাদক

ওপর আধিপত্য বিস্তার করার মতো কোনো শক্তিই বাকী থাকেনা। জ্ঞানসাধক ও সত্যানুসন্ধিৎসু জাতির শক্তিশালী চিন্তা ও মতবিশ্বাসের বন্যা-প্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবার মতো শক্তি-সামর্থ্য পর্যন্ত তার মধ্যে বর্তমান থাকেনা। মুসলমানরা যতোদিন সত্যানুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান সাধনার পথে অগ্রসর ছিল, ততোদিন দুনিয়ার সকল জাতি তাদের অনুসরণ ও অনুবর্তন করে চলছে। ইসলামী চিন্তাধারা সমগ্র মানব জাতির চিন্তা-দর্শনকে আচ্ছন্ন করেছিল। ভালো-মন্দ, সুকৃতি-দুষ্কৃতি, ভ্রান্তি-অভ্রান্তি সম্পর্কে ইসলামের নির্ধারিত মানদন্ড - সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানে - সমগ্র দুনিয়ার কাছে একমাত্র মানদন্ড হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। আর দুনিয়ার লোকেরা কি ইচ্ছায়, কি অনিচ্ছায় - তাদের চিন্তাধারা ও কর্মকান্ডকে সেই মানদন্ডের আদলেই গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে চিন্তানায়ক ও গবেষকের আবির্ভাব যখন বন্ধ হয়ে গেলো, তারা ত্যাগ করলো চিন্তা-ভাবনা ও সত্যানুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞান-সাধনা ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে ক্লান্ত হয়ে পড়লো, তখন তারা দুনিয়ার নেতৃত্ব থেকেই যেনো অবসর গ্রহণ করলো। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জাতিগুলো এই সকল ক্ষেত্রেই দ্রুতবেগে এগিয়ে চললো। তারা চিন্তা-গবেষণার শক্তিকে কাজে লাগালো; বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে আত্মনিয়োগ করলো; প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিগুলোর উৎস সন্ধান করলো। এর অনিবার্য পরিণতি যা হবার তা-ই হলো। পাশ্চাত্য জাতিগুলো দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন দখল করে বসলো। এক সময় যেভাবে দুনিয়ার লোকেরা মুসলমানদের কর্তৃত্বের সামনে নতি স্বীকার করেছিল, তেমনি তাদেরকেও পাশ্চাত্য জাতিগুলোর কর্তৃত্ব মেনে নিতে হলো।

চার-পাঁচ শতক পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের পূর্ব পুরুষদের বিছানো সুখশয্যায় অঘোরে ঘুমাচ্ছিল, আর পাশ্চাত্য জাতিগুলো ছিলো নিজেদের উন্নয়নের কাজে লিপ্ত। এরপর সহসা পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর অভ্যুত্থান ঘটলো এবং মাত্র এক শতকের মধ্যেই তারা গোটা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়লো। ঘুমের ঘোরে চোখ মেলে তাকিয়েই মুসলমানরা দেখতে পেলো, খ্রীস্টান ইউরোপ লেখনী ও তরবারি উভয় দিক থেকেই সুসজ্জিত; আর এই দ্বিবিধ শক্তির সাহায্যেই তারা গোটা দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। একটি ক্ষুদ্রাকৃতির দল এর মোকাবিলায় প্রতিরক্ষার চেষ্টা করলো; কিন্তু তার না ছিলো লেখনীর শক্তি, আর না ছিলো তরবারির তেজ। ফলে তারা শুধু পরাজয়ই বরণ করতে লাগল। জাতির বাকী অংশ অর্থাৎ সংখ্যাগুরু দলটি যে কর্মনীতি অবলম্বন করলো, দুর্বল ও কাপুরুষরা চিরকাল তা-ই করে থাকে। তরবারির তেজ, যুক্তির বল, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণের সমর্থন এবং চোখ ধাঁধানো রূপ-সৌন্দর্যসহ যে ধ্যান-ধারণা, মাতাদর্শ ও রীতিনীতি পাশ্চাত্য থেকে এলো, আরামপ্রিয় মস্তিষ্ক ও পরাভূত মানসিকতা তাকে একেবারে ঈমানের মর্যাদা দিয়ে বসলো। যেসব পুরনো ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক আই-কানুন নিছক গতানুগতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, এই নতুন ও শক্তিশালী বন্যার স্রোতে তা খড়কুটোর মতো ভেসে গেলো। আর চেতনাহীনতার এ পথে লোকদের মন-মগজে এই

ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, পাশ্চাত্য থেকে যা কিছু আসে তা-ই সত্য এবং **তা-ই হচ্ছে** সত্যতা ও বিশুদ্ধতার একমাত্র মানদন্ড।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে অন্য যেসব জাতির সংঘর্ষ হয়েছে, তাদের কারো কারো তো স্থায়ী ও স্বতন্ত্র কোনো সভ্যতাই বর্তমান ছিলোনা। কারো কারো কাছে একটা স্বতন্ত্র সভ্যতা ছিলো বটে, কিন্তু তা অন্য সভ্যতার মোকাবিলায় আপন স্বাতন্ত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখার মতো শক্তিশালী ছিলোনা। আবার কারো কারো সভ্যতার সাথে এই নবাগত সভ্যতার তেমন কোন মৌলিক পার্থক্যই ছিলোনা। ফলে এই সকল জাতি অতি সহজেই পাশ্চাত্য সভ্যতার রঙে রঙিন হয়ে গেলো এবং কোনো বড় রকম সংঘর্ষেরই প্রয়োজন দেখা দিলনা। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপারটা ছিলো তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এরা একটি স্থায়ী, স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার অধিকারী। এদের সভ্যতার একটি নিজস্ব ও পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-নীতি ও বিধি-ব্যবস্থা চিন্তা ও কর্ম উভয় দিক থেকেই জীবনের তামাম বিভাগের ওপর পরিব্যাপ্ত। পাশ্চত্য সভ্যতার মূলনীতি ও ভিত্তি সম্পূর্ণ এই সভ্যতার পরিপন্থী। এ কারণেই প্রতি পদক্ষেপে এই দু' সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দানা বেঁধে উঠেছে। আর এই সংঘাতের ফলে মুসলমানদের চিন্তা-বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে।

যে দর্শন ও বিজ্ঞানের কোলে পাশ্চাত্য সভ্যতা লালিত হয়েছে, পাঁচ-ছয় শতক ধরে তা শুধু নাস্তিকতা, ধর্মদ্রোহিতা ও বস্তুবাদের পথেই এগিয়ে চলেছে। এই সভ্যতা যেদিন জন্মলাভ করেছে, ঠিক সেদিন থেকেই ধর্মের সাথে এর সংঘাত শুরু হয়েছে; বরং বলা যায়, ধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তি ও বুদ্ধির সংঘাতই এই সভ্যতার জন্মদান করেছে। যদিও বিশ্বপ্রকৃতির নিদর্শনাদির পর্যবেক্ষণ, তার বিচিত্র রহস্যের উদ্‌ঘাটন, তার অন্তর্নিহিত নিয়ম-শৃঙ্খলার অন্বেষণ, তার বাহ্যিক দৃশ্যাবলী সম্পর্কে চিন্ত-গবেষণা এবং এগুলোর সমন্বয়ে অনুমান ও সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহয্যে ফলাফল নির্ণয় ইত্যাদির কোনোটাই ধর্মবিরুদ্ধ কাজ নয়, তবু ঘটনাচক্রে রেনেসাঁ আমলে ইউরোপে নয়া বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের সূত্রপাত হতেই খ্রীস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে তার তীব্র বিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দেয়। কারণ এই পাদ্রী সম্প্রদায় তাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল। তারা এই আশা পোষণ করে রেখেছিল যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসার ফলে এই ভিত্তিতে যদি সামান্যতম ফাটলও ধরে, তাহলে ধর্মের গোটা ইমারতই ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা এই নয়া বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের বিরোধিতায় লিপ্ত হলো এবং একে প্রতিরোধ করার জন্যে শক্তি পর্যন্ত প্রয়োগ করলো। প্রতিষ্ঠা করলো ধর্মীয় আদালত এবং এর মাধ্যমে এই আন্দলনের অগ্রনায়ক ও নিশানবাহীদের কঠোর, নির্মম ও ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রদান করতে লাগলো। কিন্তু এ আন্দোলন ছিলো এক অপ্রতিরোধ্য মানস-চেতনার ফল; তাই নিপীড়ন ও নির্যাতনে নিস্তেজ হবার পরিবর্তে এটি আরো জোরদার হয়ে উঠল।

এমনকি, শেষ পর্যন্ত মুক্ত চিন্তার বন্যা-প্রবাহ ধর্মীয় কর্তৃত্বকে একেবারে খতম করে দিলো।

শুরুতেই এই লড়াইটা ছিলো মুক্ত চিন্তার অগ্রনায়ক ও পাদ্রীদের মধ্যে সীমিত। কিন্তু পাদ্রীরা যেহেতু ধর্মের নামে স্বাধীন চিন্তানায়কের সঙ্গে লড়াই করছিল, তাই খুব শীগ্গীরই এটি খ্রীস্টান ধর্ম ও মুক্ত চিন্তার ধারকদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে পরিণত হলো। অতপর ধর্ম বস্তুটাকেই (তা যে কোনো ধর্মই হোক না কেন) এই আন্দোলনের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে আখ্যা দেয়া হলো। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চিন্তা-ভাবনাকে ধর্মীয় চিন্তাপদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে ঘোষণা করা হলো। যে ব্যক্তি বিশ্বপ্রকৃতির বিষয়াদি সম্পকে বৈজ্ঞানিক পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করবে, তার পক্ষে ধর্মীয় মতবাদ বর্জন করে নিজস্ব পথে চলা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হলো। বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে ধর্মীয় মতবাদের মূল ভিত্তি এই যে, এই বিশ্বজাহান থেকে ঊর্ধ্বতন এক শক্তিকে প্রাকৃতিক জগতের তামাম নিদর্শন ও দৃশ্যাবলীর কার্যকারণ বলে ঘোষণা করতে হবে। যেহেতু এটি ছিলো আধুনিক বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের শত্রুদের মতবাদ, এজন্যই খোদা অথবা কোনো অতি-প্রাকৃতিক সত্তার ধারণা ছাড়াই বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করা এবং খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে প্রাকৃতিক বিষয়াদির ওপর দৃষ্টিক্ষেপণকারী প্রত্যেকটি পন্থাকেই অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দেয়াকে এই নয়া আন্দোলনের নায়কগণ অনিবার্য মনে করলো। এইভাবে নব্যযুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের মধ্যে খোদা, আত্মা কিংবা আধ্যাত্মবাদ ও অতিপ্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে এক তীব্র বিদ্বেষের সঞ্চার হলো। অথচ এটা আদৌ বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের স্বাভাবিক পরিণতি ছিলোনা; বরং এ ছিলো নিতান্তই ভাবাবেগের আতিশয্যের ফলমাত্র। তারা খোদার প্রতি এই জন্যে বিদ্বেষী ছিলোনা যে, তাঁর অনস্তিত্ব বা অনুপস্থিতি সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছিল; বরং তার প্রতি এই জন্যে বিরক্ত ছিলো যে, তিনি ছিলেন তাদের এবং তাদের মুক্ত চিন্তার শত্রুদের প্রভু (মা'বুদ)। পরবর্তী পাঁচ শতকে তাদের যুক্তি, বুদ্ধি ও চিন্তা এবং তাদের বৈজ্ঞানিক আন্দোলন যেটুকু কাজ করেছে, তার মূলে এই অযৌক্তিক ভাবাবেগই সক্রিয় ছিল।

পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান যখন আসল যাত্রাপথে পদক্ষেপ করে, তখন তার লক্ষ্য ছিলো খোদাপরস্তির সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে নিবদ্ধ। তবু ধর্মীয় পরিবেশে বেষ্টিত থাকার ফলে শুরুতে প্রকৃতিবাদকে খোদাপরস্তির সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে চলছিলো। কিন্তু যতোই সে নিজের লক্ষ্যপথে এগিয়ে চললো, খোদাপরস্তির ওপর ততোই প্রকৃতিবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো। এমনকি, খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কিত ধারণা এবং তাঁর সঙ্গে প্রত্যেকটি অতি প্রাকৃতিক জিনিসের ধারণাই দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে বেমালুম গায়েব হয়ে গেলো। তারা এমন চরম প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলো যে, বস্তু ও গতি ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো জিনিসেরই অস্তিত্ব রইলোনা। তারা বিজ্ঞানকে প্রকৃতবাদেরই সমর্থক বলে ঘোষণা করলো। যে জিনিস মাপা বা ওজন করা যায়না, তার কোনো অস্তিত্ব

নেই, এই মতবাদের ওপর গোটা বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সম্প্রদায় বিশ্বাস স্থাপন করে বসলো।

পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস একথারই সাক্ষ্য বহন করে। পাশ্চাত্য দর্শনের জনকরূপে পরিচিত ডেকার্টে (মৃত্যু ১৬৫০) একদিকে যেমনি খোদার অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, অপরদিকে তেমনি বস্তুর সাথে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বও স্বীকার করতেন। অন্যদিকে তিনিই আবার বিশ্ব-প্রকৃতির নিদর্শনাদির যান্ত্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সূচনা করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রবর্তিত চিন্তাপদ্ধতিই পরবর্তীকালে নিরেট বস্তুবাদে পরিণত হয়। হব্‌স (মৃত্যু ১৬৭৯) আর এক ধাপ সামনে এগিয়ে অতি-প্রকৃতিবাদের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। তিনি বিশ্বপ্রকৃতি এবং এর প্রতিটি বস্তুকেই যান্ত্রিক বিশ্লেষণের উপযোগী বলে ঘোষণা করেন এবং এই জড়জগতে প্রভাবশীল যে কোনো আত্মিক বা অশরীরী শক্তির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন; কিন্তু একই সাথে তিনি খোদার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন। কারণ, বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে এমনি এক কার্যকারণ শক্তিকে স্বীকার করা আবশ্যক ছিলো। এ সময়েই সতের শতকের যুক্তিবাদের সবচেয়ে বড় অগ্রনায়ক স্পিনোজার (মৃত্যু ১৬৭৭) আবির্ভাব হয়। তিনি বস্তু, আত্মা এবং খোদার মধ্যে কোনো পার্থক্যই বাকী রাখলেননা। তিনি খোদা এবং বিশ্বপ্রকৃতিকে মিলিয়ে একটি অচ্ছেদ্য সত্বা বানিয়ে দিলেন এবং খোদার সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে অস্বীকার করলেন। এদের উত্তসূরী লিব্‌নিজ (মৃত্যু ১৭১৬) এবং লক্ (মৃত্যু ১৭০৪) খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু উভয়েরই মানসিক প্রবণতা ছিলো প্রকৃতিবাদের দিকে।

এইভাবে দেখা যায় যে, সতের শতকের দর্শনশাস্ত্রে খোদাপরস্তি ও প্রকৃতিবাদ উভয়েই পাশাপাশি চলছিলো। অনুরূপভাবে বিজ্ঞানও সতের শতক পর্যন্ত পুরোপুরি জড়বাদে পরিণত হয়নি। কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য অগ্রনায়কদের কেউই খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেননা। কিন্তু এরা বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে খোদায়ী মতবাদ পরিহার করে যেসব শক্তি ও বিধি-বিধান এই ব্যবস্থাপনাটি পরিচালনা করছে, সেগুলো অন্বেষণ করার ইচ্ছুক ছিলেন। এই খোদায়ী মতবাদ পরিহার করাটাই ছিলো প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকতা ও প্রকৃতিবাদের বীজ তুল্য। এই বীজই পরবর্তীকালে মুক্ত চিন্তার বৃক্ষহিসেবে বিকশিত হয়। কিন্তু সতের শতকের বিজ্ঞানীদের এ সম্পর্কে কোনো চেতনাই ছিলোনা। তাঁরা প্রকৃতিবাদ ও খোদাপরস্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য রেখা আঁক্‌তে পারেননি; বরং এই দু'টো মতবাদ পাশা-পাশি চলতে পারে বলে তাঁরা মনে করতেন।

অবশ্য আঠার শতকে এসে এ সত্য প্রতিভাত হলো যে, খোদার সত্তাকে অগ্রাহ্য করে যে চিন্তাপদ্ধতি বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য ও তার বিধি-বিধানের অনুসন্ধান করবে, তা কিছুতেই বস্তুবাদ, ধর্মহীনতা ও জড়বাদ পর্যন্ত না পৌঁছে পারেনা। এই শতকে জন টোলেন্ড, ডেভিড হার্টলে, জোসেফ প্রিস্টলি, ভলটেয়ার, লা-মেট্রি, হোলবাক,

কেবানিস, ডেনিস ডয়েড্‌রো, মনটেস্‌কুউ, রুশো এবং এই ধরনের আরও কতিপয় স্বাধীন চিন্তাশীল দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা আবির্ভাব হয়। এরা হয় প্রকাশ্যে খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন, নতুবা তার স্বীকৃতি দিলেও মর্যাদার দিক দিয়ে তাকে একজন নিয়মতান্ত্রিক সম্রাটের চেয়ে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেননি। অর্থাৎ এদের স্বীকৃত খোদা বিশ্বপ্রকৃতিকে একবার গতিবান করে তার থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এখন আর এই ব্যবস্থাপনার পরিচালনায় তার কোনো ভূমিকা নেই। এই শ্রেণীর দার্শনিক ও বিজ্ঞানী বিশ্বপ্রকৃতি, জড়জগত এবং গতি ছাড়া আর কোনো জিনিসেরই অস্তিত্ব স্বীকার করতেননা। এঁদের মতে যেসব জিনিস পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আয়ত্বাধীন, কেবল তা-ই সত্য। হিউম তার অভিজ্ঞতাবাদ ও সংশয়বাদের সাহায্যে এই চিন্তা পদ্ধতি জোরালোভাবে সমর্থন করেন। এমনকি যুক্তিসিদ্ধ বিষয়াদির সত্যতার জন্যেও তিনি অভিজ্ঞতাকেই চূড়ান্ত মানদন্ড বলে ঘোষণা করেন। অবশ্য বার্কলি বস্তুবাদের এই ক্রমবর্ধমান বন্যা প্রবাহের গতিরোধ করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ অবধি তিনিও একে রোধ করতে সমর্থ হননি। অতপর হেগেল বস্তুবাদের স্থলে আদর্শবাদ প্রবর্তন করার প্রয়াস পান। কিন্তু নিরেট বস্তুর মোকাবিলায় সুক্ষ্ম আদর্শকে কেউ গ্রহণ করলোনা। কান্ট একটি মধ্যম পন্থা উদ্ভাবন করলেন। তিনি বললেন, 'খোদার অস্তিত্ব, আত্মার স্থায়িত্ব, ইচ্ছার স্বাধীনতা ইত্যাদি আমাদের বোধগম্য জিনিস নয়, সুতরাং এগুলো মেনে চলা সম্ভব নয়; তবে এগুলোর প্রতি ঈমান পোষণ করা যেতে পারে। কারণ আমাদের বাস্তব বিচারবোধ এগুলোর প্রতি ঈমান পোষণেরই দাবি জানায়।' এই ছিলো খোদাপরস্তি ও প্রকৃতিবাদের মধ্যে আপোষ সৃষ্টির সর্বশেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেননা বুদ্ধি ও চিন্তার ভ্রান্তি খোদার অস্তিত্বকে নিছক কল্পনাপ্রসূত কিংবা বড়জোর একজন নিষ্ক্রিয় ও ক্ষমতাহীন সত্তা বলে ঘোষণা করার পর শুধু নৈতিকতার হেফাজতের জন্যে তাকে মানা, ভয় করা এবং তার সন্তুষ্টি কামনা করাটা ছিলো নিতান্তই এক অযৌক্তিক ব্যাপার।

ঊনিশ শতকে বস্তুবাদ তার উৎকর্ষের চরম শীর্ষে পৌঁছে। ভোগট, রুখ্‌নার, জোলবে, কোমে, মোল্‌শট এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ বস্তু এবং তার গুণাগুণ ছাড়া আর সব জিনিসের অস্তিত্বকেই বাতিল করে দেন। মিল দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতাবাদ এবং নীতিশাস্ত্রে উপযোগবাদের প্রবর্তন করেন। অতপর স্পেনসার দার্শনিক বিবর্তনবাদ, বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক সৃষ্টি এবং জীবনের স্বত:স্ফূর্ত উন্মেষের ধারণাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রচার করেন। পরন্তু জীবতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব এবং প্রাণীতত্ত্বের আবিস্কার উদ্ভাবনী, ফলিত বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ এবং বৈষয়িক উপকরণের প্রাচুর্য লোকদের মনে এই ধারণা গভীরভাবে বদ্ধমূল করে দিলো যে, বিশ্বপ্রকৃতি আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে; কেউ একে সৃষ্টি

করেনি; তা নিজে নিজেই এক বাঁধাধরা নিয়মে চালিত হচ্ছে, এর কোনো সুনির্দিষ্ট চালক নেই; আপনা আপনিই এ বিবর্তন ও উৎকর্ষের পর্যায়গুলো অতিক্রম করে চলছে, এই স্বয়ংক্রিং যন্ত্রের ওপর অপর কোনো অতি-প্রাকৃতিক সত্তার প্রভাব নেই। নিষ্প্রাণ বস্তুর ভেতরে কারো নির্দেশে প্রাণের সঞ্চার হয়না; বরং বস্তু তার নিজস্ব ধারায় বিবর্তিত হতে থাকলেই প্রাণের সঞ্চার হয়। বিবর্তন, ইচ্ছাশক্তি, অনুভূতি, চেতনা, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি হচ্ছে এই বিবর্তিত বস্তুরই গুণগত বিশেষত্ব। মানুষ, পশু সাবাই হচ্ছে যন্ত্র মাত্র; স্বাভাবিক নিয়মেই এরা চালিত হচ্ছে। এদের কলকব্জাগুলো যেভাবে বিন্যাস্ত হয়, তেমনি ধরনের কাজই এরা সম্পাদন করে থাকে। এদের ভেতরে কোন ইখতিয়ার বা 'স্বাধীন ইচ্ছার' অস্তিত্ব নেই। এদের নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিচ্যুতি ঘটলে এবং প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেলেই মৃত্যু হয়। এ মৃত্যু হচ্ছে স্বাভাবিক বিলুপ্তিরই নামান্তর মাত্র। অন্যকথায় যন্ত্র যখন ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে, তখন তার গুণ-বৈশিষ্ট্যও বিলীন হয়ে গিয়েছে। এখন আর তার হাশর বা পূনর্জীবন লাভের কোনোই সম্ভাবনা নেই।

এই প্রকৃতিবাদ ও বস্তুবাদকে স্থিতিশীল করে তোলা এবং একটা প্রামাণ্য ও সুসংবদ্ধ মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ডারউইনের বিবর্তনবাদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর লিখিত 'প্রজাতির উৎস' (Origin of species) নামক গ্রন্থটি ঈসায়ী ১৮৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি বিজ্ঞান জগতে একটি প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়। এই গ্রন্থে যে যুক্তিধারা সন্নিবেশিত হয়, উনিশ শতকের বিজ্ঞানীদের কাছে তা ছিলো যুক্তির সর্বোত্তম পদ্ধতি। সে যুক্তিধারা থেকে এই মতবাদ আরো বলিষ্ঠরূপে সমর্থিত হয় যে, বিশ্বপ্রকৃতির তামাম ক্রিয়াকলাপ খোদার অস্তিত্ব ছাড়াই চলতে পারে। প্রকৃতির নিদর্শন ও দৃশ্যাবলীর জন্যে তার নিজস্ব নিয়ম-কানুন ছাড়া আর কোনো কার্যকারণের প্রয়োজন নেই। জীবনের নগণ্য স্তর থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত সকল বস্তুরই বিকাশ ও বিবর্তন হচ্ছে এ যুক্তি ও বিচার বুদ্ধিহীন প্রকৃতির অনুক্রমিক ক্রিয়ার নিছক পরিণতি। মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুকে কোনো বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্তা সৃষ্টি করেননি; বরং যে প্রাণবস্তু যন্ত্রটি একদিন কীটরূপে বিচরণ করতো, তা-ই শেষে বাঁচার লড়াই, যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন এবং প্রকৃতির নির্বাচনে ইচ্ছা, অনুভূতি বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষরূপে আত্ম-প্রকাশ করে।

এই দর্শন থেকেই পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও সভ্যতা জন্মলাভ করে। এতে না আছে কোনো বিচক্ষণ ও ক্ষমতাবান খোদার ভয়ের স্থান; আর না আছে নবুয়্যত, প্রাত্যাদেশ (ওহী) ও ইল্‌হামের কোনো গুরুত্ব। এর ভেতরে মৃত্যুর পর অপর কোনো জীবনের ধারণা, ইহজীবনের কৃতকর্ম সম্পর্কে জবাবদিহির চিন্তা, মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের প্রশ্ন, জীবনের জৈবিক উদ্দেশ্যের চেয়ে উচ্চতর কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা ইত্যাদির কোনোই অবকাশ নেই। এ হচ্ছে নিরেট

বস্তুবাদী সভ্যতা। এর গোটা অবয়বই খোদাভীতি, সরলতা, সত্যবাদিতা, সত্যানুসন্ধিৎসা, সচ্চরিত্র, দায়িত্বজ্ঞান, বিশ্বস্ততা, সৎকর্মশীলতা, লজ্জাশীলতা, পরহেযগারী ও পবিত্রতার ধারণা থেকে মুক্ত। পক্ষান্তরে এই সকল ধারণার ওপরই ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত। ফলকথা, পাশ্চাত্যের গোটা মতাদর্শ ইসলামী মতাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তার পথ ইসলামের অনুসৃত পথের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম যে জিনিসগুলোর ওপর মানবীয় আচরণ ও তমদ্দুনের ভিত্তি স্থাপন করে, এ সভ্যতা চায় সেগুলোর মূলোৎপাটন করতে। পক্ষান্তরে এই সভ্যতা যে ভিত্তিগুলোর ওপর মানুষের ব্যক্তি চরিত্র ও সমাজ পদ্ধতির ইমারত গড়ে তুলতে চায়, তার উপর ইসলামের ইমারত এক মুহূর্তের জন্যেও টিকে থাকতে পারেনা। মোটকথা, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা হচ্ছে দুই বিপরীত লক্ষ্যগামী তরণীর মতো। যে ব্যক্তি এর কোন একটিতে আরোহণ করবে, তাকে অন্যটি ত্যাগ করতেই হবে। আর যে একই সাথে উভয়টিতে আরোহণ করবে, সে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।

দুর্ভাগ্যবশত যে শতকে এই নয়া সভ্যতা তার বস্তুতান্ত্রিকতা, ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিকতার চরম প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়, ঠিক সেই শতকেই মরক্কো থেকে দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত গোটা মুসলিম জাহান পাশ্চাত্য জাতিগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও শাসনতান্ত্রিক প্রাধান্যের অক্টোপাসে বন্দী হয়ে পড়ে। ফলে মুসলমানদের ওপর পাশ্চাত্যের তরবারি ও লেখনীর হামলা এক সাথেই চালিত হয়। যাদের মন-মগজ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের রাজনৈতিক প্রাধান্যে বশীভূত ও ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো, তাদের পক্ষে পাশ্চাত্যের দর্শন, বিজ্ঞান ও তার উদ্ভাবিত কৃষ্টি-সভ্যতার জাঁকজমক থেকে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়লো। বিশেষ করে, যেসব মুসলিম জনপদ সরাসরি কোনো পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের শাসনাধীন হয়ে পড়েছিলো, তাদের অবস্থা ছিলো আরো বেশী নাজুক। তাদেরকে পার্থিব আত্মস্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে বাধ্য হয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জন করতে হলো আর এই জ্ঞান অর্জন যেহেতু নিছক জ্ঞান অর্জনই ছিলোনা বরং ছিলো 'এক পরাভূত মানসিকতা নিয়ে পাশ্চাত্য গুরুদের সামনে নতজানু হয়ে বসা', এই জন্যে মুসলমানদের নতুন প্রজন্ম গভীরভাবে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হলো; তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা পাশ্চাত্য ছাঁচে গড়ে উঠতে লাগলো; তাদের হৃদয়-মন পাশ্চাত্য সভ্যতার বশ্যতা স্বীকার করে নিলো। তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ পরখ করা এবং নিরেট ভালোটিকে গ্রহণ করার মতো বিচারবোধ ও অনুসন্ধিৎসারই সৃষ্টি হলোনা! তাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার এবং ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মতো যোগ্যতাই সৃষ্টি হতে পারলোনা। এরই ফলে আমরা দেখেতে পাচ্ছি যে, ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টির গোটা ভিত্তিমূলই আজ নড়বড়ে হয়ে উঠছে। ইসলামী পদ্ধতিতে

চিন্তা-ভাবনা করার মতো মানসিক কাঠামোই বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। বস্তুত যারা পাশ্চাত্য পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলনীতির প্রতি আস্থা পোষণ করে, তাদের মানসিক গড়নটাই হচ্ছে অদ্ভুত প্রকৃতির। সে মানসিকতার সাথে ইসলামের নীতি কিছুতেই খাপ খেতে পারেনা। আর মূলনীতিই যখন খাপ খায়না, তখন খুঁটিনাটি ও ছোটখাট ব্যাপারে নানারূপ সন্দেহ ও নিত্য নতুন সংশয়ের উদ্রেক হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

এটা নিসন্দেহ যে, মুসলমানদের অধিকাংশ এখনো ইসলামের সত্যতার প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং মুসলমান হিসেবেই তারা বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু পাশ্চাত্য চিন্তা ও সভ্যতার প্রভাবে তাদের মন-মগজ ইসলামের প্রতি ক্রমশ বিমুখ হতে চলেছে এবং এই বিমুখতা দিনদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক প্রাধান্য ও প্রভুত্বের কথা বাদ দিলেও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব প্রতিপত্তি দুনিয়াব্যাপী সবার মন মানসকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে। এর ফলে লোকদের দৃষ্টিভংগী বদলে গেছে, কারো পক্ষে মুসলমানী দৃষ্টিতে দেখা এবং ইসলামী ধারায় চিন্তা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই যর্তোক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তানায়কের আবির্ভাব না ঘটবে, ততোক্ষণ এই নতজানু অবস্থার অবসান হবেনা। বস্তুত আজ ইসলামের এক নবজাগরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রাচীন ইসলামী চিন্তানায়ক ও তথ্যানুসন্ধানীদের রক্ষিত জ্ঞানসম্পদ আজকের দিনে ফলপ্রসূ হতে পারেনা; কেননা দুনিয়া আজ অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। ছয়'শ বছর আগে দুনিয়া যেসব পর্যায় অতিক্রম করে এসেছে, আজ তাকে আবার পেছনদিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। আজকে যে দুনিয়াকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে সে-ই নেতৃত্বদানে সক্ষম হবে।

কাজেই আজকে আবার ইসলামকে দুনিয়ার নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করতে হলে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে মুসলিম সমাজে এমন চিন্তাবিদ ও তথ্যানুসন্ধানীর আবির্ভাব হতে হবে, যাঁরা চিন্তা-গবেষণা ও অনুসন্ধান অনুশীলনের সাহায্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার গোটা ভিত্তিমূলকেই ধ্বসিয়ে দিতে পারবেন। কুরআনের নির্দেশিত চিন্তা-গবেষণার পদ্ধতিতে যারা প্রাকৃতিক নিদর্শনাদির পর্যবেক্ষণ এবং তার রহস্যাবলীর অনুসন্ধান করে খালেস ইসলামী চিন্তাধারার ভিত্তিতে নতুন দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তি রচনা করবেন। যাঁরা কুরআনের অঙ্কিত রূপরেখার ভিত্তিতে এক নয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ইমারত গড়ে তুলবেন। খোদাবিমুখ মতবাদকে বাতিল করে যাঁরা খোদায়ী মতবাদের ওপর চিন্তা ও গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করবেন। সর্বোপরি এই আধুনিক চিন্তা ও গবেষণার ইমারতকে তারা এমনি সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তুলবেন যে, তা গোটা দুনিয়াকেই আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং দুনিয়ার সর্বত্র পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার বদলে ইসলামের সত্য ও সুবিচার ভিত্তিক সভ্যতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

উপরে যা কিছু আলোচিত হলো, তার সারমর্মকে একটি উপমার সাহায্যে এভাবে পেশ করা যেতে পারে ঃ দুনিয়াটা যেনো একটি রেলগাড়ী। একে চালিত করছে চিন্তা-গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের ইঞ্জিন। আর চিন্তাবিদ ও তথ্যানুসন্ধানীরা হচ্ছে এই ইঞ্জিনের ড্রাইভার। তাঁরা এই গাড়ীকে যেদিকে চালিত করেন, সেদিকেই সে ধাবিত হয়। যারা গাড়ীর আরোহী, তারা ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায়- তার গতিপানেই যেতে বাধ্য। যদি গাড়ীর কোনো যাত্রী তার গতিপানে যেতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে সে চলন্ত গাড়ীর মধ্যে বসে নিজের আসনটিকে এদিক-ওদিক ঘুরানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনা। কিন্তু আসনের মোড় ঘুরিয়ে দিলেই তাতে নিজের গতিমুখ বদলে যায়না; তা করতে হলে গাড়ীর ইঞ্জিন দখল করে তার গতিকে নিজের ঈপ্সিত পথে ঘুরিয়ে দিতে হবে। একমাত্র এভাবেই নিজের গতিমুখ বদলানো যেতে পারে।

বর্তমানে এই ইঞ্জিনটি যাদের করায়ত্ত, তারা সবাই আল্লাহবিমুখ এবং ইসলামী চিন্তাধারা সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞ। এ জন্যেই গাড়ীটি তার যাত্রীদের নিয়ে ধর্মদ্রোহীতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার পথে দ্রুত ছুটে চলছে। ফলে সমস্ত যাত্রীই ইসলামের লক্ষ্যস্থল থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। তাই গাড়ীর এই গতিধারাকে বদলাতে হলে আজ থেকে ইঞ্জিন করায়ত্বের চেষ্টা করতে হবে। এই কাজটি যে পর্যন্ত না হবে, সে পর্যন্ত গাড়ীর গতি কিছুতেই বদলানো যাবেনা; বরং আমাদের শত আপত্তি-বিরক্তি ও চিৎকার সত্ত্বেও গাড়ী আল্লাহদ্রোহী ড্রাইভারদের নির্দেশিত পথেই চলতে থাকবে। (তরজমানুল কুরআন ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ ইং)

❖❖❖

২

উপমহাদেশে ইসলামী সভ্যতার বিপর্যয়

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বর্তমান মসুলিম জাহানের অধিকাংশ দেশই সোনালী যুগের মুজাহিদদের প্রচেষ্টায় বিজিত হয়েছে। যারা এই দেশগুলো জয় করেছেন, তাঁরা রাজ্য বিস্তার কিংবা ধনার্জনের নেশায় নয়, বরং দুনিয়ার বুকে আল্লাহ্‌র কালেমা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যেই জীবন পণ করে নিজেদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করেছিলেন। তাঁরা দুনিয়াবী ভোগাসক্তির বদলে পরকালীন সুখাভিলাষের নেশায়ই বিভোর ছিলেন। এ জন্যেই তাঁরা বিজিতদের শুধু নিজেদের অনুগত ও করদাতা বানিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাদেরকে ইসলামের রঙে রাঙিয়ে তুলবারও ব্যবস্থা করেন। তাদের গোটা জনসংখ্যা কিংবা তার অধিকাংশকেই তাঁরা মিল্লাতে ইসলামিয়ার অন্তরভুক্ত করে নেন। পরন্তু জ্ঞানচর্চা ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের ভেতর ইসলামী চিন্তাধারা ও সভ্যতাকে এমনিভাবে দৃঢ়মূল করে দেন যে, পরবর্তীকালে তাঁরা নিজেরাই ইসলামী কৃষ্টি-সভ্যতার নিশানবরদার এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষকে পরিণত হন। এগুলো ছাড়া বাকী দেশগুলো বিজিত হয় সোনালী যুগের বহু পরে। তখন ইসলামী প্রাণ-চেতনা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল এবং বিজেতাদের হৃদয়ে খালেস আল্লহ্‌র পথে জিহাদের চেয়ে রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্খাই অধিক প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐসব দেশে ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজ বহুলাংশে সফল হয়। এমনকি ঐ দেশগুলোতে ইসলাম নিরঙ্কুশ জাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির মর্যাদা লাভ করে।

দুর্ভাগ্যবশত এই উপমহাদেশের ব্যাপারটি উপরোক্ত দুই শ্রেণীর দেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সোনালী যুগে এ দেশের খুব সামান্য অংশই বিজিত হয়। আর ঐ সামান্য অংশেও ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতার যেটুকু প্রভাব পড়েছিল, তথাকথিত মা'রেফাতের বন্যাপ্রবাহে তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপরেই এখানে শুরু হয় মুসলমানদের বিজয় অভিযানের আসল ধারাক্রম। কিন্তু তখন বিজেতাদের মধ্যে সোনালী যুগের মুসলমানদের বৈশিষ্ট ও বিশেষত্ব বর্তমান ছিলোনা। তাঁরা এখানে ইসলাম প্রচারের পরিবর্তে রাজ্য বিস্তারের কাজেই নিজেদের সমগ্র শক্তি ব্যয় করেন। তারা লোকদের কাছে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের বদলে নিজেদের আনুগত্য ও রাজস্ব দাবি করেন। এরই অনিবার্য ফলে কয়েকশ বছর রাজ্য শাসনের পরও উপমহাদেশের বেশির ভাগ অধিবাসীই অমুসলিম রয়ে যায় এবং ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতা এখানে বদ্ধমূল হতে পারেনি। পরন্তু এখানকার যেসব অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে, তাদের জন্যে ইসলামী শিক্ষা ও ট্রেনিংয়েরও কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে নও মুসলিমদের ভেতরে প্রাচীন হিন্দুয়ানী চিন্তাধারা, ধর্ম-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ কম-বেশি অবশিষ্ট থেকে

যায়। এমনকি খোদ বহিরাগত প্রাচীন মুসলমানরা পর্যন্ত এদেশের অধিবাসীদের সাথে মেলামেশার ফলে মুশরিকী রাজনীতির সঙ্গে উদার ব্যবহার এবং বহুতরো জাহিলী প্রথার অনুবর্তন শুরু করে।

মুসলিম ভারতের ইতিহাস এবং তার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এদেশে যখন মুসলমানদের রাষ্ট্রশক্তি পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিলো তখনও ইসলামের প্রভাব ছিলো অত্যন্ত দুর্বল। এখানকার পরিবেশ যথার্থ ইসলামী পরিবেশ ছিলোনা। অবশ্য হিন্দুদের ধর্ম ও তমদ্দুনও ছিলো অত্যন্ত নিস্তেজ। তদুপরি পরাভূত ও পদানত জাতির ধর্ম ও তমদ্দুন হিসেবে তা হয়ে পড়েছিল আরো নিষ্প্রভ। কিন্তু তবু মুসলিম শাসকদের উদারতা ও গাফলতির পরিবেশে তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকায় এবং মুসলমানরা পুরোপুরি ইসলামী শিক্ষা ও ট্রেনিং লাভ না করায় এখানকার মুসলমানদেরও একটি বিরাট অংশ নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস ও কৃষ্টি-সভ্যতার দিক দিয়ে ততোটা পরিপক্ক ও পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে পারেনি, যতোটা হতে পারতো খালেস ইসলামী পরিবেশে।

অবশেষে ইসায়ী আঠার শতকে ভারতে ইসলামী সভ্যতার সবচেয়ে বড় সহায়ক সেই রাষ্ট্রক্ষমতাও মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেলো। প্রথমে মুসলমানদের সম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোটখাট রাষ্ট্রে বিভক্ত হলো। তারপর একে একে মারাঠা, শিখ ও ইংরেজদের বন্যাপ্রবাহ এসে বেশির ভাগ রাষ্ট্রের অস্তিত্বই নিশ্চিহ্ন করে দিলো। এরপর স্বাভাবিকভাবেই এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে গেলো। যে দেশে কয়েক শতাব্দীকাল ধরে মুসলমানরা শাসন চালিয়েছিল, মাত্র একশ বছরেই পুরো দেশ থেকে উৎখাত হয়ে তারা পরাভূত ও পদানত হলো। আর যেসব শক্তির সহায়তায় ভারতে ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতা কিছু কায়েম ছিলো, ইংরেজদের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই তা মুসলমানদের হাতছাড়া হতে লাগলো। তারা ফারসী ও আরবীর পরিবর্তে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যমে পরিণত করলো। সেই সাথে ইসলামী আইন ব্যবস্থা বাতিল করলো, শরয়ী আদালত ভেঙ্গে দিলো এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী ব্যাপারে নিজস্ব আইন প্রবর্তন করলো। এমনকি তারা ইসলামী আইনের প্রয়োগকে খোদ মুসলমানদের জন্যেও শুধু বিবাহ তালাক ইত্যাদির মধ্যে সীমিত করে দিলো আর এই সীমিত প্রয়োগ ক্ষমতাও কাযীদের পরিবর্তে সাধারণ দেওয়ানী আদলাতের ওপর ন্যস্ত করা হলো। এইসব আদালতের বিচারকরা সাধারণত অমুসলিম বিধায় তাদের হাতে তথাকথিত 'মুহামেডান ল' দিন দিনই বিকৃত হতে লাগলো। অধিকন্তু শুরু থেকেই ইংরেজ শাসকদের এই নীতি ছিলো যে, একটি শাসক জাতি হিসেবে মুসলমানদের হৃদয়ে শতাব্দীকাল ধরে যে গৌরব ও মর্যাদবোধ লালিত ও পরিপুষ্ট হয়ে আসছে আর্থিক বঞ্চনা ও নিষ্পেষণের সাহায্যে সেটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। তাই একটি শতাব্দীর মধ্যেই এই জাতিকে তারা দরিদ্র, মূর্খ, নীচুমনা, চরিত্রহীন এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে সমর্থ হলো।

এই পতনশীল জাতিটির ওপর শেষ আঘাতটি আসে ১৮৫৭ সালের গোলযোগের সময়। সে আঘাত শুধু মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতারই আবসান ঘটায়নি; রবং তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে দিলো। তাদের হৃদয়ে নৈরাশ্য ও হীনমন্যতাবোধের অমানিশা নেমে এলো। তারা ইংরেজদের শাসনক্ষমতার দাপটে এতোখানি সম্মোহিত হলো যে, তাদের ভেতরে স্বজাত্যবোধের চিহ্নমাত্র বাকি রইলোনা। এমনকি অপমান ও লাঞ্ছনার চরম প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে তারা এ পর্যন্ত ভাবতে বাধ্য হলো যে, শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় হচ্ছে ইংরেজদের আনুগত্য করা; মান ইজ্জত লাভের পন্থা হচ্ছে ইংরেজদের সেবা করা এবং উন্নতি ও প্রগতির উপায় হচ্ছে ইংরেজদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা - এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। পক্ষান্তরে তাদের নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি-সভ্যতার যা কিছু সম্পদ রয়েছে, তা হচ্ছে দীনতা ও হীনতার প্রধানতম কারণ।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানরা যখন আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, তখন তাদের মধ্যে দু'রকম দুর্বলতা বর্তমান ছিলো। প্রথম এই যে, চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে আগে থেকেই তারা ইসলামী প্রত্যয় ও কৃষ্টি-সভ্যতায় পরিপক্ক ছিলোনা। পরন্তু এক অনৈসলামী পরিবেশ তার জাহিলী ধ্যান-ধারণা ও তমদ্দুনসহ তাদেরকে ঘিরে রেখেছিল। দ্বিতীয় হলো, গোলামি তার সমস্ত দোষত্রুটি সমেত কেবল তাদের দেহের ওপরই নয়; বরং তাদের হৃদয় ও আত্মার ওপরও চেপে বসেছিল। ফলে যেসব শক্তির সাহায্যে একটি জাতি তার তাহযীব ও তমদ্দুনকে বহাল রাখতে পারে, সেগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে পড়ে।

এই দ্বিবিধ কমজোরীর মধ্যেই মুসলমানরা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো, ইংরেজ শাসকরা অতি সুকৌশলে আর্থিক উন্নতির সমস্ত দরজা তাদের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছে এবং তার চাবি রেখে দিয়েছে ইংরেজি স্কুল ও কলেজের মধ্যে। এবার ইংরেজি শিক্ষা লাভ করা ছাড়া মুসলমানদের আর কোনোই গতি রইলোনা। তাই স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে এক প্রচণ্ড আন্দেলন গড়ে উঠলো। তার প্রভাবে গোটা উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হলো। এ ব্যাপারে প্রাচীন পন্থীদের বিরোধিতা সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়। কারণ ধন দৌলত, মান ইজ্জত ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে জাতির আসল শক্তি যাদের করায়ত্তে ছিলো, তারা এই নয়া আন্দোলনকে অভিনন্দন জানালো এবং এর প্রত্যক্ষ সহায়তায় এগিয়ে এলো। ফলে ভারতের মুসলমানরা অতি দ্রুত ইংরেজি শিক্ষার দিকে এগিয়ে চললো। জাতির অকেজো ও অপদার্থ অংশটিকে পুরনো ধর্মীয় মাদ্রাসার জন্যে রেখে দেয়া হলো যাতে করে তারা মসজিদের ইমামতি ও মক্তব-মারদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। আর স্বছল ও স্বচ্ছন্দ শ্রেণীর উত্তম শিশুদেরকে ইংরেজি স্কুল-কলেজে পাঠানো হলো, যেনো তাদের নিষ্কলুষ মন-মগজে ফিরিঙ্গী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার ছাপ অঙ্কিত হতে পারে।

এটা ছিলো ঊনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশের অবস্থা। ইউরোপে তখন বস্তুবাদের চরম উন্নতি ঘটে। ইতিপূর্বে আঠার শতকে বিজ্ঞান পুরোপুরি ধর্মকে পরাজিত

করে। আধুনিক দর্শন ও নতুন বিজ্ঞানের নেতৃত্বে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের তাবৎ পুরনো মতবাদ বাতিল হয়ে নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটকথা, এইসব আধুনিক মতবাদের ভিত্তিতে ইউরোপে এক বিশেষ ধরনের কৃষ্টি ও সভ্যতার জন্ম হয়। এই বিরাট বিপ্লব জীবনের বাস্তব ক্রিয়াকান্ড থেকে ধর্ম এবং ধর্ম নির্দেশিত রীতিনীতিকে নির্বাসিত করে বটে, তবে চিন্তা ও কল্পনার জগতে ধর্মীয় প্রত্যয়ের কিছুটা প্রভাব তখনো বাকি ছিলো। তাই তার বিরুদ্ধে এবার প্রচন্ড লড়াই শুরু হয়ে গেলো। যদিও জ্ঞান বিজ্ঞানের কোনো একটি সূত্রও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কিত খোদায়ী মতবাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ (যাকে প্রকৃতই প্রমাণ বলা যায়) পেশ করতে পারেনি, কিন্তু তবুও বিজ্ঞানীরা কোনরূপ দলীল প্রমাণ ছাড়াই নিছক ভাবাবেগের কারণেই খোদার প্রতি অপ্রসন্ন ও খোদায়ী মতবাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। আর যেহেতু তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে তারাই ছিলো দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে সমাসীন, তাই তাদের প্রভাবে খোদাবিমুখতার (Theophobia) ব্যাধি এক ব্যাপক মহামারীর ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা, বিশ্বপ্রকৃতিকে স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী চলমান বস্তু বলে মনে করা, খোদাপরস্তিকে কুসংস্কার আখ্যা দেয়া, ধর্মকে অনর্থক এবং ধার্মিকতাকে সঙ্কীর্ণতা ও অন্ধত্ব বলে অভিহিত করা, প্রকৃতিবাদকে ঔদার্য ও স্বচ্ছ দৃষ্টির সমার্থক জ্ঞান করা তখন একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়। এমনকি দর্শন ও বিজ্ঞানে যার এতোটুকু জ্ঞান নেই এবং এই সকল জটিল প্রশ্ন গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের যে অণুপরিমাণ চেষ্টাও করেনি, এমন ব্যক্তিও শুধু সমাজে একজন আলোকপ্রাপ্ত লোক হিসেবে বিবেচিত হবার আকাঙ্খায় এই ধরনের মতবাদ জাহির করতো। ফলে আধ্যাত্মবাদ বা অতি প্রকৃতিবাদের সপক্ষে কিছু বলা বা লেখা তখনকার দিনে কুফরতুল্য অপরাধ ছিলো। এমনকি কোনো প্রখ্যাত বিজ্ঞানীও এ ধরনের কোনো মত প্রকাশ করলে বিজ্ঞানীদের মহলে তাঁর আর কোনো মর্যাদাই থাকতোনা, তাঁর তামাম কৃতিত্বই একেবারে ম্লান হয়ে যেতো এবং তিনি বিদগ্ধ সমাজে আসন লাভেরই অনুপযুক্ত হয়ে পড়তেন।

১৮৫৯ সালে ডারউইনের বিখ্যাত 'প্রজাতির উৎস' (Origin of Species) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি প্রকৃতিবাদ ও নাস্তিকতাবাদের আগুনে তেল সংযোগের কাজ করে। অবশ্য ডারউইন তাঁর উদ্ভাবিত বিবর্তনবাদের সপক্ষে যে দলিল প্রমাণ পেশ করেন, তা ছিলো নিতান্তই দুর্বল এবং প্রমাণ সাপেক্ষ। তাঁর মনগড়া বিবর্তন ধারায় কেবল একটি স্তরই নয়; বরং প্রতিটি বর্তমান স্তরের সামনে ও পেছনে অনেকগুলো স্তরই ছিলো অনুপস্থিত। ফলে বিজ্ঞানীরা এই মতবাদ সম্পর্কে তখনো নিশ্চিত হতে পারেননি। এমনকি এর সবচেয়ে বড় প্রবক্তা হাক্সলে (Huxley) পর্যন্ত এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিছক খোদাদ্রোহিতার কারণেই ডারউইনবাদকে গ্রহণ করা হলো। শুধু তাই নয়, তার সপক্ষে মাত্রাতিরিক্ত রকমের প্রচার চালানো হলো এবং সেটাকে ধর্মের বিরোধিতার, একটি প্রকান্ড অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হলো। কেননা,

এই মতবাদটি বিজ্ঞানীদের ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে একটি বিরাট দাবিকে সপ্রমাণ **করেছিল** (অথচ ডারউইনবাদের আসল দাবিটিও ছিলো প্রমাণ সাপেক্ষ)। তা হলো এই যে, গোটা বিশ্বপ্রকৃতি কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির সহায়তা ছাড়াই স্বাভাবিক নৈসর্গিক নিয়মে চালিত হচ্ছে। ধর্মবাদিগণ এই মতবাদের ঘোর বিরোধিতা করলো। বৃটিশ এসোসিয়েশনের সভায় অক্সফোর্ড ও গ্লাডস্টোনের বিশপগণ এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ভাষণ দান করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা পরাজিত হন। অবশেষে ইউরোপীয় ধর্মবাদিগণ বৈজ্ঞানিক নাস্তিকতার সামনে এতোখানি পরাভূত হলো যে, ১৮৮২ সালে ডারউইন মৃত্যুবরণ করলে ইংল্যান্ডের চার্চ তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেন। অর্থাৎ তাঁকে ওয়েস্ট মিনিস্টার এবিতে সমাহিত করার অনুমতি দেয়া হলো। অথচ ইউরোপে ধর্মের কবর রচয়িতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন শিরোমণি। তিনিই চিন্তাধারাকে বস্তুতন্ত্র, নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতার পথে চালিত করার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি যে মানসিকতার গোড়াপত্তন করেন, তার ফলেই ইউরোপে বলশেভিকবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিকাশ ও বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করে।

বস্তুত এই সময়ই আমাদের যুবসমাজেকে ইংরেজি শিক্ষা ও ফিরিঙ্গী সংস্কৃতির দ্বারা অনুগৃহীত হবার জন্যে ইংরেজি স্কুল ও কলেজে প্রেরণ করা হলো। তারা আগে থেকেই ইসলামী শিক্ষায় আনকোরা এবং ইসলামী সংস্কৃতিতে অপরিপক্ক ছিলো। পক্ষান্তরে ইংরেজ শাসন শক্তির সামনে পরাভূত এবং ফিরিঙ্গী সভ্যতার জাঁকজমকে ছিলো মোহমুগ্ধ। এর ফলে ইংরেজি স্কুলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মানসিক কাঠামো বদলে গেলো। তাদের ঝোঁক প্রবণতা ধর্মের দিক থেকে ফিরে গেলো। কারণ, ইউরোপের কোনো লেখক গবেষকের নামে কিছু পেশ করা হলে তাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়া এবং কুরআন, হাদিস ও ইসলামী মনিষীদের তরফ থেকে কিছু বলা হলে তার সপক্ষে প্রমাণ দাবি করা ছিলো ঐ আবহাওয়ার সবচেয়ে প্রথম প্রভাব। এই পরিবর্তিত মনসিকতা নিয়ে তারা যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করলো, তার মূলনীতি ও শাখা প্রশাখার অধিকাংশই ছিলো ইসলামের মূলনীতি ও শাখা প্রশাখার পরিপন্থী।

ইসলামে ধর্মের ধারণা হলো, তা হচ্ছে মানুষের জীবন বিধান। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যে ধর্মের ধারণা হচ্ছে তা একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাস মাত্র, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। ইসলামে প্রথম জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, আর পাশ্চাত্যে আদপেই আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। ইসলামের গোটা কৃষ্টি ও সভ্যতাই ওহী ও রিসালাত সংক্রান্ত প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর পাশ্চাত্যে ওহীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ এবং রিসালাতের যথার্থতা সম্পর্কে সংশয় রয়েছে। ইসলামে আখিরাত বিশ্বাস হচ্ছে গোটা জীবন পদ্ধতি ও আচরণবিধির ভিত্তি, আর পাশ্চাত্যে এ ভিত্তিটাই ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত। ইসলামে যেসব ইবাদত বন্দেগী ও ক্রিয়াকান্ড ফরয বলে গণ্য, পাশ্চাত্যে তা শুধু জাহিলী যুগের অর্থহীন প্রথা মাত্র। এইভাবে ইসলামের গোটা তাহযীব ও তমদ্দুন

পাশ্চাত্যের কৃষ্টি সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আইনের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো, আল্লাহ্ই হচ্ছেন আইন প্রণেতা; রসূল আইনের ব্যাখ্যাতা, আর মানুষ শুধু আইনের অনুগত মাত্র। কিন্তু পাশ্চাত্যে আইন প্রণয়নে খোদার কোনো অধিকারই স্বীকৃত নয়। সেখানে আইন পরিষদ হচ্ছে আইন প্রণেতা আর জনগণ পরিষদের নির্বাচক। রাষ্ট্রনীতিতে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে খোদায়ী হুকুম কায়েম করা, আর পাশ্চাত্যের লক্ষ্য জাতীয় রাষ্ট্র। ইসলামের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদ আর পাশ্চাত্যের লক্ষ্যস্থল হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। অর্থনীতিতে ইসলাম হালাল উপার্জন এবং যাকাত ও সদকা প্রদান ও সুদ বর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে, আর পাশ্চাত্যের গোটা অর্থ ব্যবস্থাই সুদ ও মুনাফার ভিত্তিতে চালিত। নীতিশাস্ত্রে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে আখিরাতের সাফল্য আর পাশ্চাত্যের লক্ষ্য হচ্ছে দুনিয়ার মঙ্গল।

অনুরূপভাবে সামাজিক বিষয়াদিতেও ইসলামের পথ প্রায় প্রতিটি ব্যাপারেই পাশ্চাত্যের পথ থেকে ভিন্নতর। পর্দা ও পোশাক, নারী পুরুষের সম্পর্ক, একাধিক বিবাহ, বিবাহ তালাক সংক্রান্ত আইন, জন্মনিয়ন্ত্রণ, পিতামাতার অধিকার, স্বামী স্ত্রীর অধিকার এবং এ ধরনের আরো বহুতরো বিষয়ে এ দু' সভ্যতার পার্থক্য অনেক এবং এতো প্রকট যে, তা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করা নিস্প্রয়োজন। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, উভয় সভ্যতার মূলনীতিই পৃথক। আমাদের যুবসমাজ পরাভূত ও গোলামিসুলভ মানসিকতা এবং অসম্পূর্ণ ইসলামী শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের সঙ্গে যখন ঐ পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবাধীনে ট্রেনিং লাভ করলো, তখন তার পরিণাম ফল যা হবার তা-ই হলো। তাদের মধ্যে ভালো মন্দ বিচারের কোনো যোগ্যতা সৃষ্টি হলোনা। পাশ্চাত্য থেকে তারা যা কিছু শিখছিলো, তাকেই যথার্থ ও বিশুদ্ধতার মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করলো। অতপর অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত জ্ঞান নিয়ে ইসলামের নীতি ও আইন কানুনকে তারা উক্ত মানদন্ডে যাচাই করতে লাগলো এবং কোনো বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পেলে কখনো পাশ্চাত্যের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পারেনি; বরং ইসলামকেই ত্রুটিপূর্ণ মনে করে তার নীতিও আইন কানুনের সংশোধন ও পরিবর্তন করতে প্রস্তুত হলো।

ফলকথা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে আধুনিক শিক্ষা হিমালিয়ান উপমহাদেশের মুসলমানদের যতোই কল্যাণ সাধন করুক না কেনো, তাদের ধর্ম ও সভ্যতার যে বিরাট ক্ষতিসাধন করেছে, কোনো কল্যাণের দ্বারাই তা পূর্ণ হতে পারেনা। (তরজমানুল কুরআন : অক্টোবর ১৯৩৪ইং)

❖ ❖ ❖

৩

আধুনিক কালের ব্যাধিগ্রস্ত জাতিসমূহ

আজ প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই একই বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। তাহলো, নিরেট বস্তুতান্ত্রিকতার ক্রোড়ে লালিত এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি এসে সবার ওপর চেপে বসেছে। তাই সভ্যতার চিন্তা-পদ্ধতি ও কর্মকৌশল উভয়েরই ইমারত গড়ে উঠেছে ভ্রান্ত বুনিয়াদের ওপর। এর দর্শন, বিজ্ঞান, নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি, আইন কানুন ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিসই এক ভ্রান্ত জায়গা থেকে যাত্রা করে এক ভ্রান্ত পথে উৎকর্ষ লাভ করে এসেছে। আর বর্তমানে সে এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, তার ধ্বংসের শেষ প্রান্ত খুবই নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে।

এই সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে এমন লোকদের মধ্যে, যাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো স্পষ্ট ও পবিত্র উৎসই বর্তমান ছিলোনা। সেখানে ধর্মগুরু বা পুরোহিতদের অস্তিত্ব অবশ্যি ছিলো; কিন্তু তাদের কাছে বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান বিজ্ঞান, খোদায়ী কানুন-এর কোনোটাই বর্তমান ছিলোনা। তাদের কাছে যে বিকৃত ধর্মীয় মতবাদটি ছিলো, তা মানবজাতিকে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে সোজা পথ প্রদর্শন করতে চাইলেও তা করতে মোটেই সক্ষম ছিলোনা। বরং তা শুধু পারতো জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করতে। আর কার্যত সে তা-ই করলো। তার এই প্রতিবন্ধকতার ফলে যারা উন্নতি ও তরক্কীর জন্যে উৎসুক ছিলো, তারা ধর্ম ও ধার্মিকতার উপর আঘাত হেনে এক ভিন্ন পথে যাত্রা করলো। এ পথে অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ এবং অনুমান ও অন্বেষণ ছাড়া আর কোনোই দিশারী ছিলোনা। এ দিশারীটি ছিলো সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য এবং নিজেই দিশারী ও আলোর মুখাপেক্ষী। তবু এটিই তাদের প্রধান নির্ভর হয়ে দাঁড়ালো। এর সাহায্যে তারা চিন্তা ভাবনা, গবেষণা, অনুশীলন ও সংগঠন পুণর্গঠনের পথে অনেক চেষ্টা সাধনা করলো। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা ভ্রান্তির সূচনা করে বসলো এর ফলে তাদের সমস্ত উন্নতির গতিধারাই এক ভ্রান্ত লক্ষ্যস্থলের দিকে নিবদ্ধ হলো। তারা ধর্মহীনতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করলো। তারা বিশ্ব প্রকৃতিকে এভাবে দেখলো যে, তার কোনো স্রষ্টা ও নিয়ন্তা (খোদা) নেই। বিশ্বজগত ও প্রাণীজগতের প্রতি এভাবে তাকালো যে, সত্যতা রয়েছে শুধু পর্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির। এই দৃশ্যমান পর্দার আড়ালে আর কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই। এভাবে অভিজ্ঞতা ও অনুমানের সাহায্যে তারা প্রাকৃতিক নিয়মকে জানতে ও বুঝতে সক্ষম হলো বটে, কিন্তু প্রকৃতির স্রষ্টা অবধি পৌঁছতে পারলোনা।

অনুরূপভাবে তারা বিশ্বের ব্যবহারযোগ্য বস্তুনিচয়কে নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে পেলো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো ব্যবহারও করলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা যে ঐ

গুলোর মালিক ও নিয়ামক নয়; বরং আসল মালিকের প্রতিনিধি মাত্র – এই ধারণা থেকেই তাদের মন মগজ একেবারে শূণ্য ছিলো। এই অজ্ঞতা ও অচেতনা তাদেরকে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহির মৌলিক ধারণা সম্পর্কে অচেতন করে দিয়েছিলো। এর ফলে তাদের গোটা কৃষ্টি ও সভ্যতাই ভ্রান্ত ভিত্তির ওপর গড়ে উঠে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে 'আত্মা'র পূজারী হয়ে দাঁড়ায় এবং 'আত্মার' আল্লাহ্‌র স্থান দখল করে তাদেরকে কঠিন ফিত্‌না ও বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেদেয়। সেই মিথ্যা খোদার বন্দেগীই আজ তাদেরকে চিন্তা ও কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক মারাত্মক পথে টেনে নিয়ে চলছে। এ পথের মধ্যকার পর্যায়গুলো নেহাত ভীতিপ্রদ ও চোখ ধাঁধানো হলেও তার শেষ পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই ভূয়া খোদাই বিজ্ঞানকে মানুষের ধ্বংসের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। নৈতিকতাকে আত্মপূজা, প্রদর্শনেচ্ছা, অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছে। অর্থ ব্যবস্থার ওপর স্বার্থপরতার ও ভ্রাতৃহত্যার শয়তান চাপিয়ে দিয়েছে। সামাজিকতার শিরা উপশিরায় আত্মপূজা, বিলাসপ্রিয়তা ও আত্মকেন্দ্রীকতার হলাহল ঢেলে দিয়েছে। রাজনীতিকে জাতীয়তাবাদ, স্বদেশিকতা, বর্ণ ও গোত্রের পার্থক্য এবং শক্তি পূজার দ্বারা দুষিত করে মানবতার পক্ষে এক নিকৃষ্টতম অভিশাপ বানিয়ে দিয়েছে। ফলকথা পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ আসলে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপন করে, কয়েক শতকের মধ্যেই তা কৃষ্টি ও সভ্যতার এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়। সে বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট হলেও আসলে তা বিষদুষ্ট, তার ফুল দেখতে সুন্দর ও সুদৃশ্য হলেও আদতে কাঁটাযুক্ত, তার শাখা প্রশাখায় বসন্তের শোভা থাকলেও তার থেকে প্রবাহিত বিষাক্ত বায়ু ভেতরে ভেতরে গোটা মানবতাকেই বিষাক্ত করে চলছে।

যে পাশ্চাত্যবাসিগণ এই বিষবৃক্ষকে সহস্তে রোপন করেছিল, তারা আজ নিজেরাই তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। করণ সে বৃক্ষ জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে এমন বিভ্রান্তি, জটিলতা ও পেরেশানির সৃষ্টি করেছে যে, তার যে কোনো প্রচেষ্টাই অসংখ্য জটিলতা ডেকে নিয়ে আসে। তার যে কোনো ডালই তারা কেটে ফেলে দেয়, সেখান থেকে, অসংখ্য কাঁটাযুক্ত ডাল ফুটে বেরোয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তারা পুঁজিবাদের ওপর করাত চালালো, সংগে সংগে কম্যুনিজমের অভ্যুদয় ঘটলো। গণতন্ত্রের ওপর আঘাত হানলো অমনি ডিক্টেটরবাদ আত্মপ্রকাশ করলো। সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান করতে গেলো, সংগে সংগে নারীত্ববাদ ও জন্মনিয়ন্ত্রণের আর্বিভাব হলো। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিকারের জন্যে আইন প্রয়োগের চেষ্টা করলো, তার ফলে আইন লংঘন ও অপরাধ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। ফলকথা, কৃষ্টি ও সভ্যতার এই বিষবৃক্ষ থেকে বিকৃতি ও বিচ্ছৃঙ্খলার এক অন্তহীন ধারা বেরিয়ে আসছে এবং তা পাশ্চাত্য জীবনকে আপাদ মস্তক দুঃখ কষ্ট ও ক্লেশের এক বিরাট ফোঁড়ার জ্বালা-যন্ত্রণা প্রতিটি শিরা উপশিরা ও স্নায়ুকেন্দ্রে অনুভূত হচ্ছে।

পাশ্চাত্য জাতিগুলো আজ সে ফোঁড়ার তীব্র যাতনায় আর্তনাদ করে উঠছে। তাদের হৃদয় মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তাদের আত্মা কোনো অমৃত রসের জন্যে

ছটফট করছে। কিন্তু অমৃতরস কোথায় পাওয়া যাবে, সে খবরই তাদের জানা নেই। তাদের অধিকাংশ লোক এখনো ভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে যে সমস্যার আসল **উৎস হচ্ছে** ঐ বিষবৃক্ষের শাখা প্রশাখা মাত্র। তাই ডালপালা কাটবার কাজেই তারা নিজেদের সমস্ত সময় ও মেহনত নিয়োজিত করছে। কিন্তু তবু তারা বুঝতে পারেনা যে, বিকৃতিটা ডাল পালায় নয়; বরং গাছের মূল শিকড়ে অবস্থিত। আর অসৎ বৃক্ষমূল থেকে সৎ ডালপালা বেরুনোর প্রত্যাশা করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়।

পক্ষান্তরে আপন সভ্যতা বৃক্ষের মূলগত খারাপীকে উপলব্ধি করতে পেরেছে, এমন একটি ক্ষুদ্র দলও সেখানে রয়েছে। কিন্তু যেহেতু তারা কয়েক শতক ধরে ঐ বৃক্ষের ছায়ায় প্রতিপালিত হচ্ছে এবং তারই ফল-ফলারি থেকে তাদের অস্থি-গোশ্‌ত গঠিত হয়েছে, তাই এর মূল ছাড়া অন্য কোনো মূল থেকে সৎ ডালপালা বিস্তৃত হতে পারে, তাদের মনমানস এ কথা উপলব্ধিই করতে অক্ষম। ফলে উভয় দলেরই অবস্থা দাঁড়িয়েছে এক রকম। তারা অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে তাদের যন্ত্রণা উপশমকারী কোনো জিনিস সন্ধান করে ফিরছে; কিন্তু তাদের অভীষ্ট বস্তুটি কি এবং তা কোথায় পাওয়া যাবে, এ খবরই তাদের জানা নেই।

বস্তুত পাশ্চাত্য জাতিগুলোর সামনে কুরআন ও মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শ ও কর্মনীতি পেশ করার এটাই উপযুক্ত সময়। আজ তাদের বলা দরকার, তোমাদের হৃদয় মন যে ইপ্সিত বস্তুটির জন্যে উদ্বেলিত, তা হচ্ছে এই। যে অমৃতরসের জন্যে তোমরা চাতকের ন্যায় পিপাসার্ত, তা হচ্ছে এই। এ হচ্ছে এমন পূত পবিত্র মহীরুহ, যার মূল কান্ড এবং ডালপালা উভয়টাই সৎ। এর ফুল যেমন খুশবুদার, তেমনি কাঁটামুক্ত। এর ফল যেমন সুস্বাদু তেমনি প্রাণসঞ্চারক। এর হাওয়া যেমন আরামদায়ক, তেমনি হৃদয়-মন শীতলকারী। এখানে তোমরা বাস্তব বিচার বুদ্ধির সন্ধান পাবে, চিন্তা ও দৃষ্টির একটি নির্ভুল কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে পাবে এবং সর্বোত্তম মানবীয় চরিত্র গঠনের উপযোগী জ্ঞানের সাক্ষাত পাবে। তোমরা এখানে এমন আধ্যাত্মিকের সন্ধান পাবে, যা সন্যাসী ও সংসার বৈরাগীদের জন্যে নয়; বরং দুনিয়ার কর্মক্ষেত্রে সংগ্রামকারীদের জন্যে আত্মিক শান্তি ও মানসিক স্বস্তির একমাত্র উৎস। এখনে তোমরা নৈতিকতা ও আইন কানুনের এমন উন্নত ও সুদৃঢ় বিধি ব্যবস্থা দেখতে পাবে, যা মানব প্রকৃত সংক্রন্ত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা কখনো প্রবৃত্তির তাড়নায় বদলে যেতে পারেনা। এখানে তোমরা কৃষ্টি সভ্যতার এমন নির্ভুল মূলনীতির সন্ধান পাবে, যা অবৈধ শ্রেণী-বৈষম্যও কৃত্রিম জাতি-বিভেদকে নিশ্চিহ্ন করে মানব সমাজকে খালেস যুক্তিসম্মত ভিত্তির ওপর সংগঠিত করে। সে মূলনীতি সাম্য, সুবিচার, উদারতা, দানশীলতা ও সদাচরণের এমন এক শক্তিময় ও সুসংগত পরিবেশ সৃষ্টি করে, যাতে ব্যক্তি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে স্বার্থ, অধিকার ও প্রয়োজনের খাতিরে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও লড়াই বাধবার কোনোই অবকাশ নেই; বরং সবাই এখানে পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যক্তিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্যে সানন্দে ও সন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করতে পারে। কাজেই তোমরা যদি ধ্বংসের হাত থেকে

রক্ষা পেতে চাও, তাহলে এক প্রচন্ড আঘাত এসে তোমাদের কৃষ্টি সভ্যতাকে চুর্ণবিচুর্ণ করে ইতিহাসের ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষ্টি সভ্যতাগুলোর শামিল করে দেবার আগেই ইসলামের বিরুদ্ধে তামাম বিদ্বেষকে তোমাদের মন থেকে মুছে ফেলে দাও। তোমরা মধ্যযুগের ধর্মীয় উন্মাদদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে বিদ্বেষ লাভ করেছ এবং সেই অন্ধকার যুগের তামাম জিনিসের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার পরও যাকে তোমরা আজ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে রয়েছ, তাকে পরিহার করো এবং উদার মনে কুরআন ও মুহাম্মদ সা.-এর মহান শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হও, তাকে গ্রহণ করো।

মুসলিম জাতিগুলোর অবস্থা পাশ্চাত্য জাতিগুলো থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। এদের রোগ যেমন আলাদা, রোগের কারণও ভিন্ন। কিন্তু তাদের চিকিৎসা পাশ্চাত্য বাসীদেরই অনুরূপ। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর শেষ কিতাব ও শেষ নবীর মাধ্যমে যে জ্ঞান ও হেদায়াত পাঠিয়েছেন, তার দিকে প্রত্যাবর্তন করাই তাদের চিকিংসা।

যে পরিস্থিতিতে ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত বেধেছে, তা ইসলাম ও অন্যান্য সভ্যতার মধ্যকার পূর্ববর্তী সংঘাত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। রোমক, পারসিক, ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতার সংগে যখন ইসলামের সংঘর্ষ বাধে, তখন ইসলাম তার অনুবর্তীদের চিন্তা ও কর্মশক্তির উপর পূর্ণ মাত্রায় কর্তৃত্বশীল ছিলো। তাদের ভিতরে জিহাদ ও ইজতিহাদের প্রচন্ড ভাবধারা ক্রিয়াশিল ছিলো। আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক উভয় দিক থেকেই তারা দুনিয়ায় এক বিজয়ী জাতির গৌরব অর্জন করেছিলো এবং অন্য সব জাতির উপর নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলো। তখন দুনিয়ার কোনো কৃষ্টি সভ্যতাই তাদের কৃষ্টি সভ্যতার মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারেনি। তারা যেদিকে এবং যে জাতির কাছেই পৌঁছেছে, তার চিন্তাদর্শ, মতাদর্শ, জ্ঞান বিজ্ঞান, স্বভাব চরিত্র ও সমাজ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। তাদের মধ্যে বাইরের প্রভাব গ্রহণের যোগ্যতার চেয়ে প্রভাব বিস্তারের শক্তি ছিলো অনেক বেশি। নি:সন্দেহে তারা অন্যদের কাছ থেকেও অনেক কিছু গ্রহণ করেছে; কিন্তু তাদের সভ্যতার মেজাজ এতোখানি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ছিলো যে, বাহির থেকে এসে যা কিছুই তাতে যুক্ত হয়েছে, তা তার প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে গিয়েছে এবং বাইরের কোনো প্রভাবেই তার মেজাজে এতটুকু পার্থক্য সুচিত হয়নি। পক্ষান্তরে সে অন্যদের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা একেবারে বিপ্লবাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে কোনো কোনো অমুসলিম সভ্যতা তো ইসলামের মধ্যে বিলীন হয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্যই বিলিয়ে দিয়েছে। আর যেগুলোর মধ্যে জীবনী শক্তি প্রবল ছিলো. সেগুলোও ইসলামের দ্বারা এতোটা প্রভাবিত হয়েছে যে, তাদের মুলনীতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। কিন্তু এ হচ্ছে তখনকার কথা, যখন মুসলমানদের ভেতর আদর্শের দীপশিখা অম্লান ও অনির্বাণ ছিলো।

মুসলমানরা কয়েক শতক ধরে লেখনী ও তরবারির সাহায্যে রাজত্ব চালিয়ে শেষ পর্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়লো। তাদের জিহাদী প্রাণশক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

ইজতিহাদী শক্তি নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। যে মহাগ্রন্থ তাদেরকে জ্ঞানের রৌশনি ও কর্মের শক্তি যুগিয়েছিলো, তাকে তারা নিছক একটি পবিত্র স্মৃতিশাস্ত্র বানিয়ে গেলাফবন্দী করে রেখেছে। যে মহান নায়কের অনুসৃত নীতি তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে এক পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তবধর্মী জীবনাদর্শের রূপদান করেছিল, তাঁর অনুসৃতিকে তারা বর্জন করলো। তার ফলে তাদের উন্নতি ও তরক্কীর গতি স্তব্ধ হয়ে গেলো। প্রবহমান স্রোতস্বিনী হঠাৎ নিশ্চল উপত্যকায় এসে গতিরুদ্ধ হয়ে ক্ষুদ্র সরোবরে পরিণত হলো। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন থেকে মুসলমানরা অপসারিত হলো। তাদের চিন্তাধারা জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প সভ্যতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দুনিয়ার অন্যজাতির ওপর যে আধিপত্য বিস্তার করেছিলো, তার বাঁধন শিথিল হয়ে গেলো। পরন্তু ইসলামের মোকাবিলায় পাশ্চাত্যে এক ভিন্ন সভ্যতার অভ্যুদয় হলো। মুসলমানেরা জিহাদ ও ইজতিহাদের যে ঝান্ডাকে দুরে নিক্ষেপ করেছিলো, পাশ্চাত্য জাতিগুলো তাকে নিজ হাতে তুলে নিলো। মুসলমানরা আরামে শুয়ে রইলো আর পাশ্চাত্যবাসী তাদের পরিত্যক্ত ঝান্ডা নিয়ে জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে এগিয়ে চললো। এমনকি যে নেতৃত্বের আসন থেকে তারা অপসারিত হয়েছিলো সেই আসনই এরা লাভ করলো। তাদের তরবারি দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকাই জয় করলো। তাদের চিন্তাধারা, মতাদর্শ, জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার মূলনীতি সারা দুনিয়ার ওপর ছড়িয়ে পড়লো। তাদের শাসন কর্তৃত্ব শুধু মানুষের দেহকেই নয়, তার দিল-দেমাগকেও অধিকারভুক্ত করে নিলো। অবশেষে কয়েক শতকের নিদ্রা থেকে জেগে উঠে মুসলমানরা চোখ মেলেই দেখতে পেলো, ময়দান সম্পূর্ণই তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে এবং অন্য লোকেরা এসে তার ওপর জেঁকে বসেছে। এখন জ্ঞান বিজ্ঞান, কৃষ্টি সভ্যতা, আইন কানুন ও রাষ্ট্রক্ষমতা বলতে যা কিছুই আছে, সবই তাদের (মুসলমানদের) হাতে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তাদের কাছে রয়েছে শুধু দীপ্তিহীন এক আলোক বর্তিকা।

আজকে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে এক নতুন ধারায়। নিসন্দেহে পাশ্চাত্য সভ্যতা কোনো দিক দিয়েই ইসলামী সভ্যতার মোকাবিলা করতে সমর্থ নয়। এমনকি ইসলামের সঙ্গে যদি সংঘর্ষ বাধে, তবে দুনিয়ার কোনো শক্তিই তার সামনে টিকে থাকতে পারেনা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ইসলাম কোথায়? আজকের মুসলমানদের মধ্যে যেমন ইসলামী স্বভাব প্রকৃতি ও নৈতিক চরিত্রের বালাই নেই, তেমনি নেই ইসলামী চিন্তাধারা ও কর্ম প্রেরণা। তাদের মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ কোথাও সত্যিকার ইসলামী প্রাণ চেতনা নেই। তদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ইসলামী আইন কার্যকর নয়, তেমনি নয় তাদের সামাজিক জীবনেও। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন একটি শাখার ব্যবস্থাপনা প্রকৃত ইসলামী প্রণালীর উপর ভিত্তিশীল নয়। এমতাবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে নয়; বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এক প্রাণবান, গতিশীল, জ্ঞানদীপ্ত ও কর্মচঞ্চল সভ্যতার সাথে মুসলমানদের নিশ্চল, জরাজীর্ণ ও অনগ্রসর সভ্যতার।

আর এমনি অসম প্রতিযোগিতার ফলাফল যা হবার কথা, তাই হচ্ছে। মুসলমানরা ক্রমাগত পিছু হটছে। তাদের সভ্যতা পরাভূত হচ্ছে। ধীরে ধীরে তারা পাশ্চাত্য কৃষ্টির মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাদের মনমগজে দিন দিন পাশ্চাত্যপনা চেপে বসছে। পাশ্চাত্য ছাঁচে তাদের মানসিক কাঠামো গড়ে উঠছে। পাশ্চাত্যনীতির প্রেক্ষিতে তাদের চিন্তা ও দৃষ্টিশক্তির পরিশীলন হচ্ছে। তাদের ধ্যানধারণা, নৈতিকতা, অর্থনীতি, সামাজিকতা, রাজনীতি ইত্যাদি প্রতিটি জিনিসই পাশ্চাত্যের রঙে রঞ্জিত হচ্ছে। তাদের নব্য বংশধরগণের মনমানসে এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে, পাশ্চাত্য থেকে প্রাপ্ত বিধানই হচ্ছে সত্যিকার জীবন বিধান। সুতরাং এ পরাজয় হচ্ছে আসলে মুসলামানদের পরাজয় - ইসলামের পরাজয় নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একে ইসলামের পরাভব বলে বিবেচনা করা হচ্ছে!

এই কঠিন বিপদে শুধু একটি দেশই পরিবেষ্টিত নয়। কেবল একটি জাতিই এ সংকটের মুখোমুখি নয়। আজ গোটা মুসলিম জাহানই এই ভয়াবহ বিপ্লবের পর্যায় অতিক্রম করে চলছে। প্রকৃতপক্ষে এই বিপ্লবের যখন সূত্রপাত হচ্ছিল, ঠিক তখন থেকেই সচেতন ভূমিকা গ্রহণ করা, আসন্ন সভ্যতার নীতি ও ভিত্তিমূলকে উপলব্ধি করা এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহ পরিভ্রমণ করে এর বুনিয়াদী জ্ঞানবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা ছিলো আলিম সমাজের কর্তব্য। তাঁদের উচিত ছিলো, যেসব কার্যকরী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বাস্তব প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে পাশ্চাত্য জাতিগুলো উন্নতি লাভ করছে, ইজতিহাদী শক্তির দ্বারা সেগুলোকে আয়ত্বাধীন করে নিয়ে ইসলামী নীতির আলোকে মুসলমানদের শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। এতে করে যেমন শত শত বছরের নিষ্ক্রয়তাজনিত ক্ষতি পূর্ণ হয়ে যেতো, তেমনি ইসলামের গাড়ীও আবার যুগের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হতো। কিন্তু আক্ষেপের ব্যাপার হলো, খোদ আলিম সমাজই (ব্যতিক্রম ছাড়া) তখন ইসলামের সত্যিকার প্রাণচেতনা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে না ছিলো ইজতিহাদী শক্তি, না চিন্তা গবেষণার ক্ষমতা। তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম শক্তিও লোপ পেয়েছিলো। খোদার কিতাব ও রসূলে খোদার আদর্শিক ও বাস্তব হেদায়াত থেকে ইসলামের সনাতন ও গতিশীল নীতি নির্ধারণ করে যুগের পরিবতির্ত অবস্থায় তাকে প্রয়োগ করার কোনো যোগ্যতাই তাঁদের মধ্যে ছিলোনা। তাদের মধ্যে পূর্ব পূরুষদের অন্ধ ও অনড় তাকলিদের ব্যাধি পুরোপূরি সংক্রেমিত হয়েছিল। এর ফলে প্রতিটি জিনিসই তাঁরা এমন কিতাবাদিতে খোঁজ করতেন, যা কোনো কালোত্তীর্ণ খোদায়ী কিতাব ছিলোনা। তাঁরা প্রতিটি ব্যাপারেই এমন লোকদের মুখাপেক্ষী হতেন, যাদের মধ্যে নবীদের মতো সময় ও পরিবেশের বন্ধনমুক্ত উদার দূরদৃষ্টি ছিলোনা। কাজেই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অবস্থায় মুসলমানদের সাফল্যজনক নেতৃত্ব দান করা তাঁদের পক্ষে কি করে সম্ভব ছিলো? তখন তো জ্ঞানবিজ্ঞান ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে এমন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কেবল খোদার পক্ষেই সম্ভবপর ছিলো। কিন্তু যুগ যুগান্তকালের আবরণ ভেদ করে সে পর্যন্ত পৌঁছবার মতো দৃষ্টিশক্তি কোন সাধারণ মানুষের ছিলোনা।

একথা নিসন্দেহ যে, আলিম সমাজ নয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির মোকাবিলা করার জন্যে যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ ও সাজ সরঞ্জাম তাঁদের কাছে ছিলোনা। কারণ স্থবিরতার দ্বারা গতিশীলতার মোকাবিলা করা যায়না। তর্কশাস্ত্রের বলে যুগের গতিকে বদলানো যেতে পারেনা। নয়া অস্ত্রপাতির সামনে অকেজো মরচে ধরা হাতিয়ার কোনো কাজেই লাগতে পারেনা। আলিম সমাজ যেসব পন্থায় জাতির নেতৃত্ব প্রদান করতে চাইছিলেন, তাতে সাফল্যের কোনো সম্ভাবনাই ছিলোনা। যে জাতি পাশ্চাত্য সভ্যতার বন্যা প্রবাহে বেষ্টিত হয়ে পড়েছিলো, সে চোখের ওপর ঠুলি বেঁধে এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে নিষ্ক্রিয় করে বন্যার অস্তিত্বকে কতোক্ষণ অস্বীকার করতে এবং তার প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকতে পারতো? যে জাতির ওপর আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি রাষ্ট্রশক্তিসহ চেপে বসেছিলো, পরাভূত ও পদানত অবস্থায় সে তার বাস্তব জীবনকে ওই সভ্যতার প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে কিভাবে রক্ষা করতে পারতো? বস্তুত এমনি পরিস্থিতিতে যা হবার শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরাজয় বরণের পর মুসলমানরা জ্ঞান বিজ্ঞান ও তাহযীব তমদ্দুনের ক্ষেত্রেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুসলিম জাহানের প্রতিটি দেশেই পাশ্চাত্যপনার তুফান মহামারীর বেগে ছড়িয়ে পড়েছে। আর তা বন্যা প্রবাহে ভাসতে ভাসতে মুসলমানদের নব্য বংশধরগণ ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাচ্ছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের আলিম সমাজ আজ পর্যন্ত তাঁদের ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পারেননি। যে নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রথমদিকে আলিম সমাজ ব্যর্থতার গ্লানি বরণ করে নিয়েছিলেন, আজো প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশেই তাঁরা সেই একই দৃষ্টিভঙ্গির ওপরই অবিচল রয়েছেন। কতিপয় ব্যক্তিক্রম ব্যক্তিত্বকে বাদ দিলে আলিম সমাজের সাধারণ অবস্থা হচ্ছে এই যে, যুগের বর্তমান গতি-প্রকৃতি ও মানসিকতার নতুন গড়নকে উপলব্ধি করার কোনো চেষ্টাই তাঁরা করেননা। যেসব বিষয় মুসলমানদের নব্য বংশধরগণকে ইসলাম থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর প্রতি তাঁরা যতো খুশি ঘৃণা প্রকাশ করতে প্রস্তুত; কিন্তু সে হলাহলের প্রতিকার করার মতো ঝুঁকি গ্রহণ করতে তাঁরা অসমর্থ। আধুনিক পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্যে যে জটিল বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব সমস্যাবলীর সৃষ্টি করেছে, সেগুলোর সমাধান করতে তারা হামেশাই অপারগ। এর কারণ হলো, ইজতিহাদ ছাড়া ঐ সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভবপর নয়। অথচ ইজতিহাদকে এঁরা নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছেন। বস্তুত আজকে আমাদের আলিম সমাজ ইসলামের শিক্ষা ও তার বিধিব্যবস্থা প্রচার করার জন্যে যে পন্থা অবলম্বন করছেন তা আধুনিক শিক্ষিত লোকদেরকে ইসলামের সাথে পরিচিত করানোর পরিবর্তে উল্টো তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ করে দেয়। এমনকি কখনো কখনো তাদের ওয়াজ নসীহত শুনে কিংবা তাদের রচনাবলী পড়ে স্বতস্ফূর্তভাবেই মন থেকে বলে উঠে, খোদা যেনো কোনো অমুসলিম বা পথভ্রষ্ট মুসলিমের কান পর্যন্ত এইসব অর্থহীন প্রলাপ না পৌঁছান! মোটকথা, আমাদের

আলিম সমাজ তাঁদের চারদিকে দু'শ বছরের পুরনো পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছেন। সেই পরিবেশেই তাঁরা চিন্তা ভাবনা করেন, তার ভেতরেই তারা বাস করেন এবং তার উপযোগী কথাবার্তা তাঁরা বলেন। একথা নিসন্দেহ যে, এই সম্মানিত ব্যক্তিদের কল্যাণেই আজও দুনিয়ার ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের অমূল্য রত্নরাজি সংরক্ষিত রয়েছে এবং তাদের প্রচেষ্টার ফলেই আজ ইসলামী শিক্ষা যা কিছু বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু তাঁরা নিজেদের এবং সমসাময়িক যুগের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, তা-ই ইসলাম ও আধুনিক দুনিয়ার মধ্যে কোনোরূপ সম্পর্ক স্থাপনে বাধার সৃষ্টি করছে। এর ফলে যারা ইসলামী শিক্ষার দিকে অগ্রসর হয়, তারা আর দুনিয়ার কোনো কাজের উপযোগী থাকেনা। আর যে দুনিয়ার কাজের যোগ্য হতে চায়, সে ইসলামী শিক্ষার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত থেকে যায়। এই কারণেই আজ মুসলিম জাহানের সর্বত্র দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দলের অস্তিত্ব দেখা যায়। একদল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী সভ্যতার নিশানবর্দার, কিন্তু জীবনের সর্বত্র মুসলমানদের নেতৃত্ব দানে অক্ষম। আর দ্বিতীয় দল মুলসমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও রাজনীতির গাড়িকে চালিত করছে বটে কিন্তু ইসলামের নীতি ও ভিত্তি, ইসলামী সভ্যতার প্রাণবস্তু এবং ইসলামের সমাজ পদ্ধতি ও তামাদ্দুনিক বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অপরিচিত ও অনবহিত। এদের হৃদয়ের কোণে ঈমানের কিছুটা আলো রয়েছে বটে; অন্যান্য সবদিক থেকে এদের এবং অমুসলমানের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। কিন্তু যেহেতু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বাস্তব কর্মশক্তি এই দলটিরই করায়ত্ব রয়েছে এবং এদের বাহুতেই গাড়ি চালানোর মতো শক্তি রয়েছে, এজন্যই তারা মিল্লাতের গোটা গাড়িটি নিয়ে ভ্রান্তি ও গুমরাহীর পথে দ্রুত এগিয়ে চলছে। সে পথ থেকে তাদের ফিরিয়ে রাখা এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করার মতোও আজ আর কেউ নেই।

আমি এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করছি এবং এর ভয়ঙ্কর পরিণতিও নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি। যদিও নেতৃত্ব দান করার জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা আমার নেই এবং এমনি বিকৃত পরিবেশে, এতো বড় একটি জাতির সংশোধন করার মতো শক্তিও আমার নেই, তবু আল্লাহ আমার হৃদয়ে একটি ব্যথা দিয়েছেন। আজ যে সামান্য জ্ঞান ও বিচক্ষণতা তিনি আমায় দান করেছেন, তার সাহায্যে মুসলমানদের ঐ দু'টি দলকে ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতির আসল ও প্রকৃত উৎসের দিকে মনোযোগী হবার আহ্বান জানানো এবং সাফল্য ও ব্যর্থতার কোনো তোয়াক্কা না করে নিজের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্যে সেই ব্যথাই আমায় বাধ্য করছে। কাজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিজের দুর্বলতা দেখে আমার এই প্রচেষ্টাকে নিজের কাছেই তুচ্ছ বলে মনে হয়; কিন্তু সাফল্য বা ব্যর্থতা - সবকিছুই হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতে। আমার কাজ শুধু চেষ্টা করে যাওয়া। তাই সাধ্যানুযায়ী আমি আমার চেষ্টার পরিধিকে বিস্তৃত করতে চাই। (তরজমানুল কুরআন ঃ অক্টোবর ১৯৩৫ ইং)

❖ ❖ ❖

৪

মানবীয় আইন বনাম আল্লাহ্‌র আইন

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার মদ্য নিবারক আইনটি যথারীতি বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফলে সভ্য দুনিয়ার অধিবাসীরা প্রায় চৌদ্দ বছর পর আবার নিরসের সীমা পেরিয়ে রসের চৌহদ্দীতে পদার্পণ করে। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্টের প্রেসিডেন্ট পদে মিঃ রুজভেল্টের অভিষিক্ত হওয়াটাই ছিলো নিরসের ওপর রসের বিজয় লাভের প্রাথমিক ঘোষণা। এপ্রিল ('৩৩) মাসে একটি আইনের সাহায্যে শতকরা ৩১.২ ভাগ এ্যালকোহলযুক্ত মদকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। এরপর মাত্র কয়েক মাস অতিক্রান্ত না হতেই মার্কিন শাসনতন্ত্রের অষ্টাদশ সংশোধনীটি বাতিল করে দেয়া হলো। উক্ত সংশোধনী অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের চৌহদ্দীর মধ্যে মদের ক্রয়-বিক্রয়, আমদানি রফতানি ও চোলাই-প্রস্তুতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

বস্তুত আইনের সাহায্যে নৈতিকতা ও সামাজিক সংশোধনের এ ছিলো সবচাইতে বড় প্রচেষ্টা। দুনিয়ার ইতিহাসে এতো বড় প্রচেষ্টার আর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়না। অষ্টাদশ সংশোধনীর আগে 'এ্যন্টি সেলুন লীগ' নামক সংস্থা কয়েক বছর ধরে পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা বিবৃতি প্রচারপত্র, নক্‌শা-চিত্র, ম্যাজিক-লণ্ঠন, ছায়াছবি এবং অন্যান্য বহুতরো উপায় আমেরিকানদের মন-মগজে মদের অপকারিতাকে বদ্ধমূল করে দেবার চেষ্টা করছিল। এই বিরাট প্রচারকার্যে উক্ত সংস্থাটি পানির মতো অর্থের বন্যা ছুটিয়েছিল। অনুমান করা হয়েছে যে, আন্দোলনের সূচনা থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত শুধু প্রচারকার্যেই সাড়ে ছয় কোটি ডলার ব্যয়িত হয়েছে এবং মদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত বই-পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে, তার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিলো প্রায় নয়শো কোটির মতো!

এতদভিন্ন মদ্য নিবারক আইনটি কার্যকর করণে চৌদ্দ বছরে মার্কিন জাতিকে যে বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছিল, তার মোটামুটি পরিমাণ ৬৫ কোটি পাউণ্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ সম্প্রতি ১৯২০ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৩৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সময়কার যে সংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশ করেছে তা থেকে জানা যায়, উক্ত আইনটি কার্যকর করার ব্যাপারে মোট দু'শ ব্যক্তি নিহত হয়েছে, ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩'শ ৩৫ জনকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে, এক কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড জরিমানা ধার্য করা হয়েছে এবং ৪০ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

জান ও মালের এই ভয়াবহ ক্ষতি এজন্যেই বরদাশ্‌ত করা হয়েছিল যে, বিশ শতকের যে 'সুসভ্য' জাতির জ্ঞানের সূর্য মধ্যাহ্ন গগণ পর্যন্ত উপনীত হয়েছে, তাকে দুষ্কৃতির উৎস থেকে উৎসারিত বেশুমার আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও দৈহিক

ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করা হবে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার পূর্বে ও পরে কয়েক বছরের ক্রমাগত প্রচেষ্টা – যাতে সরকারি শক্তিও অংশীদার ছিল – মার্কিন জাতির মদ্যপান সংক্রান্ত সংকল্পের সামনে ব্যর্থকাম হলো এবং শেষ পর্যন্ত 'বিশ্ব-ইতিহাসের বৃহত্তম সংস্কার প্রচেষ্টা' নিষ্ফল হলো।

মদ্য নিবারণ প্রচেষ্টার এই ব্যর্থতা এবং নিবারক আইনটির এই রদকরণের কারণ মোটেই এই নয় যে, মদের যেসব অপকারিতা দূর করার জন্যে প্রচার-প্রোপাগান্ডা ও আইনগত শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল, এক্ষণে সেগুলো উপকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া পূর্ব ঘোষিত ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিচ্ছে; বরং পূর্বের চেয়েও ব্যাপক ও বিপুল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ এ সত্য স্বীকৃত হয়েছে যে, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার, সমমৈথুন, চৌর্যবৃত্তি, জুয়াখেলা, হত্যাকাণ্ড এবং এমনিতরো অন্যান্য নৈতিক অপরাধ এই পাপ কেন্দ্রেরই ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়। আর পাশ্চাত্য জাতিগুলোর নৈতিকতা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও সামাজিকতার ধ্বংস সাধনে এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু তবু মার্কিন সরকার এ কারণে তার আইনটি প্রত্যাহার করে হারামকে হালাল করতে বাধ্য হয়েছেন যে, মার্কিন জাতির বিপুল সংখ্যাধিক্য অংশ কোনো মতেই মদ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়নি। তাই চৌদ্দ বছর আগে যে মার্কিন জনমত মদকে হারাম করেছিল, আজ আবার তাকে হালাল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

আমাদের জানা মতে, আজ পর্যন্ত কোনো ঘোরতর সুরা সমর্থকও মদ্যপানের ক্ষতিকে অস্বীকার করতে পারেনি, অথবা নিবারক আইন বিরোধিগণ 'মদের আশীর্বাদ' সম্পর্কে এমন কোনো তালিকা পেশ করতে সক্ষম হয়নি, যা তার ক্ষতির তুলনায় কিছুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। মার্কিন কংগ্রেসে যখন জনমতের সমর্থনপুষ্ট অষ্টাদশ শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী উত্থাপিত হয়েছিল, তখনই 'রসহীনতা' ও 'রস-সমুদ্রের' সমস্ত দিকের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। আর সেসব ক্ষতি ও অনিষ্টকারিতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই কংগ্রেস উক্ত সংশোধনী বিলটি অনুমোদন করেছিল। ৪৬টি রাষ্ট্র উক্ত সংশোধনী সমর্থন করেছিল এবং প্রতিনিধি পরিষদ ও উচ্চ পরিষদ উক্ত সংশোধনী অনুসারে নিবারক আইন পাশ করেছিল। এসব কিছুই মার্কিন জাতির ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন হয়েছিল এবং যতোদিন নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারটি কাগজ-পত্র ও লোকমুখে সীমিত ছিলো, গোটা জাতি সানন্দে তাকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু যখনই এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলো, সমগ্র মার্কিন জাতির চেহারাই তখন বদলে গেলো। পাপাচারের অবর্তমানে একটিমাত্র রাত অতিবাহিত করেই দুনিয়ার সবচাইতে সভ্য, জ্ঞানী, সচেতন সত্যপ্রিয় এবং উন্নতিশীল জাতি একেবারে উন্মাদ হয়ে গেলো এবং বিরহের আবেগে সে এমন কাণ্ডকারখানা শুরু করে দিলো, যা দেখে সন্দেহ হতে লাগলো যে, এ জাতি বুঝি প্রাচ্যকাব্যের কাল্পনিক প্রেমিকদের মতো বাস্তবিকই নিজের মাথা ঠুকে গুঁড়িয়ে ফেলবে।

এর ফলে অনুমোদিত মদ্যালয়গুলো বন্ধ হবার সাথে সাথে দেশের সর্বত্র অসংখ্য গুপ্ত মদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। এসব আড্ডায় আইনের চোখে ধূলো দিয়ে মদ্যপান এবং তার কেনাবেচার জন্য বিচিত্র ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। কোনো ব্যক্তি তার কোন বন্ধু বা প্রিয়জনকে এসব গুপ্ত মদ্যালয় এবং নির্দিষ্ট সঙ্কেতগুলো জানিয়ে দিলে তা একটি বিশেষ অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হতো। পূর্বে সরকার লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদ্যালয়গুলোর সংখ্যা, সেগুলোতে ব্যবহৃত মদের ধরন এবং তাতে যাতায়াতকারীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারতো। কিন্তু পাপাচারের এই আড্ডাগুলো ছিলো সরকারি নিয়ন্ত্রণ সীমার বাইরে। এদের সংখ্যা ছিলো নিষিদ্ধকরণের পূর্বেকার অনুমোদিত শুঁড়ীখানাগুলোর চাইতে কয়েকগুণ বেশি। পরন্তু এসব আড্ডায় স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর, নিকৃষ্ট ধরনের শরাব বিক্রি হতে লাগলো। তাতে অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাদের যাতায়াত অনেক বেড়ে গেলো। এর ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখে যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাশীল মহলে ব্যাপক উদ্বেগের সঞ্চার হলো। মদের দাম পূর্বের চাইতে কয়েকগুণ বেশি চড়ে গেলো। মদ্য বিক্রয় এক বিরাট লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হলো। ফলে লক্ষ লক্ষ লোক এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করলো। অন্যদিকে গোপন মদ্যালয় ছাড়াও অসংখ্য ভ্রাম্যমান মদ্য বিক্রেতার আবির্ভাব হলো। এসব চলমান মদ্যালয় স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, হোটেল-রেঁস্তোরা, প্রমোদকেন্দ্র এমনকি লোকদের ঘরে ঘরে পৌঁছে মদ্য বিক্রয় এবং নতুন নতুন খরিদ্দার সংগ্রহ করতে লাগলো। অনুমান করা হয়েছে যে, নিষিদ্ধকরণের পূর্বের চাইতে পরবর্তীকালে আমেরিকার শুঁড়ী-বিক্রেতার সংখ্যা অনুন্য দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরন্তু এই ব্যবসায় শহরের সীমা ডিঙ্গিয়ে গ্রামাঞ্চল অবধি বিস্তৃতি লাভ করেছে। ঘরে ঘরে শরাব তৈরীর গোপন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্বে আমেরিকার মদ্য-চোলাইয়ের অনুমোদিত কারখানার সংখ্যা ছিলো মোট চারশ'। নিষিদ্ধ ঘোষণার পর মাত্র ৭ বছরের মধ্যে ৭৯ হাজার ৪শ' ৩৭ জন কারখানা মালিককে গ্রেফতার এবং ৯৩ হাজার ৮শ' ৩১টি মদের দোকান বাজেয়াপ্ত করা হয়। এতদসত্ত্বেও মদের ব্যবসায় কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। বে-আইনী বিভাগের জনৈক সাবেক কমিশনার এক বিবৃতিতে বলেন ঃ 'আমরা সমগ্র কারখানা ও দোকানের মাত্র এক-দশমাংশ পাকড়াও করতে সমর্থ হয়েছি।'

এভাবে দেশে মদ্যপানের পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায়। অনুমান করা হয় যে, নিষিদ্ধ আমলে মার্কিন জনসাধারণ প্রতি বছর ২০ কোটি গ্যালন মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এই পরিমাণটা ছিলো নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্ববর্তী পরিমাণের চাইতে অনেক বেশি।

এতো বিপুল পরিমাণে যে মদ ব্যবহৃত হয়, গুণগতো দিক দিয়ে তা ছিলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। এ সম্পর্কে চিকিৎসকদের অভিমত হচ্ছে এই: 'এই বস্তুটিকে মদ বলার চাইতে বিষ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ এটি কণ্ঠনালী দিয়ে নিম্নে অবতরণের সঙ্গে-সঙ্গেই কলিজা ও মস্তিষ্কে এর বিষাক্ত

প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। দু'দিন পর্যন্ত ঐ অঙ্গ দু'টি এর দ্বারা প্রভাবিত থাকে। এর নেশায় মানুষ কোনো সৎ চিন্তা ও সৎ কর্মের উপযোগী থাকেনা, বরং তার স্বভাব-প্রকৃতি গোলযোগ, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপরাধ প্রবণতার দিকে ধাবিত হয়।'

এ ধরনের মদের ব্যবহারাধিক্যের ফলে আমেরিকাবাসির দৈহিক স্বাস্থ্য একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিউইয়র্ক শহরের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, ঘোষণার পূর্বে ১৯১৮ সালে এ্যালকোহলের প্রতিক্রিয়ায় রোগাক্রান্তদের সংখ্যা ৩৭৪১ এবং মৃত্যুবরণকারীদের সংখ্যা ছিলো ২৫২। আর ১৯২৬ সালে রোগাক্রান্তদের সংখ্যা ১১ হাজার এবং মৃত্যুবরণকারীদের সংখ্যা সাড়ে ৭ হাজারে গিয়ে উপনীত হয়। এতদভিন্ন যারা সরাসরি মদের প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়ে মৃত্যুবরণ কিংবা জীবনমৃত হয়ে পড়ে, তাদের সংখ্যা অনুমান করাই সম্ভব নয়।

এমনিভাবে অপরাধ, বিশেষত কিশোর ও যুবকদের অপরাধ প্রবণতা অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পায়। মার্কিন বিচারকদের একটি বিবৃতিতে বলা হয় : 'আমাদের ইতিহাসে আর কখনো নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এতো বিপুলসংখ্যক কিশোরকে গ্রেফতার করার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়না।' এভাবে কিশোর ও অল্পবয়স্কদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা মাত্রাতিরিক্ত রকমে বেড়ে যাবার পর যুবকদের সম্পর্কেও তদন্ত করা হয়। তার ফলে প্রমাণিত হয় যে, ১৯২০ সাল থেকে সমাজের মদ্যপান ও দুষ্কৃতিপরায়ণতা প্রতি বছর বিপুল হারে বেড়ে যাচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো শহরে ৮ বছরের মধ্যে শতকরা দু'শ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৩৩ সালে আমেরিকার জাতীয় অপরাধ সংস্থার (National Crime Council) ডিরেক্টর কর্ণেল মোস (Col. Moss) এ তথ্য প্রকাশ করেন যে : 'বর্তমানে আমেরিকার প্রতি তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন পেশাদার অপরাধী। পরন্তু আমাদের এখানে হত্যার অপরাধ শতকরা সাড়ে ৩শ' ভাগ বেড়ে গিয়েছে।'

মোটকথা, চৌদ্দ বছরে আমেরিকায় মদ্য নিবারণের যে ফলাফল প্রকাশ পায়, তার মোটামুটি বিবরণ হচ্ছে এই ঃ

* লোকদের মন থেকে আইনের প্রতি মর্যাদাবোধ তিরোহিত হয় এবং সমাজের সর্বস্তরে আইন ভঙ্গ করার ব্যাধি বিস্তার লাভ করে।
* মদ্যপান নিবারণের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়নি; বরং তার উল্টো নিষিদ্ধ ঘোষণার পর এ বস্তুটি পূর্বের চাইতেও বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।
* নিবারক আইনটি কার্যকর করণে একদিকে সরকারের এবং অপরদিকে গোপনে মদ্য ক্রয়ের ফলে প্রজা সাধারণের অপরিমিত আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় এবং এভাবে গোটা দেশের মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে।
* রোগের প্রকোপ, স্বাস্থ্যহানি, মৃত্যুহার বৃদ্ধি, জনচরিত্রের বিপর্যয়, সমাজের সকল স্তরে, বিশেষত নব্য বংশধরগণের মধ্যে দুষ্কৃতি ও পাপাচারের বিস্তৃতি এবং অপরাধমূলক কার্য অস্বাভাবিক রকমে বৃদ্ধি পায়।

এই ছিলো উক্ত আইনের নৈতিক ও তামাদ্দুনিক ফলাফল।

এই ফলাফল অর্জিত হয় এমন একটি দেশে, যাকে বিশ শতকের আলোকোজ্জ্বল যুগে সর্বাধিক সুসভ্য দেশ বলে গণ্য করা হয়। তার অধিবাসীরা উন্নতমানের শিক্ষা ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত। জ্ঞান বিজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে তাদের মনমগজ আলোকদীপ্ত। তারা নিজেদের ভাল মন্দ ও লাভ ক্ষতি অনুধাবন করতে পুরোপুরি সমর্থ।

এই পরিণামফল প্রকাশ পায় এমন অবস্থায়, যখন কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এবং কয়েক'শ কোটি পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক প্রকাশ করে গোটা জাতিকে মদের অপকারিতা সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিলো।

এই ফলাফল আত্মপ্রকাশ করে এমনি পরিস্থিতিতে, যখন মার্কিন জাতির এক বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ নিষিদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলো এবং তাদের ইচ্ছানুসারেই নিবারক আইনটি পাশ হয়েছিলো।

সর্বোপরি এই পরিণামফলের অভিব্যক্তি ঘটে এমন অবস্থায়, যখন আমেরিকার মতো বিরাট রাষ্ট্র বিশ শতকের সর্বোত্তম শাসনযন্ত্রের সহায়তায় মদ্যপান ও মদবিক্রির মূলোচ্ছেদ করার জন্যে পূর্ণ চৌদ্দ বছর পর্যন্ত অবিচল ছিলো।

বস্তুত এই ফলাফল প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সরকার ও জনসাধারণ উভয়েরই সংখ্যাগুরু অংশ মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষাণার ব্যাপারে একমত ছিলো এবং এ কারণেই তা নিষিদ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু যখন জানা গেলো যে, দেশবাসী কোনো মতেই মদ্যপান ত্যাগ করতে সম্মত নয় এবং জবরদস্তিতে মদ বর্জন করানোর ফলে পূর্বের চাইতেও খারাপ অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তখন সেই সরকার ও সংখ্যাগুরু জনসাধারণই আবার মদকে বৈধ করার ব্যাপারে মতৈক্যে উপনীত হলো।

এবার এমন একটি দেশের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন, যা আজ থেকে সাড়ে ১৩শ' বছর পূর্বেকার অন্ধকার যুগে – যা সবচাইতে অন্ধকার যুগ বলে বিবেচিত হতো, সে দেশের অধিবাসীরা ছিলো অশিক্ষিত। তাদের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কোন নাম নিশানা পর্যন্ত ছিলোনা। তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো সন্ধান জানতোনা। তাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোক হয়তো বা দশ হাজারে একজন পাওয়া যেতো এবং তারও মান এতো নিম্ন যে, আজকের সাধারণ লোকও তার চাইতে বেশি জ্ঞান রাখে। বর্তমান যুগের সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান ও উপায় উপকরণ তখন মোটেই ছিলোনা। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র ছিলো একেবারেই প্রাথমিক অবস্থায় এবং তা কায়েম হবার পর মাত্র কয়েক বছরের বেশি অতিক্রান্তও হয়নি। তখনকার জনসাধারণ ছিলো মদের ভক্ত প্রেমিক। তাদের ভাষায় মদের প্রায় আড়াইশ'র মতো নাম ছিলো। সম্ভবত দুনিয়ার কোনো ভাষায়ই এর এতো নামকরণ হয়নি। এটা ছিলো মদের প্রতি তাদের অসাধারণ আসক্তির প্রমাণ। এর আরও প্রমাণ হচ্ছে তাদের কাব্য সাহিত্য। তা থেকে জানা যায়, মদ্যপান ছিলো তাদের স্বভাবগত এবং তা বিবেচিত হতো তাদের জীবনধারণের পক্ষে একটি অপরিহার্য বস্তু হিসেবে।

এই পরিস্থিতিতে সেখানে মদ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলো। আল্লাহ্র রসূল স.-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র

এরশাদ হচ্ছে এই ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا - (بقرة : ٢١٩)

অর্থ ঃ তারা তোমার কাছে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও ঃ এ দু'টিতে বড় বড় অপকার রয়েছে, অবশ্য লোকের জন্য কিছু উপকারিতাও আছে। কিন্তু এ দু'য়ের ক্ষতির পরিমাণ উপকারের চাইতে অনেক বেশি।' (সূরা বাকারা : ২১৯)

এটা মদ সম্পর্কে কোনো হুকুম ছিলোনা; বরং এতে মদের প্রকৃতি ও গুণাগুণ বিবৃত করে বলা হয়েছে যে, তাতে কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয় জিনিসই বর্তমান রয়েছে। তবে অকল্যাণের দিকটাই বেশি শক্তিশালী। এই শিক্ষামূলক ঘোষণার ফলে জাতির একটি অংশ তৎক্ষণাতই মদ্যপান ত্যাগ করলো। এতদসত্ত্বেও মদ্যপায়ীরাই রইলো সংখ্যাগুরু।

এরপর আবার মদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। কারণ কোনো কোনো লোক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে গিয়ে ভুল করে ফেলতো। এমতাবস্থায় রসূলে করীম স. আল্লাহ্র এই হুকুম শুনিয়ে দিলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَاتَقُوْلُوْنَ. (النساء : ٣٤)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেয়োনা; (নামায তোমাদের এমন অবস্থার পড় উচিত, যখন) তোমরা জানতে পারো যে, কি বলছো।' (সূরা নিসা : ৪৩)

এই আদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই লোকেরা মদ্যপান করার জন্যে সময় নির্দিষ্ট করে নিলো। এরপর থেকে তারা সাধারণভাবে ফজর ও যোহরের মাঝখানে কিংবা এশার পর মদ্যপান করতে লাগলো, যাতে করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে না হয় কিংবা নেশার কারণে নামায ত্যাগ করার প্রশ্ন উঠতে না পারে।

কিন্তু মদের আসল ক্ষতিকর দিকটি তখনও অনুদ্ঘাটিত ছিলো। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় লোকেরা প্রায় সময়ই গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতো এবং তার পরিণতি খুনখারাবী পর্যন্ত পৌঁছতো। এ কারণে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ও চুড়ান্ত নির্দেশ জানিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। অতপর এরশাদ হলো ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ - فَهَلْ اَنْتُمْ

مُّنْتَهُوْنَ - وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ . (المائده)

অর্থ ঃ হে ইমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, পাশাখেলা ইত্যাদি হচ্ছে শয়তানের উদ্ভাবিত নোংরা কাজ; সুতারাং ওগুলো তোমরা বর্জন করো। আশা করা যায়, এই বর্জনের ফলে তোমরা কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে। শয়তান তো মদ ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বৈরিতা জাগিয়ে তুলতে এবং তোমাদেরকে খোদার স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। এটা জানার পরও কি তোমরা ওগুলো থেকে বিরত থাকবেনা? আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, রসূলের কথা শোনো এবং বিরত থাকো। কিন্তু তোমরা যদি অবাধ্যতা করো, তবে যেনে রেখো, আমার রসূলের কাজ হচ্ছে শুধু নির্দেশকে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।' (সূরা মায়িদা : ৯০-৯১)

এই নির্দেশ আসার সঙ্গে সঙ্গেই সুরা-রসিক ও মদ্য প্রেমিকগণ যারা মদের নামে নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলো – এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লো। মদ্য নিবারণ সংক্রান্ত ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই সুরা পাত্রগুলোকে ভেঙে ফেলা হলো। মদীনার অলিগলিতে মদের বন্যা-প্রবাহ বয়ে গেলো। এক মজলিসে বসে দশ এগার জন সাহাবী সুরা পান করে নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন। এরই মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকারীর এই আওয়াজ কানে এলো যে, মদকে চিরদিনের জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে। সেই নেশার ঘোরেই খোদায়ী হুকুমের প্রতি এমনি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করা হলো যে, সাহাবাগণ অনতিবিলম্বে সুরা পান বন্ধ করে দিলেন এবং সুরা পাত্রগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দেয়া হলো। এক ব্যক্তি কোথাও বসে সুরাপান করছিলো। সে মুখে কেবল পেয়ালাটি তুলে ধরেছে, এমন সময় কেউ এসে মদ্য নিবারক আয়াতটি পড়ে শোনালো। অমনি তার মুখ থেকে পেয়ালাটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। ফলে এক ফোটা মদও সে গলদকরণ করতে পারলোনা।

এরপর যে ব্যক্তিই সুরা পান করেছে, তাকে জুতা, লাঠি, লাথি, ঘুসি ইত্যাদি দ্বারা শাস্তি দেয়া হয়েছে। পরে এর শাস্তিস্বরূপ ৪০টি করে বেত্রাঘাত দেয়া হতে লাগলো। শেষে ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো। ফলে আরবদেশ থেকে মদ্যপানের নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে গেলো। এরপর ইসলাম যেখানেই গিয়েছে, বিভিন্ন জাতিকে স্বাভাবিকভাবেই সে 'নিরস' পরহেযগার বানিয়ে দিয়েছে। এমনকি, আজও ইসলামের প্রভাব অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ কোনরূপ 'নিবারক আইন' বা দন্ডবিধি ছাড়াই মদকে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলছে। মুসলিম জাতির মধ্যে সুরাপায়ীদের সংখ্যা যদি গণনা করে দেখা হয়, তাহলে আজও হয়তো এ জাতিকে দুনিয়ার অন্যান্য জাতির চাইতে বেশি পরহেগার দেখা যাবে। পরন্তু এ জাতির মধ্যে যারা সুরাপান করে, তারাও একে অত্যন্ত গুণাহ্‌র কাজ বলে মনে করে। তাদের হৃদয় এজন্যে অনুতপ্ত হয় এবং অনেক সময় নিজে নিজেই তওবা করে এ কুঅভ্যাস ছেড়ে দেয়।

বস্তুত ন্যায় নীতি ও বিচার বুদ্ধির জগতে চূড়ান্ত ফয়সালা নির্ভর করে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ওপর। এর সাক্ষ্যকে কখনো মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়না। এখানে সবার সামনে দু'টি অভিজ্ঞতা রয়েছে ঃ একটি আমেরিকার, দ্বিতীয়টি ইসলামের। উভয় অভিজ্ঞতার মধ্যকার পার্থক্যও সুস্পষ্ট। এবার এ দু'টি অভিজ্ঞতার তুলনা করে এ থেকে শিক্ষালাভ করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই কর্তব্য।

আমেরিকায় বছরের পর বছর ধরে মদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হয়েছে। এর অপকারিতা বিবৃত ও বিজ্ঞপিত করার কাজে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান, সংখ্যাতাত্বিক প্রমাণ এবং যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তার শরীরিক, নৈতিক ও আর্থিক অনিষ্টকারীতাকে এমনিভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছ যে, তা অস্বীকার করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। ছবির সাহায্যে মদের অপকারিতাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে। জনসাধারণ যাতে নিজেরাই মদের অনিষ্টকারীতা বুঝতে পেরে তা বর্জন করতে প্রস্তুত হয়, সর্বোতভাবে তার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া জাতির সবচাইতে বড় প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থা Congress বিপুল ভোটাধিক্যে মদ্য নিবারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এর জন্যে প্রয়োজনীয় আইনও পাশ করে। সর্বোপরি তার বেচাকেনা, চোলাই-প্রস্তুতিও আমদানি-রপ্তানিকে বন্ধ করার জন্যে সরকার (যে সরকার তাৎকালীন দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তিবর্গের অন্যতম) তার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করে। কিন্তু জাতি (যে জাতি তখনকার শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত জাতিগুলোর অগ্রনায়ক ছিলো) তাকে বর্জন করতে সম্মত হয়নি। অবশেষে চৌদ্দ পনের বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই তারা হারামকে আবার হালাল করতে বাধ্য হয়ে গেলো।

অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্রে মদের বিরুদ্ধে কোনো প্রচারণা চালানো হয়নি। সেখানে প্রচার-প্রোপাগান্ডা বাবদ একটি পয়সাও ব্যয়িত হয়নি। কোন 'এ্যান্টি সেলুন লীগ'ও গঠন হয়নি। সেখানে আল্লাহর রসূল কেবল এইকুটু বলে দিয়েছেন যে, 'আল্লাহ্ তোমাদের জন্য মদকে হারাম করে দিয়েছেন।' তাঁর মুখ থেকে এই নির্দেশটি বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা জাতি (যে জাতি মদের প্রেমে আমেরিকার চাইতেও বেশি অগ্রবর্তী ছিলো এবং পারিভাষিক জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় কেউ তার সমকক্ষ ছিলোনা) সুরাপান থেকে বিরত হলো। তারা মদকে এমনিভাবে বর্জন করল যে, ইসলামের সীমার মধ্যে থেকে তাদের পক্ষে 'রসহীনতা' থেকে 'রস সমুদ্রে' প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব হয়ে গেলো। পরন্তু এই 'রসহীনতা'র মধ্যে আবদ্ধ থাকার জন্যে তাদের কোনো অনুশাসন, কোনো জিজ্ঞাসাবাদ বা কোনো দন্ডবিধিরও প্রয়োজন রইলোনা। কারণ কোনো জবরদস্তি শক্তি বর্তমান না থাকলেও তারা সুরাপান থেকে বিরত থাকবে। সর্বোপরি এমন কোনো হারামও নয় যে, একে কোনো রকমে আবার হালাল করা যেতে পারে। যদি তামাম দুনিয়ার মুসলমানও মদের স্বপক্ষে সর্বসম্মতভাবে ভোট দেয়, তবুও এ হারাম কখনো হালাল হতে পারেনা।

এই বিরাট তারতম্যের কারণ অনুসন্ধান করলে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা

যাবে। সে বিষয়গুলো শুধু মদের ব্যাপারেই নয়; বরং আইন ও নীতি শাস্ত্রের সমস্ত প্রশ্নেই মূলনীতি হিসেবে প্রযোজ্য।

প্রথম কথা এই যে, মানবীয় বিষয়াদির সংগঠন ও পরিচালনায় ইসলাম ও পার্থিব বিধি ব্যবস্থার মধ্যে একটি মৌল পার্থক্য রয়েছে। আর পার্থিব বিধি ব্যবস্থা নির্ভর করে সম্পূর্ণ মানবীয় অভিমতের ওপর। এই কারণেই তা শুধু সামগ্রিক ও মৌলিক ব্যাপারেই নয়, বরং প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেই সাধারণ কিংবা বিশিষ্ট লোকদের অভিমতের শরণাপন্ন হতে বাধ্য। আর মানবীয় অভিমতের (তা সাধারণ লোকদের হোক কি বিশিষ্ট লোকদের) অবস্থা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি মুহূর্তে তা অভ্যন্তরীণ ঝোঁক প্রবণতা, বাহ্যিক কার্যকারণ এবং জ্ঞান বুদ্ধির পরিবর্তনশীল নির্দেশের দ্বারা (তা হামেশা নির্ভুল হবে এমন কোনো কথাও নেই) প্রভাবিত হতে থাকে। এই প্রভাবের ফলে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে হামেশা পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের অনিবার্য ফলেই ভাল-মন্দ, ভুল-নির্ভুল, বৈধ-অবৈধ এবং হারাম-হালামের মানদন্ড পরিবর্তিত হতে থাকে। আর এই পরিবর্তনের ফলে আইনের পরিবর্তনও অনিবার্য হয়ে পড়ে। এভাবে সেখানে নৈতিকতা ও সভ্যতার কোনো স্থায়ী, সুদৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় মানদন্ড কায়েম হতে পারেনা। মানুষের মতো বৈচিত্র্য সেখানে আইনের ওপর কর্তৃত্ব করে, আর আইনের বৈচিত্র কর্তৃত্ব করে মানব জীবনের ওপর। এর দৃষ্টান্ত হলো, যেনো কোনো আনকোরা ড্রাইভার মোটর চালনা করছে। তার অপরিপক্ক হাতে অনিয়মিতভাবে গাড়ির স্টিয়ারিং এদিক সেদিক ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এই অনিয়মিত ঘুরানোর ফলে মোটরের গতিও অনিয়মিত ও অনিশ্চিত হবে। সে দৃঢ়তার সাথে কোনো নির্দিষ্ট পথ চলতে পারবেনা। আর গাড়ি যখন এলোমেলোভাবে চলতে থাকবে, তখন খোদ ড্রাইভারের ওপরই প্রভাব পড়বে। কখনো সে সোজা পথে চলতে থাকবে, আবার কখনো চলবে বাঁকা পথে। কখনো কোনো গর্তে গিয়ে পড়বে, আবার কখনো কোনো প্রাচীরের সাথে সংঘর্ষ বাঁধাবে। আবার কখনো তা উঁচুনিচু, বন্দুর পথে চলতে গিয়ে হোঁচট খাবে।

পক্ষান্তরে ইসলামী আইন ও নীতিশাস্ত্রের গোটা মূলবস্তু এবং বেশির ভাগ খুঁটিনাটি বিষয়ই আল্লাহ এবং রসূল কর্তৃক নির্ধারিত। সেখানে মানবীয় অভিমতের বিন্দু পরিমাণও স্থান নেই। তবে জীবনের পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মৌলিক বিধান ও খুঁটিনাটি দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রয়োজনমতো ছোটখাটো ব্যাপারে নয়া আইন রচনার অধিকার মানুষের রয়েছে। কিন্তু সে আইনও অনিবার্যভাবে শরয়ী মূলনীতির আলোকেই রচিত হতে হবে। বস্তুত এই খোদায়ী আইনের ফলেই আমাদের কাছে নৈতিকতা ও সভ্যতার একটি স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল মানদন্ড বর্তমান রয়েছে। আমাদের নৈতিক ও সমাজিক বিধি-ব্যবস্থায় বৈচিত্র ও বিভিন্নমুখিতার কোনো নাম নিশানা পর্যন্ত নেই। আমাদের গতকালকার হারাম আজকে হালাল এবং আগামীকাল আবার হারাম হতে পারেনা। এখানে যা হারাম করা হয়েছে, তা চিরকালের জন্যেই হারাম আর

যা হালাল করা হয়েছে, তা কিয়ামত অবধি হালাল। আমরা আমাদের মোটরের স্টিয়ারিং এক সুনিপুণ ও সুদক্ষ ড্রাইভারের হাতে সঁপে দিয়েছি। তিনি আমাদের মোটরকে সোজা পথে চালিত করবেন, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত :

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ .

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ঈমানদার লোকদের একটি সুনিশ্চিত বাণীর সাহায্যে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে স্থিতি ও দৃঢ়তা দান করেন, আর যালিম ও অবাধ্য লোকদের তিনি পথভ্রষ্ট করে দেন, যাতে করে তারা কোথাও স্থিতি লাভ করতে না পারে।' (সূরা ইব্রাহীম : ২৭)

এর ভেতরে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিহিত রয়েছে। তাহলো, বৈষয়িক রাষ্ট্রে মানব জীবনের জন্যে কোনো বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন কিংবা নৈতিক চরিত্র, সমাজ ব্যবস্থা ও তামাদ্দুনিক কাঠামোর সংশোধনের নিমিত্ত কোনো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে নেহায়েত খুঁটিনাটি ব্যাপারেও জনগণের সম্মতির অপেক্ষা করতে হয়। তার আইন কানুনের প্রত্যেকটি ধারা কার্যকরীকরণে জনমতের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। জনগণের মতের বিরুদ্ধে যে সংস্কার বা গঠনমূলক আইনই কার্যকরী করা হোক, শেষ পর্যন্ত তা বাতিল করতেই হয়। এটা শুধু আমেরিকার অভিজ্ঞতাই নয়; বরং দুনিয়ার সমস্ত অভিজ্ঞতাই একথার সাক্ষ্য বহন করে। এ থেকে এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে, মানব চরিত্র ও সমাজ ব্যবস্থার সংশোধনের বেলায় পার্থিব আইন কানুন সম্পূর্ণ অক্ষম ও অনুপযোগী। কারণ সে আইন বিকৃত জনসমষ্টির সংশোধন করার প্রয়াসী, তার মঞ্জুরী অমঞ্জুরী বা প্রত্যাবর্তন প্রত্যাহারের জন্যেও সেই জনমতের ওপরই তাকে নির্ভর করতে হয়।

ইসলাম এই জটিলতার নিরসন করেছে অন্য একটি উপায়ে; আর একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এ ছাড়া এই সমস্যার আর কোনো সমাধান নেই। তাহলো এই যে, নৈতিক চরিত্র, সমাজনীতি ও তামাদ্দুনিক প্রশ্নাবলী উত্থাপন এবং শরয়ী বিধানের প্রতি আনুগত্যের দাবি জানানোর পূর্বে সে গোটা মানব জাতিকে আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান পোষণের আহ্বান জানায়। অবশ্য ঈমান আনা বা না আনা মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ঈমান আনবার পর তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার আর কোনো প্রশ্ন থাকেনা। অতপর আল্লাহ্র তরফ থেকে তাঁর রসূল যে নির্দেশই দান করেন এবং আল্লাহ্র কিতাব যে আইনই নির্দিষ্ট করে দেয়, তার আনুগত্য তার পক্ষে অপরিহার্য। এই মূলভিত্তি স্থাপনের পর ইসলামী শরীয়তের তামাম বিধিব্যবস্থা তার ওপর কার্যকরী হয়ে যাবে। এরপর কোনো খুঁটিনাটি বা মৌলিক প্রশ্নেই তার সদিচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো স্থান থাকবেনা। এ কারণেই শত শত কোটি টাকার অপচয়, অতুলনীয় প্রচার প্রোপাগান্ডা এবং রাষ্ট্রশক্তির অপরিমেয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমেরিকায় যে কাজ

সম্ভব হয়নি, তা ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে রসূলের একটিমাত্র ঘোষণায়ই হয়ে গিয়েছে।

তৃতীয় শিক্ষামূলক বিষয় এই যে, কোনো মানব সমাজ জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলার দীপ্তিতে যতোই প্রদীপ্ত হোক এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে যতো উন্নতির উচ্চশিখরেই আরোহণ করুক না কেনো, সে খোদায়ী আইন কানুনের অনুগত ও আজ্ঞানুবর্তী না হলে এবং তার ভেতর ঈমানী শক্তি পয়দা না হলে নিজের বল্গাহীন প্রবৃত্তির কবল থেকে সে কখনো মুক্তিলাভ করতে পারেনা। তার ওপর প্রবৃত্তির দুর্বার আকাঙ্খা চেপে বসবে। ফলে তার প্রবৃত্তি যে বস্তুটির প্রতি আকৃষ্ট হবে, তার অপকারিতা সূর্যালোকের চাইতে উজ্জ্বল করে দেখালেও তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকে (অর্থাৎ বুদ্ধি পূজারীদের উপাস্য) সাক্ষী হিসেবে এনে দাঁড় করালেও তার মোকাবিলার সংখ্যাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পেশ করলেও (যা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে কখনো মিথ্যা হতে পারেনা) এবং তার অনিষ্টকারীতাকে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করে দিলেও সে কখনো ঐ প্রিয় বস্তুটি বর্জন করবেনা। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ভেতর নৈতিক চেতনা সঞ্চয় করা, তার বিবেক বুদ্ধিকে পরিচালিত করা এবং তার মধ্যে আপন প্রবৃত্তিকে বশীভূত করার মতো শক্তির সৃষ্টি করা দর্শন, বিজ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তির কাজ নয়। এ কাজ ঈমান ছাড়া আর কোনো উপায়ে সম্পন্ন হতে পারেনা। (প্রথম প্রকাশ : তরজমানুল কুরআন : জানুয়ারি ১৯৩৪ সাল)

❖❖❖

৫

পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মহত্যা

রাষ্ট্রনীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্পকলা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতিগুলোর বিস্ময়কর উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে একশ্রেণীর লোকের মন মগজ অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মনে এই ধারণার সঞ্চার হয়েছে যে, ঐ জাতিগুলোর উন্নতি ও তরক্কী হয়তো বা অক্ষয়, অবিনশ্বর। দুনিয়ায় তাদের প্রভুত্ব ও আধিপত্য চিরতরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পৃথিবীর রাজত্ব ও উপায় উপকরণের ওপর কর্তৃত্বের ব্যাপারে তাদেরকে একেবারে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দেয়া হয়েছে। তাদের শক্তি ও ক্ষমতা এমনি মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, তা উৎখাত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

বস্তুত এটা কোনো নতুন ধারণা নয়; বরং প্রত্যেক যুগের প্রতাপশালী জাতিগুলো সম্পর্কেই এমনি ধারণা পোষণ করা হয়েছে। মিসরের ফিরাউন বংশ, আরবের আ'দ ও সামূদ, ইরাকের কালদানি, ইরানের কিসরা, গ্রীসের দ্বিগ্বিজয়ী বীর, রোমের বিশ্ববিশ্রুত সম্রাট, জগজ্জয়ী মুসলিম মুজাহিদ, তাতারীদের দুনিয়াখ্যাত সেনাবাহিনী প্রমুখ সবাই এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে একই রূপ প্রতাপ ও শক্তির তামাসা দেখিয়ে গেছেন। পালাক্রমে এরা প্রত্যেকেই আপন আপন ভোজবাজির নৈপুণ্য দেখিয়ে একইভাবে দুনিয়ার মানুষকে বিস্মিত করে দিয়েছেন। যখন যে জাতিই মাথা তুলেছে, এভাবেই সে দুনিয়ার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। এমনি করেই সে বিশ্বময় নিজের খ্যাতি, যশ ও বীর্যবত্তার ডঙ্কা বাজিয়েছে আর এভাবেই দুনিয়ার মানুষ অভিভূত হয়ে ধারণা করে নিয়েছে যে, তাদের শক্তি ও ক্ষমতা অক্ষয়, অবিনশ্বর। কিন্তু তাদের আয়ুষ্কাল যখন পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং অক্ষয় ও অবিনশ্বর ক্ষমতার অধিকারী সম্রাট তাদের কর্তৃত্বের অবসান ঘোষণা করেছেন, তখন তাদের এমনি পতন ঘটেছে যে, অধিকাংশ জাতিই দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কোনো কোনোটির নাম-নিশানা দুনিয়ায় থাকলেও তারা তাদের শ্যাসিতের শাসনাধীন, গোলামদের গোলাম এবং পদানতদের পদানত হয়েই বেঁচে রয়েছে :

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ .

অর্থ ঃ তোমাদের পূর্বে অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীতে ঘুরে দেখো, যারা (আল্লাহর বিধান) অস্বীকার করেছে, তাদের পরিণাম কি হয়েছে!' (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩৭)

বস্তুত বিশ্বপ্রকৃতির গোটা ব্যবস্থাপনাই এমনি বৈশিষ্টপূর্ণ যে, এখানে কোনো স্থিতি ও বিরতির অবকাশ নেই। এখানে এক অবিশ্রান্ত গতি, পরিবর্তন ও আবর্তন

বিদ্যমান। এটি কোনো জিনিসকেই এক অবস্থায় টিকে থাকতে দেয়না। এখানে সৃষ্টির সাথে লয়, ভাঙ্গার সাথে গড়া, উত্থানের সাথে পতন হাত ধরাধরি করে চলছে। এমনিভাবে এর বিপরিত নিয়মও চালু রয়েছে। আজ একটি মাষা পরিমাণ বীজ যেখানে বাতাসের বেগে উড়ে উড়ে বেড়ায় কাল তা-ই মাটিতে স্থিতিলাভ করে এক প্রকান্ড ডালপালাযুক্ত বৃক্ষে পরিণত হয়। আবার পরদিন তা-ই শুকিয়ে মাটিতে একাকার হয়ে যায়। অতপর প্রকৃতির সঞ্জিবনী শক্তিগুলো তাকে ত্যাগ করে অপর কোনো বীজের লালন পালনে নিয়োজিত হয়। এই হচ্ছে জীবনের ভাঙা গড়া ও উত্থান পতনের নিয়ম। কিন্তু মানুষ এর কোনো একটি অবস্থাকে একটু বেশি দীর্ঘস্থয়ী হতে দেখলেই মনে করে যে, এ অবস্থা একেবারে চিরস্থায়ী। সে অবস্থাটি যদি নিম্নগামী হয় তবে মনে করে যে, চিরকাল এরূপ নিম্নগামীই থাকবে। আবার তা যদি উর্ধ্বগামী হয় তো ধারণা করা হয় যে, চিরদিন এমনি উর্দ্বগামীই থাকবে। কিন্তু এখানে পার্থক্য যাকিছু তা বিলম্ব আর অবিলম্বের; আসলে কোনো অবস্থাই চিরস্থায়ী নয় :

وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ .

অর্থ ঃ কালের এই উত্থান পতন আমি মানুষের মধ্যে আবর্তন করে থাকি।' (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪০)

দুনিয়ার গোটা পরিবেশই আবর্তিত হচ্ছে এক ধরণের গতিক্রমের মধ্যে। জন্ম মৃত্যু, যৌবন বার্ধক্য, শক্তি দৌর্বল্য, শীত বসন্ত, শুষ্কতা সজীবতা সবকিছুই হচ্ছে এই আবর্তনের বিভিন্ন রূপমাত্র। এই আবর্তন ধারায় পালাক্রমে প্রত্যেক জিনিসেরই একবার সুদিন আসে। তখন শুরু হয় তার বিকাশ বৃদ্ধি, প্রকাশ পায় তার শৌর্যবির্য, পরাকাষ্ঠা দেখায় সে আপন রূপ ও সৌন্দর্য। এমনকি একদিন সে উন্নতি ও প্রগতির চরম প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়। এসময়ে সে ক্ষীণ, খর্বকায়, দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে এবং যে শক্তিগুলো তার বিকাশ বুদ্ধির সূচনা করেছিল, শেষ পর্যন্ত তা-ই তাকে ধ্বংস করে দেয়।

গোটা সৃষ্টিজগতে এই হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার বিধিবদ্ধ নিয়ম। দুনিয়ার অন্যসব জিনিসের মতো মানুষের ওপরও রয়েছে এ নিয়ম পুরোপুরি কার্যকর। তাকে ব্যক্তিগতভাবে বিচার করা হোক, কি জাতিগত দৃষ্টিতে মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি এবং এমনিতরো অন্যান্য সমস্ত লক্ষণই ঐ গতিক্রমের সাথে বিভক্ত হতে থাকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে। পালাক্রমে সবার জীবনেই আসে এই অনিবার্য পর্যায়গুলো। এখানে এমন কেউ নেই, যাকে এই ভাগাভাগির বেলায় করা হয়েছে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কিংবা যার উপর কোনো অবস্থাকেই করা হয়েছে চিরস্থায়ী। সুদিন বা দুর্দিন কোনো অবস্থায়ই এর ব্যতিক্রম হয়না :

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً .

অর্থ ঃ পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিলো আল্লাহর রীতি। তুমি আল্লাহর রীতিতে কখনো কোনো পরিবর্তন পাবেনা।' (সূরা আহযাব : আয়াত ৬২)

এই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আমরা অতীত জাতিগুলোর অনেক নিদর্শন দেখতে পাই। তারা তাদের কৃষ্টি সভ্যতা, শিল্পকর্ম ও কলাকুশলতার প্রচুর স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে। সেসব স্মৃতিচিহ্ন দেখে মনে হয়, আজকের প্রগতিশীল ও প্রতাপশালী জাতিগুলোর চাইতে তারা কিছুমাত্র খাটো ছিলোনা; বরং সমকালীন জাতিগুলোর ওপর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো এদের চইতেও বেশি :

كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اَثَارُوْا الاَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا .

অর্থ ঃ তারা ছিলো এদের চাইতেও প্রবল শক্তিমান। তারা যমীনকে ভালোভাবে কর্ষণ করেছিলো এবং এতোটা আবাদ করেছিলো যতোটা এরা করে নাই।' (সূরা রূম : আয়াত ৯)

কিন্তু তবু তাদের পরিণতি কি হয়েছে? তারা আপাত সৌভাগ্যের নেশায় হলো প্রতারিত। ঐশ্বর্য ও ভোগাড়ম্বর তাদের নিক্ষিপ্ত করলো অহমিকার গর্ভে। স্বাচ্ছন্দ্য তাদের জন্যে হয়ে দাঁড়াল আপদ (ফিতনা)। প্রতিপত্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতার গর্বে তারা পরিণত হলো অনাচারের প্রতিমূর্তি। এভাবে নিজস্ব দুষ্কৃতির দ্বারা নিজেদের ওপরই তারা শুরু করে দিলো জুলুম চালাতে :

وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِمَّا اُتْرِفُوا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ .

অর্থ ঃ আর যালেমরা তো সেইসব সামগ্রীর স্বাদ আস্বাদনের কাজে লিপ্ত ছিলো যা তাদেরকে বিপুল পরিমাণে দেয়া হয়েছিলো। আর তারা ছিলো মহা অপরাধী।' (সূরা হুদ : ১১৬)

তাদের এই বিদ্রোহ আর অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিলেন :

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا .

অর্থ ঃ কতো জনপদ এমন ছিলো যারা ছিলো যালেম। আমি প্রথমে তাদের অবকাশ দিয়েছি, তারপর পাকড়াও করেছি।' (সূরা আল হাজ্জ : আয়াত ৪৮)

আর এ অবকাশও কোনো মা'মুলি অবকাশ ছিলোনা; বরং বিভিন্ন জাতিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত এমনি অবকাশ দেয়া হলো। কিন্তু প্রতিটি অবকাশই তাদের জন্যে এক নতুন আপদ হয়ে দাঁড়ালো :

وَاَنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ .

অর্থ ঃ কিন্তু আল্লাহর নিকট একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছর।' (সূরা হজ্জ : আয়াত ৪৭)

তারা মনে করলো যে, তাদের চাতুর্যের সামনে আল্লাহ অসহায়। কাজেই দুনিয়ার ওপর এখন আল্লাহর নয়, তাদেরই রাজত্ব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোদার গযব উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তাদের উপর থেকে সুদৃষ্টি ফিরে গেলো। সুদিনের পরিবর্তে দুর্দিন ঘনিয়ে এলো। তাদের চালবাজির মোকাবিলায় আল্লাহও এক

কঠিন চাল প্রয়োগ করলেন। কিন্তু তারা আল্লাহর সে চাল উপলব্ধি করতেই পারলোনা, প্রতিরোধ করবে তারা কোত্থেকে?

وَمَكَرُوْا مَكْرًاوَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لاَيَشْعُرُوْنَ .

অর্থ ঃ তারা একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো, অথচ আমরাও একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম, যা তারা টেরই পায়নি।' (সূরা আন নামল : আয়াত ৫০)

আল্লাহর পরিকল্পনা কখনো প্রত্যক্ষভাবে আসেনা, বরং তার বিষক্রিয়া শুরু হয় খোদ মানুষের ভিতর থেকে – তার দিল দিমাগে অনুপ্রবেশ করার পর থেকে। তা আক্রমণ চালায় মানুষের বিবেক বুদ্ধি, অনুভূতি, বিচারবোধ, চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তির ওপর। তা অন্ধ করে দেয় তার অন্তর্দৃষ্টিকে। তা তার চর্মচক্ষুকে অন্ধ করেনা বটে, কিন্তু তার জ্ঞানচক্ষুকে অন্ধ করে দেয় :

فَاِنَّهَا لاَتَعْمَى الاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ .

অর্থ ঃ আসল ব্যাপার হলো চক্ষু অন্ধ হয়না, বরং অন্ধ হয় অন্তর যা বুকের মধ্যে থাকে।' (সূরা আল হাজ্জ : আয়াত ৪৬)

অন্ধ! আর হৃদয়চক্ষুই যখন অন্ধ হয়ে যায়, তখন নিজের কল্যাণের জন্যে যে ফন্দি ফিকিরই সে খাটায়, তা-ই তার পক্ষে হানিকর হয়ে দাঁড়ায়। সাফল্যের আশা দিয়ে যে পদক্ষেপই সে করে, তা-ই তাকে নিয়ে যায় ধ্বংসের দিকে। তার সমস্ত শক্তিই ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তার নিজের হাত নিজের গলাটিপে ধরে আপনা থেকে :

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থ ঃ একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণতি কি ভয়াবহ হয়েছে, আমরা তাদের এবং তাদের কওমকে পুরোপুরি নাস্তানাবুদ করে দিয়েছি।' (সূরা আন নামল : আয়াত ৫১)

এই সুদিন ও দুর্দিনেরই একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমরা দেখতে পাই খান্দানে ফিরাউন ও বনী ইসরাইলের কাহিনীতে। মিসরবাসী যখন উন্নতি ও প্রগতির চরম শিখরে আরোহণ করলো, তখন তারা কোমর বেঁধে লাগলো জোর জুলুম ও বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে। তাদের বাদশাহ ফিরাউন দাবি করলো খোদায়ী মর্যাদার। তার কিছুকাল আগে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের আমলে বনী ইসরাঈলগণ সেখানে গিয়ে করেছিলো বসতি স্থাপন। ফিরাউন এই দুর্বল কওমটিকে পরিণত করলো জুলুম ও পীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে। শেষ পর্যন্ত তার মিসরবাসীর অবাধ্যতা গেলো সীমা অতিক্রম করে। তাই আল্লাহ সিদ্ধান্ত করলেন তাদেরকে অপদস্থ করে, তাদের কাছে ঘৃণ্য, সেই দুর্বল কওমটিকে সমুন্নত করবার। অবশেষে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তই কার্যকর হলো। সেই দুর্বল জাতির মধ্যেই পয়দা করা হলো হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে। তাঁর প্রতিপালন করানো হলো খোদ ফিরাউনেরই ঘরে এবং তারই স্বহস্তে। অতপর তাঁকে নিযুক্ত করা হলে মিসরীয়দের গোলামী থেকে আপন কওমকে মুক্ত করানোর খেদমতে। তিনি ফিরাউনকে

নম্রভাবে বোঝালেন কিন্তু সে বিরত হলোনা। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরাউন ও তার কওমকে বারংবার সতর্ক করা হলো, উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষ ও বন্যার প্রকোপ দেখা দিলো, আসমান থেকে শোণিতধারা বর্ষিত হলো। পঙ্গপালের আক্রমণে তাদের ফসলের ক্ষেত বিরাণ হয়ে গেলো।

উকুন ও ব্যাঙের উপদ্রবে তারা অতিষ্ট হয়ে উঠলো। কিন্তু তবু তাদের অহমিকা কিছুমাত্র হ্রাস পেলোনা :

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ .

অর্থ ঃ তারা অহংকারে মেতে উঠেছিলো আর তারা ছিলো অহংকারী জাতি।' (সূরা আরাফ : আয়াত ১৩৩)

একে একে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ যখন চূড়ান্ত হলো। তখন খোদায়ী আযাবের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হলো। আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আপন কওমকে সঙ্গে নিয়ে মিসর ত্যাগ করলেন। ফিরাউনকে তার দলবলসহ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হলো। ফলে মিসরের রাষ্ট্রশক্তি এমনি বিপর্যস্ত হলো যে, কয়েক শতক পর্যন্ত তা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলোনা ঃ

وَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ . (سورة القصص : ٤٠)

অর্থ ঃ আর আমরা তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম তারপর তাদের ডুবিয়ে দিলাম সমুদ্রে। চেয়ে দেখো কি ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে এই যালেমদের।' (সূরা আল কাসাস : আয়াত ৪০)

তারপর এলো ইসরাঈলের পালা। মিসরীয় জাতিকে বিপর্যস্ত করার পর বিশ্ব জাহানের মালিক সেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত কওমটিকেই দুনিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রদান করলেন ঃ

وَاَوْرَثْنَا الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا .

অর্থ ঃ আর তাদের স্থলে আমরা নির্যাতিত লোকদেরকে সেই অঞ্চলের পূর্ব পশ্চিমের অধিকারী বানিয়ে দিলাম, যাকে আমরা কানায় কানায় প্রাচুর্যে ভরে দিয়েছিলাম। আর এভাবেই সবর অবলম্বন করার কারণে বণি ঈসরাইলের ভাগ্যে তোমার প্রভুর কল্যাণময় ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেলো।' (সূরা আরাফ : আয়াত ১৩৭)

এবং তাকে দান করলেন দুনিয়ার সমস্ত জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব :

وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ .

অর্থ ঃ আর আমি তোমাদেরকে বিশ্ব জাতি সমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।' (সূরা বাকারা : আয়াত ৪৭)

কিন্তু এই শ্রেষ্ঠত্ব ও রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিলো সৎকর্ম ও সদাচরণের শর্ত সাপেক্ষ। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জবানিতে আগেই বলে দেয়া হয়েছিল যে, তোমাদেরকে দুনিয়ার খিলাফত দেয়া হবে অবশ্যই; কিন্তু তোমরা কিরূপ কাজ করো (كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ), তার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হবে। বস্তুত এ শর্ত শুধু বনী ইসরাঈলের বেলায়ই নয়; বরং দুনিয়ার যে জাতিকেই রাষ্ট্রশক্তি দান করা হয়, তার প্রতিই এই শর্ত আরোপিত হয় :

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

অর্থ : অত:পর আমরা তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করলাম তোমরা কি রকম কাজ করো তা দেখার জন্যে।' (সূরা ইউনুস : আয়াত ১৪)

তাই বনী ইসরাঈল যখন আপন প্রভুর সঙ্গে অবাধ্য আচরণ করলো, তাঁর বাণী ও কালামকে বিকৃতদুষ্ট করলো, সত্যকে মিথ্যার দ্বারা বদলে ফেললো, হারামখোরী, মিথ্যাচার, বেঈমানী ও ওয়াদাভঙ্গের নীতি গ্রহণ করলো, অর্থগৃধ্ম, লোভী, কাপুরুষ ও আরামপ্রিয় হয়ে উঠলো, খোদার নবিগণকে হত্যা করতে শুরু করলো, সত্যের পথে আহ্বানকারীদের সাথে দুশমনী করলো, সৎ নেতৃত্বের প্রতি অপ্রসন্ন হলো এবং অসৎ নেতৃত্বের আনুগত্য স্বীকার করলো, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সুদৃষ্টিও তাদের ওপর থেকে উঠে গেলো। তাদের কাছ থেকে পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়া হলো। ইরাক, গ্রীস, রোমের দুর্ধর্ষ সম্রাটদের দ্বারা তাদের পর্যদুস্ত করানো হলো। তাদেরকে ঘরছাড়া করা হলো। ভবঘুরের ন্যায় লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার সাথে দেশে দেশে ঘুরান হলো। তাদের হাত থেকে রাষ্ট্রশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হলো। দু'হাজার বছর যাবত তারা লা'নতে এমনিভাবে জড়িয়ে পড়লো যে, দুনিয়ার কোথাও তারা এতোটুকু মর্যাদাকর ঠাঁই খুঁজে পেলনা :[১]

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ .

অর্থ : ফলশ্রুতিতে তাদেরকে গ্রাস করলো লাঞ্ছনা, অধপতন ও দুরাবস্থা, আর তারা পরিবেষ্টিত হলো আল্লাহর গযবে।' (সূরা বাকারা : আয়াত ৬১)

---

১. এই প্রবন্ধ প্রকাশের কয়েক বছর পর ফিলিস্তিনে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে লোকদের মনে এই সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, এটা কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপন্থী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই রাষ্ট্রটি নিজের শক্তিতে নয়; বরং আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একে টিকিয়ে রাখার জন্যে দুনিয়ার চারদিক থেকে ইহুদীরা এসে এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে জমায়েত হচ্ছে। কিন্তু যেদিন এই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ কোনো বড় রকমের যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ইসরাঈলকে সমর্থন করতে অপারগ হয়ে পড়বে, সেদিনই তার জন্যে মৃত্যুর পয়গাম নেমে আসবে এবং পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রগুলো এই ময়লার মোড়কটিকে তুলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। বস্তুত ইহুদীরা পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সহায়তায় আরব ভূমিতে জোরপূর্বক তাদের নিজস্ব আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে – দৃশ্যত একে তাদের কামিয়াবি বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ তাদের বিরাট শাস্তিরই নামান্তর।

আজকে আবার আমরা খোদায়ী নিয়মের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। পূর্বেকার জাতিগুলো যে কর্মফলের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়েছিল, তা-ই আজ পাশ্চাত্য জাতিগুলোকে জড়িয়ে ফেলেছে। তাদেরকে যতোটা সতর্কীকরণ সম্ভব ছিলো, প্রায় সবই করা হয়েছে। মহাযুদ্ধের প্রলয়কান্ড, আর্থিক র্দুগতি, বেকারীর আধিক্য, কুৎসিত ব্যাধির প্রকোপ, পারিবারিক ব্যবস্থার বিপর্যয়, এসবই হচ্ছে তার উজ্জ্বল নিদর্শন। তাদের যদি চোখ থাকতো তো এগুলো দেখেই বুঝতে পারতো যে, জুলুম, অবাধ্যতা, আত্মপূজা ও সত্য বিস্মৃতির কী পরিণাম হয়ে থাকে। কিন্তু তারা ঐ নিদর্শনগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছেনা; বরং সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনে তাদের ক্রমাগত একগুয়েমিই পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের দৃষ্টি ব্যাধির মূল কারণ অবধি পৌঁচুচ্ছেনা। তারা শুধু রোগ লক্ষণই দেখতে পাচ্ছে এবং তারই প্রতিকার করার ব্যাপারে নিজেদের সমস্ত চেষ্টা যত্ন ব্যয় করছে। এ কারণে ওষুধ যতোই প্রয়োগ করা হচ্ছে, ব্যাধি ততোই বেড়ে চলছে। এখন অবস্থা দেখে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সতর্কবাণী ও যুক্তি প্রমাণের পর্যায় শেষ হচ্ছে এবং চূড়ান্ত ফয়সালার সময় অত্যাসন্ন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাশ্চাত্য জাতিগুলোর ওপর দু'টি প্রচন্ড শয়তান চাপিয়ে দিয়েছেন। তারা তাদেরকে ধ্বংশ ও বিনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার একটি হচ্ছে বংশ নিধনের শয়তান আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জাতীয়তাবাদের শয়তান। প্রথম শয়তানটি চেপে বসেছে তাদের ব্যক্তিদের ওপর, আর দ্বিতীয়টি বসেছে তাদের জাতি ও রাজ্যসমূহের ওপর। প্রথমটি তাদের পুরুষ ও নারীদের বিবেক বুদ্ধিকে বিকৃত করে দিয়েছে। তাদের নিজস্ব হাত দ্বারাই তাদের বংশধরদের নিধন করাচ্ছে। তাদেরকে গর্ভনিরোধের কলা কৌশল শিক্ষাদান করছে। গর্ভপাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। বন্ধ্যাত্বকরণের মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছে! এর ফলে তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় শক্তি নিজেরাই বিনষ্ট করে ফেলছে। এটি তাদের এমনি হৃদয়হীন করে দিয়েছে যে, তারা নিজেদের সন্তানকে নিজেরাই হত্যা করছে। ফলকথা, এই শয়তান ক্রমশ তাদের আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করাচ্ছে।

দ্বিতীয় শয়তানটি তাদের বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাধ্যক্ষদের থেকে নির্ভুল চিন্তা ও সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণের শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে। সে তাদের মধ্যে আত্মসর্বস্বতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিহিংসা, ঘৃণা বিদ্বেষ ও লোভ লালসার কুৎসিত মনোবৃত্তি পয়দা করছে। তাদেরকে পরস্পর বিবদমান ও বৈরী ভাবাপন্ন বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত করে দিচ্ছে :

أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًاوَّيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۔

অর্থ ঃ অথবা তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত করে দেবেন এবং একদলের দ্বারা আরেক দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন।' (সূরা আন'আম : আয়াত ৬৫)

তাদেরকে পরস্পরের শক্তি ও ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর এ-ও হচ্ছে এক ধরনের খোদায়ী আযাব। মোটকথা, সে তাদেরকে এক প্রচন্ড আত্মহত্যার জন্যে তৈরি করেছে। এটি পর্যায়ক্রমে নয়; বরং আচানক অনুষ্ঠিত

হবে। সে তামাম দুনিয়ায় গোলা বারুদ জমা করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিপদকেন্দ্র বানিয়ে রেখেছে। এখন সে কেবল একটি বিশেষ মুহূর্তের জন্যে প্রতীক্ষমান। সে মুহূর্তটি আসামাত্রই সে কোনো একটি বারুদাগারকে অগ্নিশলাকা দেখিয়ে দেবে। তারপর দেখতে না দেখতেই এমন ধবংসলীলা বিস্ফোরিত হবে, যার ফলে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংসলীলাও ম্লান হয়ে যাবে।

এ পর্যন্ত আমি যাকিছু বলেছি, তাতে কোনো অত্যুক্তির অবকাশ নেই। বরং ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে আসন্ন মহাযুদ্ধের বিপুল প্রস্তুতি[১] দেখে খোদ তাদেরই দুরদর্শী নেতৃবৃন্দ শিউরে উঠেছেন এবং এই ভয়াবহ যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করে তারা অত্যন্ত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি মার্কিন মিলিটারী স্টাফের প্রাক্তন সদস্য সার্জেল নিউম্যান (Sergal Neuman) আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আসন্ন যুদ্ধ শুধু সৈন্যদেরই লড়াই হবেনা; বরং তাকে ব্যাপক গণহত্যা বলাই হবে সমীচীন। এই হত্যাযজ্ঞে নারী ও শিশুদের পর্যন্ত রেহাই দেয়া হবেনা। বিজ্ঞানীদের বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের দায়িত্বটা সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রাসায়নিক দ্রব্য ও নিষ্প্রাণ যন্ত্রের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। এই মারণাস্ত্রগুলো সামরিক ও অসামরিক লোকের মধ্যে পার্থক্য করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। পরন্তু এখন যুদ্ধমান শক্তিগুলোর লড়াই ময়দান বা দুর্গের মধ্যে নয়; বরং শহর, বন্দর ও লোকালয়ের মধ্যে হবে। কারণ আধুনিক যুদ্ধনীতি অনুযায়ী শত্রুপক্ষের আসল শক্তি সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নয়; বরং তার জনপদ, বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিল্প কারখানার মধ্যে নিহিত। তাই এখন যুদ্ধ বিমান থেকে নানারূপ বোমা বর্ষণ করা হবে। সেসব থেকে অগ্নুদগীরক পদার্থ, বিষাক্ত গ্যাস ও রোগ জীবাণু নির্গত হয়ে যুগপৎ লক্ষ লক্ষ মানুষকে নাস্তানাবুদ করে দেবে। তার মধ্যে এমন এক প্রকার স্বয়ংক্রিয় বোমা রয়েছে, যার একটিমাত্র গোলা লন্ডনের বৃহত্তম ইমারতটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারে।[২] গ্রীন ক্রস গ্যাস (Green Cross Gas) নামে এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাস হিসেবে পরিচিত। এর প্রকৃতি এই যে, এটি যার নাকে প্রবেশ করবে, তার মনে হবে যেনো সে পানিতে ডুবে গিয়েছে। আর এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাসের নাম হচ্ছে ইয়েলো ক্রস্ গ্যাস (Yellow Cross Gas)। এর প্রকৃতি হচ্ছে সাপের বিষতুল্য। এটি নাকে প্রবেশ করলে ঠিক সর্প দংশনের মতোই বিষক্রিয়া দেখা দেয়। এমনি ধরনের আরো নানা প্রকার গ্যাস রয়েছে। এই গ্যাসগুলো প্রায় অদৃশ্য। প্রথম দিকে এগুলোর প্রতিক্রিয়া মোটেই অনুভূত হয়না। পরে যখন অনুভূত হয়, তখন প্রতিক্রিয়া বা চিকিৎসার কোনো সম্ভাবনাই বাকী থাকেনা। এর মধ্যে এক বিশেষ ধরনের গ্যাস বহু উর্ধ্বে উঠে ছড়িয়ে যায়। এর প্রভাবিত এলাকা দিয়ে কোনো বিমান অতিক্রম করলে তার চালক সহসা অন্ধ হয়ে যায়। অনুমান করা হয়েছে যে, কোনো কোনো বিষাক্ত গ্যাসের এক টন পরিমাণ যদি প্যারীস নগরীর ওপর ছেড়ে দেয়া হয়, তবে এক ঘন্টার মধ্যেই গোটা শহরটিকে

---

১. এখানে স্মর্তব্য যে, প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে।

২. পরবর্তীকালে আণবিক বোমা ও উদযান বোমা নামে এর চাইতেও ভয়ংকর মারণাস্ত্র আবিস্কৃত হয়েছে এবং নাগাসাকি ও হিরোশিমাতে তার ধ্বংসলীলার একটি ক্ষুদ্র নমুনাও পেশ করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা যেতে পারে। আর এই কাজটি সম্পাদন করার জন্যে মাত্র এক'শ বিমানই যথেষ্ট।

সম্প্রতি এক বৈদ্যুতিক অগ্নুৎপাদক গোলা আবিষ্কার করা হয়েছে। এর ওজন মাত্র এক কিলোগ্রাম। কিন্তু এইটুকু গোলার ভেতরে এতোখানি শক্তি রয়েছে যে, কোনো জিনিসের সঙ্গে এর সংঘাত লাগলে হঠাৎ তিন হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপ উৎপন্ন হয় এবং তা থেকে এমনি প্রচন্ড অগ্নুৎপাত হয় যে, তা কিছুতেই নেভানো সম্ভব নয়। তাতে পানি নিক্ষেপ করলে পেট্রোলের ন্যায় কাজ করে। তাকে নেভানোর জন্য বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত কোনো পন্থা উদ্ভাবন করতে পারেনি। অনুমান করা হচ্ছে যে, একে শহরে বন্দরের বড় বড় বাজারে নিক্ষেপ করা হবে, যাতে করে তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি আগুন লেগে যায়। অতপর লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করলে বিমান থেকে বিষাক্ত গ্যাসের বোমা বর্ষণ করে ধ্বংসযজ্ঞকে পূর্ণতর করা হবে।

এসব মারণাস্ত্রের আবিষ্কার দেখে রণ বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেছেন যে, মাত্র কয়েকটি বোমারু বিমানের সাহায্যে দুনিয়ার বৃহত্তম ও সুরক্ষিত রাজধানীকেও দু'ঘন্টার মধ্যে ধূলিসাৎ করে দেয়া যেতে পারে। লক্ষ লক্ষ লোকের বাসস্থানকে এমনিভাবে বিষাক্ত করা যেতে পারে যে, রাতে তারা ভালোয় ভালোয় শোবে বটে, কিন্তু সকালে একজনও জীবিত উঠবেনা। এভাবে বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা একটি গোটা দেশের প্রাণী সম্পদকে বিষাক্ত, গবাদী পশু ধ্বংস এবং ক্ষেত খামার ও বাগ বাগিচাকে নিশ্চিহ্ন করা যেতে পারে। এই সর্বধ্বংসী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কোনো কার্যকরী পন্থা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। এতে কেবল উভয় যুদ্ধমান পক্ষ পরস্পরের প্রতি হামলা করে ধ্বংস হয়েই যেতে পারে, ধ্বংসের হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারেনা।

এই হচ্ছে আসন্ন মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আপনারা What would be The Character of a New War নামক পুস্তকটি দেখুন। এই পুস্তকটি জেনেভার 'আন্তপার্লামেন্টারী ইউনিয়ন' নামক সংস্থা যথারীতি গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের পর প্রকাশ করেছে। এটি পড়লে সহজে অনুমান করতে পারবেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা কিভাবে নিজের ধ্বংসের উপকরণ নিজ হাতেই সংগ্রহ করেছে। এখন তার আয়ুষ্কাল রয়েছে শুধু তার যুদ্ধ ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত।[১] যেদিন দুনিয়ার দু'টি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাবে, সেদিনই পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসের জন্যে খোদায়ী ফায়সালা কার্যকর হয়েছে মনে করতে হবে, কারণ দু'টি বৃহৎ রাষ্ট্র ময়দানে অবতরণ করার পর যুদ্ধ কিছুতেই বিশ্বব্যাপী রূপ ধারণ না করে পারেনা। আর যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী হলে ধ্বংসও হবে বিশ্বব্যাপী, সন্দেহ নেই।

---

১. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে – ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত – কি সব কান্ড ঘটেছে তার একটি নমুনা নাগাসাকির ধ্বংসলীলার মধ্যে দেখা যেতে পারে। এর চাইতে বিস্তৃত নমুনা দেখতে হলে লর্ড রাসেলের Seourge of Swastika নামক পুস্তকটি পড়ুন এবং একটি খোদাহীন সভ্যতা কিভাবে একটি গোটা জাতিকে হিংস্র পশুর চাইতেও নিকৃষ্টতর জীবে পরিণত করতে পারে তার নিদর্শন দেখুন।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِىَ النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

অর্থ ঃ লোকেরা স্বহস্তে যা কিছু অর্জন করেছে তার ফলে জলে স্থলে সর্বত্র বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যাতে করে তারা কোনো কোনো কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। সম্ভবত তারা এখনও (সৎ পথে) প্রত্যাবর্তন করতে পারে।' (সূরা রূম :৪১)

যাই হোক, দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে নতুন কোনো বন্দোবস্ত গ্রহণ এবং যালিম ও অত্যাচারীদের পতন ঘটিয়ে অপর কোনো জাতিকে (সম্ভবত তা কোনো নিপীড়িত জাতি হবে) দুনিয়ার খিলাফতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার সময় এখন অত্যাসন্ন। এই মর্যাদার জন্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কাকে মনোনীত করেন, তা-ই এখন লক্ষ্য করবার বিষয়।

এরপরে দুনিয়ার কোন্ কওমটিকে সমুন্নত করা হবে, আমাদের তা জানবার কোনো উপায় নেই। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছাধীন ব্যাপার। তিনি যার কাছ থেকে ইচ্ছা, কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেন, আবার যাকে ইচ্ছা দান করেন ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ .

অর্থ ঃ বলো, হে আল্লাহ! সমস্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও রাজ্য দান করো, আর যার থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও।' (সূরা আল ইমরান : ২৬)

কিন্তু এ ব্যাপারেও একটি নির্ধারিত কানুন রয়েছে। সেটি তিনি তাঁর প্রিয় কিতাবে বিবৃত করেছেন। তা হলো এই যে, তিনি এমন কোনো জাতিকে সমাসীন করেন, যারা সেই অভিশপ্ত কওমটির ন্যায় বদকার ও অবাধ্য হবেনা।

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَيَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ .

অর্থ ঃ যদি তোমরা অবাধ্য আচরণ করো তা হলে তোমাদের পরিবর্তে অপর কোনো জাতিকে সমুন্নত করা হবে। তারা তোমাদের মতো হবেনা।' (সূরা মুহাম্মদ ঃ আয়াত ৩৮)

এ কারণেই বাহ্যিক লক্ষণাদি দেখে মনে হয়, আজকাল যেসব দুর্বল ও পরাধীন জাতি পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করছে এবং ফিরিঙ্গি জাতিগুলোর সদগুণাবলী (যাকিছু সামান্য তাদের মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে) বর্জন করে তাদের দোষক্রটিগুলো (যা তাদের অভিশপ্ত হবার হেতু) গ্রহণ করেছে, আসন্ন বিপ্লবে তাদের সফলকাম হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। (প্রথম প্রকাশ : তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৩২ সাল)

❖ ❖ ❖

৬

পাশ্চাত্য সভ্যতার আর্তনাদ*

(লর্ড লোথিয়ানের ভাষণ)

১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে আলীগড় ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন (উপাধি বিতরণের সভা) উপলক্ষে লর্ড লোথিয়ান একটি ভাষণ দান করেন। তাঁর এই ভাষণটি (অবিভক্ত) ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আধুনিক ও প্রাচীন পন্থীদের পক্ষে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এতে তাদের জন্যে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এই ভাষণে এমন এক ব্যক্তি আমাদের সামনে তাঁর দিল দিমাগের পর্দা উন্মোচন করেছেন, যিনি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও তার সৃষ্ট সভ্যতাকে দুর থেকে দেখেননি ; বরং নিজে সেই সভ্যতার কোলে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন এবং জীবনের সুদীর্ঘ ৫৬টি বছর সেই সমুদ্র মন্থনে অতিবাহিত করেছেন। তিনি পয়দায়েশী ও খান্দানি সূত্রে ইউরোপিয়ান এবং অক্সফোর্ডে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনি বিখ্যাত 'রাউন্ড টেবিল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং প্রায় একুশ বছর যাবত বৃটিশ সরকারের বড় বড় দায়িত্বশীল পদে কাজ করেছেন। তিনি কোনো বৈদেশিক পর্যবেক্ষক নন, তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতারই স্বগৃহের লোক। এ হিসেবেই তিনি আমাদেরকে সেই ঘরের আসল বিকৃতি, তার কার্যকারণ এবং ঘরের লোকেরা বর্তমানে কিসের জন্যে পিপাসার্ত, তা বিবৃত করেছেন।

একদিক থেকে এই ভাষণটি আমাদের আধুনিক শিক্ষিত লোকদের জন্যে অধিকতর শিক্ষাপ্রদ। কারণ, এ থেকে তাঁরা জানতে পারবেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান এবং তার সৃষ্টি সভ্যতার সবটুকু কেবল সঞ্জীবনীই নয়; বরং এতে অনেক বিষেরও সংমিশ্রণ রয়েছে। যারা এ ওষুধটি তৈরি করেছে এবং কয়েকশ বছর একে ব্যবহার করে দেখেছে, তারা নিজেরাই আজ একে পুরোপুরি সেবন না করার জন্যে আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছে। তারা বলছে ঃ 'এ বস্তুটি আমাদের ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে এবং তোমাদেরও ধ্বংস করে ছাড়বে। আমরা নিজেরাই এক খাঁটি সঞ্জীবনীর প্রত্যাশা করছি। আমরা নিশ্চিতরূপে না জানলেও অনুমান করি যে, সে সঞ্জীবনী তোমাদের কাছেই বর্তমান রয়েছে। কাজেই তোমরা যেনো নিজেদের সঞ্জীবনীকে ধূলিসাৎ করে আমাদের বিষদুষ্ট ওষুধটির স্বাদ গ্রহণে লেগে না যাও!'

অন্যদিকে আমাদের আলিম ও ধার্মিক সম্প্রদায়ের জন্যেও এ ভাষণটিতে রয়েছে প্রচুর চিন্তার খোরাক। তাঁরা বর্তমান যে দুনিয়ায় বসবাস করছেন, তার সামনে ইসলামী শিক্ষার কোন্ দিকগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরা দরকার, তা এ থেকে তাঁরা অনুমান করতে পারবেন। এই দুনিয়া কয়েক শতাব্দী ধরে বস্তুবাদী সভ্যতার পরিক্ষা-নিরিক্ষা চালিয়ে আজ একরূপ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কয়েক শতক আগে সন্ধানী ভাবধারা ও মুক্ত চিন্তার যে সঞ্জীবনী আমরা ইউরোপবাসীকে সরবরাহ করেছিলাম, তারা তাকে নিছক অজ্ঞতাবশত ধর্মহীনতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার বিষ

---

* প্রবন্ধটি ১৯৩৯ সালের মার্চে তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

মিশ্রিত করে এক নতুন সভ্যতা সঞ্জীবনীর জন্ম দিয়েছে। সে সঞ্জীবনী নিজের শক্তিবলে তাদেরকে উন্নতির শীর্ষদেশে উন্নিত করেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার বিষক্রিয়াও বরাবর ক্রিয়াশীল রয়েছে। এমনকি সে সঞ্জীবনী আজ পুরোপুরি বিষদুষ্ট হয়ে পড়েছে। তার তিক্ত পরিণাম ফল উত্তমরূপে ভোগ করার পর আজ আবার তারা নতুন সঞ্জীবনীর সন্ধানে চারদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করছে। তাদের সঞ্জীবনীর ভেতর কী কী বিষাক্ত জিনিস রয়েছে এবং সেগুলো তাদের জীবনে কী গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে, তা তারা বুঝতে পেরেছে। আর ঐ প্রতিক্রিয়াগুলোকে দূর করার জন্যে কী ধরণের সঞ্জীবনী তাদের প্রয়োজন, তাও তারা আজ অনুভব করতে পারছে। কিন্তু যে সঞ্জীবনীর তারা সন্ধান করে ফিরছে, তা যে ইসলাম ছাড়া দুনিয়ার আর কারো কাছে বর্তমান নেই এবং যে দাওয়াখানা থেকে তারা প্রথম বটিকাটি নিয়েছিল এই শেষ বটিকাটিও যে সেখানেই পাওয়া যাবে এই কথাটুকু তাদের জানা নেই। এই পর্যন্ত পৌঁছার পরও যদি তারা ঈপ্সিত স ীবনীর জন্যে ছুটাছুটি করতে থাকে এবং তা না পেয়ে হলাহল দ্বারা সারা দুনিয়াকে বিষাক্ত করতে থাকে, তাহলে সে মহাপাপে তাদের সঙ্গে আমাদের আলিম সমাজকেও সমানভাবে শরীক হতে হবে। আজকে খোদাতত্ত্ব, অতিপ্রকৃতিবাদ এবং খুঁটিনাটি শাস্ত্রীয় বিষয় নিয়ে বিতর্ক বাহাসে লিপ্ত থাকবার সময় আলিম সমাজের নেই। রসূল সা.-এর গায়েবী ইলম ছিলো কিনা? আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন কিনা? রসূলের কোনো তুলনা সম্ভব কিনা? ইসালে সওয়াব ও কবর যিয়ারতের শরয়ী মর্যাদা কী? শব্দ করে আমীন বলা ও 'রাফে ইয়াদাইন' করা হবে কিনা? মসজিদের মিনার ও মিম্বরের মধ্যে কতোটুকু পার্থক্য রাখা হবে ইত্যাকার খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান করার জন্যে আজ আমাদের ধর্মীয় নায়কগণ নিজেদের সমগ্র শক্তি ক্ষমতার অপচয় করছেন। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় এই সমস্যাগুলোর কোনোই গুরুত্ব নেই এবং এগুলোর মীমাংসার ফলে সত্য মিথ্যা ও হেদায়েত গুমরাহীর এই বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের অবসান হতে পারেনা; বরং কয়েক শতক ধরে খোদাবিমুখতা ও ধর্মহীনতার ভিত্তিতে জ্ঞান বিজ্ঞান ও সমাজ তমুদ্দুনের ক্রমবিকাশের ফলে যে জটিল সমস্যাবলীর উদ্ভব হয়েছে, সেগুলোর যথাযথ উপলদ্ধি করাই হচ্ছে আজকের সবচাইতে বড় প্রয়োজন এবং সেগুলো পুরোপরি বিশ্লেষণ করে ইসলামী নীতির আলোকে তার গ্রহণযোগ্য সমাধান পেশ করাই হচ্ছে আজকের আসল কাজ। আমাদের আলিম সমাজ যদি এ কাজের জন্যে নিজেদেরকে যোগ্য করে না তোলেন এবং সুষ্ঠুভাবে এটি সম্পন্ন করার প্রয়াস না পান, তাহলে ইউরোপ আমেরিকার যা পরিণাম হবার তা তো হবেই, খোদ মুসলিম জাহানও একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ পাশ্চাত্য দেশগুলো যেসব সমস্যায় জর্জরিত, গোটা মুসলিম জাহান ও ভারতবর্ষে তা-ই আজ অতি তীব্রতার সঙ্গে পয়দা হচ্ছে। আর এগুলোর কোনো সঠিক সমাধান পেশ না করার ফলে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই আজ ঐ ব্যাধিগ্রস্তদের 'নোসখা'-ই ব্যবহার করে চলেছে। কাজেই বিষয়টি আজকে আর শুধু ইউরোপ আমেরিকার নয়; বরং এটি আমাদের নিজস্ব ঘর এবং আমাদের ভাবী বংশধরদেরই সমস্যা।

এসকল কারণেই আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ও আলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে লর্ড লোথিয়ানের ভাষণটি প্রণিধান করা কর্তব্য। আমরা তাঁর বক্তব্যের

মর্মোপলব্ধি করার জন্যে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ ভাষণটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

লর্ড লোথিয়ান তাঁর ভাষণের শুরুতেই বলেন ঃ

> আর একটি বিচার্য বিষয়ের প্রতি আজ আমি আপনাদের দৃষ্টি আর্কষণ করতে চাই। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার যে মারাত্মক কুফল আজ ইউরোপ ও আমেরিকা ভোগ করছে, ভারতবর্ষ কী তা থেকে বেঁচে থাকতে পারে? আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে পাশ্চাত্যে দু'টি বিরাট পরিণাম ফল উদ্ভূত হয়েছে। একদিকে সে প্রকৃতি এবং তার শক্তিগুলোর ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে অনেক প্রশস্ত করে দিয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ সমাজে এবং সাধারণভাবে গোটা দুনিয়ায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় অনুশাসনকে দুর্বল করে দিয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর অন্তত অর্ধেক বিকৃতি এই দু'টি কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আজকের সুসভ্য মানুষ বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত শক্তির নেশায় আত্মহারা বটে, কিন্তু সে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমাজ তমদ্দুনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক ক্ষেত্রে সুষম উন্নতি সাধন করতে পারেনি। অথচ এ জিনিসটি বৈজ্ঞানিক শক্তিগুলোকে মানুষের ধ্বংসের পরিবর্তে তার কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারতো।'

এই ভূমিকায় লর্ড লোথিয়ান প্রকৃতপক্ষে মানবীয় তাহযীব ও তমদ্দুনের বুনিয়াদী সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। বিজ্ঞান নিছক বিজ্ঞান হিসেবে চিন্তা-গবেষণা ও অন্বেষণ অনুশীলনের ঔৎসুক্য বৈ-কিছু নয়। এরই বদৌলতে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিগুলোর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সেগুলোকে কাজে লাগানোর জন্যে উপায় উপকরণ সংগ্রহ করে। এই জ্ঞান সম্পদের উন্নতির ফলে মানুষ যে নতুন শক্তিগুলো অর্জন করে, সেগুলোকে প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করতে শুরু করলে তাকে বলা হয় সভ্যতার উৎকর্ষ। কিন্তু এই জিনিস দু'টি আপনা থেকে মানুষের কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনা। এগুলো যেমন কল্যাণের হেতু হতে পারে, তেমনি হতে পারে ধ্বংসের কারণও। হাত দ্বারা কাজ করার পরিবর্তে মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করতে শুরু করেছে। জানোয়ারে চড়ে সফর করার পরিবর্তে রেল, মোটর, জাহাজ ও বিমানে চড়ে যাতায়াত আরম্ভ করেছে। ডাক হরকরার পরিবর্তে বিজলী তার ও ওয়ার্লেসের মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদান করা হচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ আগের চাইতে বেশী সুখী ও স্বচ্ছল হয়েছে। এই জিনিসগুলো দ্বারা তার যে পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়তে পারে, সেই পরিমাণে তার বিপদ ও ধ্বংসের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেতে পারে। কারণ যে স্তরে মানুষের কাছে শুধু তীর ধনুক ও তরবারি জাতীয় অস্ত্র ছিলো, তার তুলনায় যে সভ্যতা তার হাতে মেশিন গান, বিষাক্ত গ্যাস, উড়োজাহাজ ও ডুবোজাহাজ তুলে দিয়েছে, তা অনেক বেশি মারাত্মক হতে পারে। জ্ঞান বিজ্ঞানের ও তমদ্দুনের উন্নতির পক্ষে কল্যাণের হেতু বা ধ্বংসের কারণ হওয়াটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই সভ্যতার ওপর, যার প্রভাবধীনে জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও কৃষ্টি তমদ্দুন বিকাশ লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ক্রমবিকাশের ধারা মানবীয় চেষ্টা সাধনার লক্ষ্য এবং অর্জিত শক্তিগুলোর প্রয়োগ ক্ষেত্র নির্ণয়

করার দায়িত্ব হচ্ছে সভ্যতার। এটিই মানুষের পারস্পারিক সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণ করে, তার সামাজিক জীবনের নিয়মনীতি এবং ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদির জন্যে নৈতিক বিধি বিধান তৈরি করে দেয়। ফলকথা জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যে শক্তিগুলো মানুষ অর্জন করেছে, সেগুলোকে তার সভ্যতার মধ্যে কিভাবে প্রয়োগ করবে, কী উদ্দেশ্যে এবং কী প্রকারে ব্যবহার করবে, বিভিন্নরূপ ব্যবহার বিধির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি বর্জন আর কোন্ কোন্‌টি গ্রহণ করবে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার জন্যে এই জিনিসটিই মানুষের মনকে যোগ্য করে তোলে।

বস্তুত জড়জগতে পর্যবেক্ষণ এবং প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাটাই কোনো উচ্চতর সভ্যতার ভিত্তি হতে পারেনা। কারণ এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মর্যাদা একটি বুদ্ধিমান জীবের বেশি কিছু নয়। এগুলোর সাহায্যে শুধু বস্তুতান্ত্রিক জীবনাদর্শই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অর্থাৎ মানুষের জন্যে এই দুনিয়ার জীবনটাই হচ্ছে একমাত্র জীবন। এ জীবনে নিজের জৈবিক কামনা-বাসনাকে যতোদূর সম্ভব পূর্ণ করাই হচ্ছে তার চরম ও পরম লক্ষ্য। বিশ্ব প্রকৃতিতে বাঁচার সংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যোগ্যতমের উর্ধ্বতন সম্পর্কে যে বিধান কার্যকরী রয়েছে, তাকেই চরম সত্য বলে গ্রহণ করে এবং আশ পাশের তামাম সৃষ্টবস্তুকে নিষ্পিষ্ট করে সবার ওপরে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে শক্তির আসল প্রয়োগ ক্ষেত্র। এই জীবন দর্শনই হচ্ছে ইউরোপের অনুসৃত কৃষ্টি সভ্যতার মূল ভিত্তি। এরই ফলে জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার উৎকর্ষ মানুষের হাতে যতো শক্তিই তুলে দিয়েছে, তা মানবতার কল্যাণের পরিবর্তে তার ধ্বংসের পথেই নিয়োজিত হতে শুরু করেছে। আজ ইউরোপবাসী নিজেরাই অনুভব করতে পারছে যে, তাদের জৈবিক সভ্যতা থেকে উচ্চতর একটি মানবিক সভ্যতার প্রয়োজন। আর সেই সভ্যতার ভিত্তি ধর্ম ছাড়া আর কিছুই হতে পারেনা।

সামনে এগিয়ে লর্ড লোথিয়ান বলেন ঃ

> সায়েন্টিফিক স্পিরিট (সন্ধানী মনোভাব) ক্রমশ লোকদের ভেতর থেকে পুরনো কুসংস্কারগুলো দূর করে দিয়েছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে এবং এভাবে প্রাচীনকালের বহু বন্ধন থেকে নর-নারীকে মুক্তিদান করেছে সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই সঙ্গে সে মানুষকে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সত্যেরও প্রচন্ড মুখাপেক্ষী করে তুলেছে। অথচ সত্য অবধি পৌঁছাবার কোনো পথের সন্ধান সে দিতে পারেনি। আজকের অধিকাংশ পাশ্চাত্যবাসী শিশুসুলভ ক্ষিপ্রতা, বৈচিত্র বিলাস ও ইন্দ্রিয় সুখের নেশায় বিভোর। অনাড়ম্বর জীবন যাপনের সামর্থ তাদের থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের পেশকৃত আদিম, অসীম ও অনন্ত সত্যের সঙ্গে তাদের কোনোই সংযোগ নেই।
>
> ধর্ম মানুষের জন্যে অপরিহার্য পথিকৃত। মানব জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় নৈতিক লক্ষ্য, মর্যাদা ও তাৎপর্য লাভ করার এটিই একমাত্র মাধ্যম। এর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংকুচিত হবার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বংশগত ও শ্রেণীগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক অপকৌশলের প্রতি পাশ্চাত্য দুনিয়া আসক্ত হয়ে পড়েছে এবং যে বিজ্ঞান বস্তুগত উন্নতিকেই চরম লক্ষ্য বলে আখ্যা দেয় এবং জীবনকে দিন দিন জটিল ও দুর্বিষহ করে তোলে, তার

প্রতি ঈমান এনে বসেছে। পরন্তু বর্তমান যুগের সবচাইতে বড় আপদ জাতীয়তাবাদের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্যে আত্মা ও জীবনের মধ্যে যে ঐক্যের প্রয়োজন, সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাও আজকের ইউরোপের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-ও হচ্ছে ধর্মীয় কর্তৃত্ব হ্রাস পাবার একটি উল্লেখযোগ্য ফল।

অতপর লর্ড লোথিয়ান ভারতের আধুনিক শিক্ষিত লোকদের সামনে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন ঃ

ভারতের দু'টি বৃহৎ ধর্ম হিন্দুমত ও ইসলাম কি পাশ্চাত্যের ধর্মীয় বিদ্বেষের চাইতে বেশি সাফল্যের সঙ্গে আধুনিক যুগের সমালোচনা ও সন্ধানী ভাবধারার মোকাবিলা করতে পারবে? এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যদি ভারতকে পাশ্চাত্যের ওপর আপতিত বিপদাপদ থেকে রক্ষা করতে হয়, তবে এই প্রশ্নটির প্রতি এদেশের চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এটা নিসন্দেহ যে, সন্ধানী ভাবধারা ক্রমে ক্রমে ভারতের জনগণের মধ্য থেকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার উৎপাদনগুলোকে বিলীন করে দেবে এবং এটা খুবই ভালো কাজ হবে। কিন্তু এই জিনিসটি কী ভারতের রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও শৈল্পিক জীবনের ভাবী নেতৃবৃন্দের মন মগজ থেকে উভয় ধর্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূলনীতিকেও বের করে দেবে? আমি হিন্দুমত ও ইসলামের অভ্যন্তরীণ জীবন সম্পর্কে বেশি পরিচিতির দাবিদার নই। তবু আমি মনে করি, এই দু'টি ধর্মের মধ্যে এমনসব উপাদান রয়েছে, যা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষ ও মেয়েদেরকে আয়ত্তাধীন রাখার ব্যাপারে এর যে কোনো একটিতে যোগ্য করে তুলতে পারবে। খ্রীস্টধর্ম তো এ ব্যাপারে এমন কতকগুলো ভ্রান্ত বিশ্বাসজাত বন্ধনের ফলে ব্যর্থকাম হয়েছে, যা এই ধর্মের মহান প্রবর্তকের পেশকৃত সত্যতাকেই গোপন করে ফেলেছে।

এখানে লর্ড লোথিয়ান নিজেই স্বীকার করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্ববাদ ও ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বেশি কিছু জানাশোনা নেই। তিনি শুধু দূর থেকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য জিনিস দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে এই জিনিসগুলো আধুনিক সমালোচনা ও সন্ধানী ভাবধারার মুকাবিলায় শিক্ষিত লোকদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে সফলকাম হতে পারে। কিন্তু যারা এই উভয় ধর্ম তথা ভারতের সমস্ত ধর্মের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত তাদের কাছে এটা মোটেই গোপন নয় যে, সমালোচনা ও সন্ধানী ভাবধারার মুকাবিলায় টিকে থাকতে চাইলে একমাত্র ইসলামই টিকে থাকতে পারে; বরং স্পষ্টতম ভাষায় বলতে গেলে, এমনি ভাবধারাসহ কোনো ধর্মের পক্ষে তার অনুবর্তীদের নিয়ে সামনে এগোবার এবং প্রগতি ও আলোকের যুগে গোটা মানব জাতির ধর্মরূপে স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর কারো নেই। খ্রীস্টধর্ম কেনো ব্যর্থকাম হয়েছে? কেবল এই জন্যে যে, তা কোনো সামাজিক মতাদর্শ নয়; বরং তা সমাজবদ্ধতারই ঘোর বিরোধী। সে শুধু ব্যক্তির নাজাত সম্পর্কেই আলোকপাত

করে আর সে নাজাতের জন্যেও সে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হয়ে আস্‌মানী বাদশাহীর মুখাপেক্ষী হওয়াকে একমাত্র পন্থা বলে নির্দেশ করে। এ কারণেই ইউরোপের জাতিগুলো উন্নতি ও তরক্কির পথে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীস্টধর্ম তাদের সহায়ক হবার পরিবর্তে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তার বন্ধনকে ছিন্ন করেই তাদের এগিয়ে চলতে হয়। হিন্দুধর্মের অবস্থাটাও এরই সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তার কাছেও কোনো প্রগতিশীল জীবন দর্শন, কোনো যুক্তিসম্মত নৈতিক বিধান ও কোনো প্রসারমান সমাজপদ্ধতি বর্তমান নেই। আজ পর্যন্ত হিন্দুদেরকে একটি সমাজ পদ্ধতিতে বেঁধে রাখার এবং অন্যান্য সভ্যতার প্রভাব গ্রহণ থেকে তাদেরকে বিরত রাখার ব্যাপারে সবচাইতে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে তাদের বর্ণাশ্রম প্রথা। কিন্তু বর্তমান যুগের সমালোচনা ও সন্ধানী ভাবধারার সামনে এই বন্ধনটি ছিন্ন হতে বাধ্য এবং এ ছিন্ন হবেই। এরপর আর কোনো জিনিস হিন্দু সমাজকে ভাঙ্গনের হাত থেকে বাচাঁতে পারবেনা। ফলে তার রুদ্ধ দরজা বহিপ্রভাবের জন্যে উম্মুক্ত হয়ে যাবে। পরন্তু এটাও লক্ষ্যণীয় যে, হিন্দুদের প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজ বিধান, পুরনো মুর্তিপূজামূলক কুসংস্কার এবং তাদের অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক দার্শনিক মতগুলো আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও সমাজ সচেতনতার সামনে টিকে থাকতে পারেনা। তাই এখন হিন্দুরা দিন দিন এমনি এক চরম সন্ধিক্ষণের নিকটবর্তী হচ্ছে যেখানে তাদের এবং বহুলাংশে ভারতের ভাগ্য নির্ণীত হবে। হয়তো তারা ইউরোপের রেনেসাঁ আমলের খ্রীষ্টানদের ন্যায় ইসলামের প্রতি বিমুখ ও বিদ্বেষান্ধ হয়ে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার পথ অবলম্বন করবে, নতুবা দলে দলে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকবে।

এই ফয়সালা বহুলাংশে মুসলমানদের, বিশেষত প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষিত লোকদের কর্মধারার ওপর নির্ভর করছে। কারণ ইসলাম শুধু তার নামের জোরেই কোনো মু'জিযা দেখাতে পারেনা। তার নীতি ও আদর্শ শুধু কিতাবের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ থাকলে তার পক্ষেও কোনো মু'জিযা দেখানো সম্ভবপর নয়। যে অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে বর্তমানে মুসলমানরা লিপ্ত রয়েছে, যে জড়তা ও স্থবিরতা তাদের আলিম সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং যেরূপ নারীসুলভ ভীরুতা ও লাজুকতা তাদের নব্যশিক্ষিত বংশধরদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে ভারতের আত্মাকে জয় করা তো দূরের কথা, ইসলামের দাবিদারগণ নিজেদের জায়গায়ই টিকে থাকতে পারবে বলে আশা করা যায়্না। **বিপ্লবের খরস্রোতের মুখে কোনো জাতির স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব ব্যপার। হয় তাকে স্রোতের মুখে ভেসে যেতে হবে, নতুবা পূর্ণ বিক্রমের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে স্রোতের গতিমুখ ঘুরিয়ে দিতে হবে।** এই দ্বিতীয় অবস্থাটি কেবল এভাবেই সৃষ্টি হতে পারে যে, প্রথমত সাধারণ মুসলমানদের নৈতিক অবস্থার সংশোধন করতে হবে এবং তাদের মধ্যে ইসলামী যিন্দেগীর মূল ভাবধারা উজ্জীবিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত আলিম সমাজ ও নব্য শিক্ষিত মুসলমানদের মিলিতভাবে ইসলামী নীতির আলোকে জীবনের আধুনিক সমস্যাবলী অনুধাবন করতে হবে এবং আদর্শ ও বাস্তব উভয় দিক থেকেই সেগুলোর সুষ্ঠু সমাধান পেশ

করতে হবে – যাতে করে অন্ধ বিদ্বেষী ছাড়া প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষই স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, একটি প্রগতিশীল সমাজের পক্ষে ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতা ছাড়া আর কোনো ভিত্তিই নির্ভুল ও নির্দোষ হতে পারেনা।

ভারতে[১] ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে আজকে যে ধরনের বিরোধ চলছে, আজ থেকে ৫০/৬০ বছর পূর্বে ইউরোপে তেমনি বিরোধই বর্তমান ছিলো। কিন্তু ইউরোপের উচ্ছিষ্টভোজী ভারতেও খুব শীগ্‌গীরই পট পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। কাজেই সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন ধর্মের বিরুদ্ধে অন্তত যুক্তি ও জ্ঞানের দিক থেকে এই বিদ্বেষের অস্তিত্ব থাকবেনা। অবশ্য সে জন্যে শর্ত এই যে, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্যে আগে থেকেই আমাদের তৈরী থাকতে হবে। লর্ড লোথিয়ান সংক্ষেপে এই নিগূঢ় সত্যের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন ঃ

> ৬০ বছর পূর্বে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যে লড়াই চলছিল, তার অবসানের কোনোই প্রত্যাশা ছিলোনা; বরং জীবনের আধ্যাত্মিক ও যান্ত্রিক ধারণার মধ্যকার এই যুদ্ধ সম্পর্কে এমনি সংশয় দেখা দিয়েছিলো যে, এ দুয়ের মধ্যকার কোনো একটির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এর অবসান হবেনা। কিন্তু আজকে উভয় বিবাদমান পক্ষই রণে ভঙ্গ দিয়েছে। বিজ্ঞানী কি ধার্মিক, এ দুয়ের কেউই আজ দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করছেন না যে, বিশ্ব প্রকৃতির তামাম রহস্য তিনি উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছেন - সমস্ত জটিলতার তিনি মীমাংসা করতে পেরেছেন; বরং প্রকৃতপক্ষে এ রহস্য সম্পর্কে তিনি আদৌ কিছু জানেন কিনা উভয়ের মনে এমনি একটা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই আজকে এমন একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যা জ্ঞান বিজ্ঞানের নিত্য নতুন অগ্রগতির মাঝে অসম্ভব মনে হয়েছিলো।

লর্ড লোথিয়ান অবশ্য ধর্ম সম্পর্কে খ্রীস্টীয় ধারণার প্রভাবমুক্ত নন। তাছাড়া তিনি ধর্ম সম্পর্কে ইসলামের যুক্তিসম্মত ধারণারও সন্ধান পাননি। এ কারণে তিনি বড়জোর এটুকুই ভাবতে পারেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে আজকে কোনো সমন্বয় হতে পারে। কিন্তু আমরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়কে সম্পূর্ণ অর্থহীন মনে করি। আমাদের দৃষ্টিতে কেবল যথার্থ ধর্মই বিজ্ঞানের প্রাণবস্তু এবং তার পথ নির্দেশক শক্তিতে পরিণত হতে পারে, আর প্রকৃতপক্ষে এরূপ ধর্মই হচ্ছে ইসলাম। আজকে বিজ্ঞানের প্রাণবস্তু হবার পথে ইসলামের কোনো বাধা থেকে থাকলে তা তার অন্তর্নিহিত ত্রুটি নয়; বরং তা হচ্ছে তার অনুবর্তীদের সীমাহীন অলসতা এবং বিজ্ঞানের ধ্বজাবাহীদের অজ্ঞতা ও জাহিলীসুলভ বিদ্বেষ। এ দুটি বাধা অপসারিত হলে বিজ্ঞানের খাঁচার মধ্যে ইসলাম অবশ্যই প্রাণবস্তু হয়ে থাকবে।

সামনে অগ্রসর হয়ে প্রাজ্ঞ বক্তা আর একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন। তা হলো এই যে, বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক জাগরণ ও বুদ্ধিভিত্তিক সমালোচনার মোকাবিলায় কোনো ধরনের ধর্ম কি টিকে থাকতে পারে? বর্তমান আলোকজ্জ্বল যুগে মানুষ যে ধর্মের অনিসন্ধিৎসু, তার কি কি বৈশিষ্ট থাকা উচিত? এবং বর্তমান মানুষ কোন্ কোন্ মৌল প্রয়োজনে ধর্মের পথ নির্দেশ খুঁজে বেড়াচ্ছে?

১. উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছে ১৯৩৮ সালে। অবিভক্ত ভারতের তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধে যেসব সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছিলো, খণ্ডিত ভারতের দেশে দেশে আজো তা বর্তমান রয়েছে। - অনুবাদক

এটিই হচ্ছে আলোচ্য ভাষণের সবচাইতে বেশি লক্ষণীয় বিষয়। তিনি বলেছেন ঃ

> পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার ধারণা যদি ভ্রান্ত না হয়, তবে এ সত্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমান সময়ের ধর্ম এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। এ পরীক্ষায় সে কেবল তখনি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারবে, যখন নব্য বংশধরগণ তার অন্তর্নিহিত বিধি ব্যবস্থার পরিক্ষা নিরিক্ষা করে এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারবে যে, জীবনের সমস্ত বাস্তব সমস্যা জিজ্ঞাসা ও জটিলতার সুষ্ঠু সমাধান এই ধর্মের মধ্যেই নিহিত। ব্যক্তিগত ধর্মের দিন আজ আর নেই। সেদিন আগেই বিদায় নিয়েছে। নিছক ভাবপ্রবন ধর্মের আজ কারো প্রয়োজন নেই। যে ধর্ম কেবল মানুষের নৈতিক আচার ব্যবহার সম্পর্কেই বিছুটা বিধি ব্যবস্থা দেয়ার মতো সাহায্য করতে পারে এবং বড়জোড় পরকালীন মুক্তিরই প্রতিশ্রুতি দিতে সক্ষম, তার যুগও আজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বর্তমান যুগের যুক্তিবাদী মানুষ তো প্রতিটি জিনিসকে এমন কি সত্যকেও প্রত্যক্ষ ফলাফলের মানদন্ডে যাচাই করে দেখতে চায়। তার যদি ধর্মের আনুগত্য করতে হয়, তা হলে পূর্বাহ্নে তার এ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে যে, ধর্মের কাছে তার বাস্তব সমস্যাবলীর কি সমাধান রয়েছে। বহু জন্ম-জন্মান্তর পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত নির্বাণ লাভের প্রত্যাশা কিংবা মৃত্যুর পর্যায় অতিক্রম করে আসমানী রাজত্বে উপনীত হবার প্রতীক্ষা এমন কোনো জিনিস নয় যে, কেবল এর ওপর ভরসা করেই সে ধর্ম গ্রহণ করবে। তার দার্শনিক অনুসন্ধিৎসার কারণে ধর্মকে সর্বপ্রথম এমন চাবিকাঠি সংগ্রহ করে দিতে হবে, যদ্দারা সে বিশ্ব প্রকৃতির গোপন রহস্যের কোনো সন্তোষজনক সমাধান বের করতে পারে। পরন্ত তাকে যথাযথ বৈজ্ঞানিক পন্থায় কার্য ও কারণ – তথা নিমিত্ত ও ফলাফলের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে, বর্তমান যেসব উদ্ধত ও দূর্বীনিত শক্তি মানব জাতির কল্যাণের পরিবর্তে ধ্বংসের হুমকি প্রদর্শন করছে, সেগুলোকে সে কিভাবে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে পারে, অনুরূপভাবে সে বেকার সমস্যা, অযৌক্তিক বৈষম্য, জুলুম পিড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অন্যান্য সামাজিক বিকৃতি কিভাবে নির্মূল করবে, লোকদের পারস্পারিক হানাহানি এবং পারিবারিক ব্যবস্থার বিপর্যয়কে বিভাবে রোধ করবে, ইত্যাকার বিষয়ও ধর্মকে নির্দেশ করতে হবে। কারণ এই সমস্যাগুলোই মানুষের সমস্ত আনন্দকে ছিনিয়ে নিয়েছে।
>
> ধর্মের প্রতি আজ মানুষের এতোটা মুখাপেক্ষী হবার একমাত্র কারণ এই যে, বিজ্ঞান তার সমস্যাবলীর সমাধানের পরিবর্তে একে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এ কারণেই সে ধর্মের কাছ থেকে নিজের সন্দেহ ও সমস্যাবলীর মীমাংসা করানোর ব্যাপারে আজকের মতো এতোটা ব্যাকুল আর কখনো হয়নি। কাজেই ধর্ম তার চৌহদ্দির নিরাপত্তা এবং তার লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চাইলে উল্লেখিত প্রশ্নাবলীর আধ্যাত্মিক অথচ বিজ্ঞানসম্মত জবাব দান করতে হবে – যাতে করে এই দুনিয়ায় বসেই তার যথার্থতাকে ফলাফলের মানদন্ডে যাঁচাই, পরখ করা যেতে পারে। অর্থাৎ সে জবাবকে মৃত্যুর

পরবর্তী দুনিয়ার জন্য শিকায় তুলে রাখা যাবেনা। আমরা পাশ্চাত্যবাসীরা জানি যে, এটিই হচ্ছে আমাদের এ যুগের সবচাইতে বড় সমস্যা। আপনারা ভারতবাসীরা এর কি জবাব দিতে পারেন?

লর্ড লোথিয়ানের ভাষণের এ অংশটি পড়ার মনে হয় সত্যই, একজন পিপাসার্ত ব্যক্তি যেনো যাতনায় ছটফট করছে। তার পানি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই; কিন্তু পিপাসার লক্ষণগুলোকে সে যথাযথ অনুভব করছে এবং তার কলিজার আগুন কোন্ কোন্ গুণবিশিষ্ট জিনিস কামনা করছে, তাও সে স্পষ্টত বলে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় তার সামনে পানি এনে হাযির করা হলে তার প্রকৃতি অমনি বলে উঠবে, এই জিনিসটির জন্যেই তো সে পিপাসায় অস্থির। এমনকি পানির পাত্রটি নিয়ে চুমুক লাগাতেও সে কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি করবেনা। এই অবস্থা শুধু লর্ড লোথিয়ানেরই নয়; বরং ইউরোপ, আমেরিকা তথা পৃথিবীর যেখানেই মানুষ পাশ্চাত্য সভ্যতার আগুনে দগ্ধ হয়েছে এবং দর্শন ও বিজ্ঞানরূপ মরুভূমির তীরবর্তী সবুজ বর্ণালী অতিক্রম করে মধ্যবর্তী পানি তৃণ লতাহীন প্রান্তরে এসে উপনীত হয়েছে, তারা সবাই আজ একই রূপে তৃষ্ণার্ত এবং লর্ড লোথিয়ানের ন্যায় সবাই একই গুণবিশিষ্ট জিনিস কামনা করছে। এরা কেউই পানির নাম জানেনা, তা কোথায় পাওয়া যাওয়া যায় সে কথাও কেউ জানেনা; কিন্তু থেকে থেকে শুধু চীৎকার করছে 'যে জিনিসটির দ্বারা কলিজার আগুন নেভানো যাবে, তা শীগ্‌গীর নিয়ে এসো!'

পানির নাম অবশ্য শুনেছে; কিন্তু তার আসল চেহারা তারা প্রত্যক্ষ করেনি; বরং অজ্ঞ ও বিদ্বেষান্ধ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তারা একথাও শুনে আসছে যে, 'সাবধান! পানির কাছেও যেওনা, এ একটি ভয়ংকর বিষাক্ত জিনিস।' এ কারণেই তারা এ নামটিকে ভয় করে আসছে। কিন্তু আজকে পরিস্থিতি এমনি পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, নামটি গোপন করে আসল জিনিসটি যদি তাদের সামনে পেশ করা হয়, তবে সত্যই তারা বলে উঠবে ঃ 'হ্যাঁ, এ জিনিসটির জন্যেই আমরা তৃষ্ণার্ত ছিলাম।' তারপর যদি তাদের বলা হয়, 'জনাব! যে নামটিকে আপনারা ভয় করছেন, এ হচ্ছে সেই পানি,' তা হলে তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলবে ঃ 'এতোদিন আমরা কী ধোকার মধ্যেই না ছিলাম!'

বর্তমান যুগের যুক্তিবাদী মানুষ খ্রীস্টধর্মকে খুব ভালোমতো যাচাই পরখ করে দেখেছে। এ ধর্মটি যে তার ব্যাধির কোনো প্রতিকার নয়, একথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের হেয়ালী দর্শন এবং তাদের ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখে কখনো কখনো সে মুগ্ধ হয় বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমালোচনা ও বিশ্লেষণের প্রথম আঘাতেই তাদের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ ধর্ম তো অনেকটা খ্রীস্টধর্মেরই ভারতীয় সংস্করণ। আর হিন্দুধর্ম নিজেই এমনসব সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করে চলেছে, যেগুলো থেকে নিস্তার লাভের আশায়ই বর্তমান যুগের যুক্তিবাদী মানুষ ধর্মের প্রয়োজন অনুভব করছে। এর চৌহদ্দির ভেতরেই মানুষে মানুষে অযৌক্তিক বৈষম্য সবচাইতে বেশি লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক শোষণের সবচাইতে নিকৃষ্ট রূপ – অর্থাৎ মহাজনী ও সুদখোরী এর বিধি ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহের মূল কারণ অর্থাৎ মানুষের গোত্রীয় বিভাগ ও বিদ্বেষ – তার ভিত্তিমূলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে

আছে। তার প্রতিষ্ঠিত সমাজ পদ্ধতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেনা; বরং তাকে বেশুমার শ্রেণী ও গোত্রে বিভক্ত করে দেয়। তার সমাজ বিধান এতোই প্রাচীন ও জরাজীর্ণ যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবধর্মী চেতনার যুগে হাজার হাজার বছরের খান্দানী হিন্দুরা পর্যন্ত সেগুলোকে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এগুলোর ভিত্তি জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের ওপর নয়; বরং বিদ্বেষ ও কুসংস্কারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল পার্থিব বিষয় ছাড়াও ন্যায় শাস্ত্র ও আধ্যাত্মবাদের ক্ষেত্রে তাকে আরো বেশি অকেজো বলে মনে হয়। বিশ্ব প্রকৃতির গোপন রহস্যাবলীর সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা করার মতো কোনো চাবিকাঠি তার কাছে নেই। তার প্রত্যয়গুলো নিছক কাল্পনিক বিষয় মাত্র, তার কোনো একটি বিষয়ের পক্ষেও কোনো বৈজ্ঞানিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ পেশ করা যেতে পারেনা। নীতিশাস্ত্রের ব্যাপারে চিত্তহারী কল্পনার একটি ইন্দ্রজাল সে অবশ্যি সৃষ্টি করে – যেমন একটি ইন্দ্রজাল মহাত্মা গান্ধীও সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যুক্তি প্রমাণ ও বাস্তব বিচার বুদ্ধি (Practical wisdom) থেকে তা একেবারেই শূন্য। কাজেই বর্তমান বৈজ্ঞানিক চেতনার যুগে তার ব্যর্থতা যে খুব শীগ্‌গীরই প্রকটিত হয়ে উঠবে, এটা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়।

এরপর বাকি থাকে শুধু ইসলাম। বস্তুত আজকের যুক্তিবাদী মানুষ তার ঈপ্সিত ধর্মের জন্যে যেসব মাপকাঠি পেশ করেছে বা করতে পারে তার প্রতিটি মাপকাঠিতে ইসলাম পুরোপুরি উত্তীর্ণ।

ধর্ম নিছক একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং শুধু ব্যক্তিগত নীতিবোধের সঙ্গেই এর সম্পর্ক রয়েছে, একথা আজকে বাসি হয়ে গেছে। আসলে এ হচ্ছে উনিশ শতকেরই এক বিশেষ খামখেয়ালি মাত্র। অথচ বিশ শতকের এই চতুর্থ দশকে বসেও আমাদের দেশের একশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল লোক এই মতবাদটি প্রচার করে চলছে। এই শ্রেণীর লোকেরা 'প্রগতি' 'প্রগতি' বলে চিৎকার করা সত্ত্বেও হামেশা চলমান বিশ্বের চাইতে পঞ্চাশ বছর পিছনে চলতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আজকে একথা প্রায় সর্বজন স্বীকৃত বলা চলে যে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তির কোনো চিন্তাই করা যেতে পারেনা। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে বেশুমার ছোট বড় সম্পর্কে জড়িত। আর সমাজ হচ্ছে মোটামুটিভাবে একটি দেহ সদৃশ্য। এখানে ব্যক্তির মর্যাদা হচ্ছে জীবন্ত দেহের অঙ্গ প্রতঙ্গের মতো। ধর্মের প্রয়োজন যদি থেকেই থাকে, তবে তা শুধু ব্যক্তির নিজস্ব মনোতুষ্টি বা পরকালীন মুক্তির জন্যে নয়; বরং গোটা সমাজের সংগঠন এবং পার্থিব জীবনের তাবৎ কাজ কারবার পরিচালনার জন্যেই প্রয়োজন। আর তার প্রয়োজন না থাকলে ব্যক্তি বা সমাজ কারুর জন্যেই নেই। সমাজের বিধি ব্যবস্থা হবে একরূপ আর ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচারণ হবে তার থেকে ভিন্নরূপ, এটা নিছক বালকসুলভ বক্তব্য বৈ কিছু নয়। সমাজ জীবনের সাথে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচারণের যদি সম্পর্ক না থাকে, তবে তো তেমন বিশ্বাস ও আচরণ একেবারেই নিরর্থক। শুধু নিরর্থক নয়, বরং যে সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য অংশের সাথে তা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয়, সেখানে তার বিলুপ্তি অনিবার্য। কাজেই দু'টি পন্থার মধ্যে কেবল একটি পন্থাই গৃহীত হতে পারেঃ হয় গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে একেবারে ধর্মহীন করতে হবে এবং কমিউনিস্ট মতবাদ অনুসারে মানব জীবন

থেকে ধর্মকে চূড়ান্তরূপে নির্বাসিত করতে হবে; নতুবা সমাজ জীবনকে পুরোপুরি ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে এবং ইসলামের দাবি অনুসারে জ্ঞান বিজ্ঞান ও কৃষ্টি তমুদ্দুন উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মকে একমাত্র দিশারী বলে মানতে হবে। প্রথম পন্থাটি মানুষ বহুকাল ধরে পরীক্ষা করে দেখছে। তার যে বিষতিক্ত ফলের কথা লর্ড লোথিয়ান উল্লেখ করেছেন, তা-ই তা থেকে উৎপন্ন হতে পারে এবং তা-ই উৎপন্ন হয়েছে। আর ভবিষ্যতেও এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটবেনা। এমতাবস্থায় দুনিয়ার মুক্তি কেবল দ্বিতীয় পন্থাটির মধ্যেই নিহিত এবং এই পন্থাটি বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু পূর্বে যেমন বলেছি, এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা কিংবা একে চিরতরে হারিয়ে ফেলা সম্পূর্ণত মুসলমানদের ইচ্ছাধীন। বাস্তব ঘটনা দুনিয়া এবং দুনিয়ার একটি অংশ হিসেবে আমাদের এই দেশকে এমন এক স্থানে নিয়ে এসেছে, যেখান থেকে চলার গতি ইসলামের দিকেও ঘুরে যেতে পারে, আবার বস্তুতন্ত্র ও নৈতিক অরাজকতার অতল গহ্বরে গিয়েও পৌঁছা সম্ভব। সম্ভবতই তার গতি আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় পথের দিকেই রয়েছে; কারণ এক সুদীর্ঘকাল থেকে দুনিয়া এ পথেই এগিয়ে চলছে। অবশ্য এই পথের নানা বিপদাপদ ও বিভীষিকা দেখে সে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছে এবং এছাড়া কোনো বাঁচার পথ আছে কিনা, চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে তাও নিরীক্ষণ করছে। কিন্তু বাঁচার কোনো পথই তার দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছেনা। প্রকৃতপক্ষে তাদের দৃষ্টিশক্তিকে আবরণমুক্ত করা এবং ইসলামের সহজ সরল পথকে একমাত্র মুক্তির পথ বলে প্রমাণ করার মতো শক্তিশালী নেতৃবৃন্দের জন্যে তারা প্রতীক্ষমান। এমন মুজাহিদ ও মুজতাহিদদের কোনো দল যদি মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তো তারাই গোটা পৃথিবীর দিশারী হতে সক্ষম। এমতাবস্থায় পূর্বে যে মর্যাদার আসনে তারা অভিষিক্ত ছিলো এবং সেখানে পাশ্চাত্য জাতিগুলোকে অধিষ্ঠিত দেখে আজকে তারা লালায়িত হচ্ছে, সে আসন আবার তারা লাভ করতে পারে। কিন্তু এ জাতির সংখ্যাগুরু অংশ যদি আজকের মতোই হতাশা ও নিরুৎসাহের সঙ্গে বসে থাকে, তার যুব সম্প্রদায় যদি পরের উচ্ছিষ্ট ভোজনকেই চরম স্বার্থকতা মনে করে, তার আলিম সমাজ যদি প্রাচীন ফিকাহ ও কালামের অন্তসারশূন্য বিতর্কে লিপ্ত থাকে, তার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকৃষ্ট মানসিকতা যদি ভিন জাতির পদাঙ্ক অনুসরণকেই 'জিহাদী মনোবৃত্তির' উচ্চতম আদর্শ বলে গণ্য করেন এবং আপন জাতিকে বিশ শতকের সবচাইতে বড় প্রতারণার ফাঁদে নিক্ষেপ করাকেই বিরাট কৃতিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা বলে ভাবেন – ফলকথা এই বিশাল জাতির আপাদমস্তক সবটাই যদি নিষ্ক্রিয়তা ও অকর্মন্যতায়ই লিপ্ত থাকে এবং এই কোটি কোটি মানুষের মধ্য থেকে কয়েকজন মর্দে মু'মিনও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ইজতিহাদ ও সংগ্রাম সাধনার জন্যে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে আসতে না পারেন, তাহলে দুনিয়া যে অতল গহ্বরের দিকে ধাবিত হচ্ছে, সে গহ্বরে এ জাতিও একদিন নিক্ষিপ্ত হবে। তারপর আল্লাহর গযব আর একবার গর্জন করে উঠবে ঃ

اَلَا بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (অর্থ ঃ ধ্বংস হোক যালিম সম্প্রদায়।')

❖❖❖

৭

তুরস্কের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাত*

খালেদা এদিব খানমের[১] ভাষণ

খ্যতনামা তুর্কী বিদুষী ও সংগ্রামী মহিলা খালেদা এদিব খানম ১৯৩৫ সালের মধ্যভাগে 'জামেয়া ইসলামিয়া'র আমন্ত্রণক্রমে ভারতে এসেছিলেন। তিনি দিল্লীতে যে কয়টি ভাষণ প্রদান করেন, জামেয়ার অধ্যাপক ডক্টর সাইয়েদ আবিদ হোসাইন 'তুরস্কে প্রাচ্যও পাশ্চাত্যের সংঘাত' নামে তার উর্দু তরজমা প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে উক্ত ভাষণগুলোর প্রতি আমরা কিছুটা আলোকপাত করবো।

মুসলিম জাহানে বর্তমানে দু'টি রাষ্ট্র দু'টি ভিন্ন দিক থেকে বিশ্ব মুসলিমের নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত। মানসিক দিক থেকে মিসর আর রাজনৈতিক দিক থেকে তুরস্ক। মিসরের সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে বেশি গভীর। কারণ তার ভাষা হচ্ছে আমাদেরই নিজস্ব আন্তর্জাতিক ভাষা – আরবি। তার বই পুস্তকাদি তামাম দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে প্রচারিত হয়। তার মানসিক প্রভাব চীন থেকে মরক্কো অবধি বিস্তৃত। এক কথায়, মিসরই হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যকার মেলামেশা, বোঝাপড়া ও জানাজানির একমাত্র সূত্র। পক্ষান্তরে তুর্কী জাতির সংগ্রামী জীবন, পাশ্চাত্য অভিযানের বিরুদ্ধে তাদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা এবং জাতীয় মর্যাদার জন্যে তাদের বিপুল ত্যাগ ও কুরবানী নিসন্দেহে তামাম মুসলিম জাহানকে প্রভাবান্বিত করেছে। এ কারণেই তারা মুসলিম জাহানে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে উপবিষ্ট। কিন্তু ভাষাগত অপরিচিতি এবং পারস্পারিক মেলামেশা ও বোঝাপড়ার অভাব তুরস্ক ও অধিকাংশ মুসলিম দেশের মধ্যে একটি গভীর অন্তরালের সৃষ্টি করেছে। এর ফলে তুর্কী জাতির মানসিক ক্রমবিকাশ, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক গড়ন, তার সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে আমাদের জানাশোনা খুবই সীমাবদ্ধ। বিশেষত সাম্প্রতিক দশ বারো বছরে তুরস্কে যে বিরাট বিপ্লব ঘটে গেছে, তার অন্তর্নিহিত কারণ ও মূল ভাবধারাটি জানবার ও বুঝবার সুযোগ আমরা খুব কমই পেয়েছি। বহুলোক তুর্কীদের প্রতি যারপর নাই অসন্তুষ্ট। কেউ কেউ আবার তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে। এমনকি কতক লোক তাদের পাশ্চাত্য প্রীতিকে নিজেদের পাশ্চাত্য পূজার জন্যে চূড়ান্ত দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্য এদের কারো কাছেই নেই। কারো কারো কাছে সামান্য তথ্য বর্তমান থাকলেও আধুনিক তুরস্কের প্রাণসত্তাকে উপলব্ধি করার জন্যে তা মোটেই যথেষ্ট নয়।

---

* প্রবন্ধটি ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মাসিক তরজমানুল কুরআন পত্রিকায়প্রথম প্রকাশিত হয়। - সম্পাদক

১. নামটির তুর্কী উচ্চারণ 'হালিদা এদিব হানুম'।

এ পরিস্থিতিতে আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আধুনিক তুরস্কের একজন বিশিষ্ট নির্মাতা এখানে এসে নিজ জাতির অভ্যন্তরীণ অবস্থা ব্যক্ত করেছেন। তিনি শুধু সাম্প্রতিক বিপ্লবের মঞ্চাভিনেত্রীই ছিলেননা; বরং তিনি ছিলেন সে বিপ্লবের এক বিশিষ্ট ক্রিয়াশীল শক্তি। সেই সঙ্গে তিনি আল্লাহর ফযলে পন্ডিতোচিত দূরদৃষ্টি, দার্শনিকসুলভ উপলব্ধি ও মনীষীতুল্য ধীশক্তির অধিকারিণী। এর ফলে তিনি বাহ্য ঘটনা প্রবাহের অন্তির্নিহিত কার্যকারণ যেমন বুঝতে পারেন, তেমনি তা বোঝাতেও পারেন। এমনি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এই প্রথমবার আমরা তুরস্ককে সঠিকভাবে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেয়েছি। আধুনিক তুরস্কের প্রাণসত্তাকে তিনি আমাদের সামনে উন্মোচিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। যে জাতি আজ মুসলিম দুনিয়ার শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্বই প্রধান করছেনা, তার মানসিক নেতৃত্ব অর্জনেও প্রয়াসী। প্রকৃতপক্ষে তার অভ্যন্তরীণ অবস্থাটা কি, কি কি উপাদান দ্বারা তা সংগঠিত হয়েছে, কোন্ কোন্ শক্তি তার ভেতর কাজ করছে, কোন্ কোন্ কার্যকরণ তাকে বর্তমান জায়গায় টেনে নিয়ে এসেছে এবং আজকে কোন্ দিকেই বা এগিয়ে চলছে – এসব কথা পরিপূর্ণ সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে তিনি আমাদের বলেছেন। এ প্রামাণ্য তথ্যাগারটি বিভিন্ন দিক থেকেই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। এর শুধু এই একটি ফায়দাই নয় যে, তুর্কী জাতির প্রকৃত অবস্থা আমাদের সামনে প্রকট হয়ে পড়েছে; বরং এর একটি বড় ফায়দা এই যে, তুরস্ক থেকে আমাদের নব্য বংশধরগণ আজকে যে পথনির্দেশ পাচ্ছে, তার মূল ভাবধারাকে আমরা অধিকতর উত্তমরূপে বুঝতে পারছি। মোটকথা, বর্তমানে মুসলিম জাহানে যে বিপ্লব সংগঠিত হতে চলছে, তার অভ্যন্তরীণ কার্যকরণকে বুঝবার আর একটি সুযোগ আমরা লাভ করেছি।

অবশ্য খালেদা খানমের মারফতে আধুনিক তুরস্ককে বুঝবার আগে খোদ তাঁকেই উত্তমরূপে বুঝে নেয়া দরকার। এটা নিসন্দেহ যে, খালেদা খানমের অন্তর পুরোপুরি মুসলমান এবং তা ঈমানী চেতনায় পরিপূর্ণ। আর সে ঈমানও যেনো তেনো রকম নয়, ঈর্ষা করার মতো। কারণ তা হচ্ছে এক মুজাহিদ নারীর ঈমান।[১]

তাঁর চিন্তাধারায় নাস্তিকতা ও অধার্মিকতার চিহ্ন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়না। ইসলামের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ রয়েছে; সে অনুরাগ একজন খাঁটি মুসলিম নারীর মতোই। কিন্তু তাঁর অন্তর যেমন মুসলমান, তাঁর মস্তিষ্ক ঠিক তেমন নয়। তিনি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষালাভ করেছেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানই শুধু অধ্যয়ন করেছেন। পাশ্চাত্য চশমা দ্বারাই দুনিয়া, ইসলাম এবং নিজ জাতিকে দেখেছেন এবং তাঁর সমস্ত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিই পাশ্চাত্য ছাঁচে গড়ে উঠেছে। অবশ্য তাঁর অন্তরের প্রচ্ছন্ন ইসলাম ও প্রাচ্যপ্রীতি পাশ্চাত্যপনার ঐ মানসিক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিপত্তিকে বহুলাংশে প্রতিরোধ করেছে। সেই প্রতিরোধের ফলেই তুর্কী জাতির অন্যান্য বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের তুলনায় তাঁর চিন্তাধারায় অনেকখানি ভারসাম্য লক্ষ্য

১. দুঃখের বিষয়, পরবর্তী অধ্যয়নের ফলে এই মতের ওপর অবিচল থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি (১৯৪৩)।

করা যায়। কিন্তু সে প্রতিরোধ তাঁকে পাশ্চাত্যপ্রীতির আধিপত্য থেকে একেবারে রক্ষা করতে পারেনি।

ইসলাম সম্পর্কে তাঁর জানাশোনা খুবই সীমিত বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের অধ্যয়নে যতোটা সময় তিনি ব্যয় করেছেন, কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নে সম্ভবত তার এক দশমাংশ সময়ও ব্যয় করেননি। এই কারণেই তাঁর ভাষণে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার যেটুকু ঝলক আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে, তাতে সদুদ্দেশ্য আছে বটে, কিন্তু গভীর বোধশক্তি ও দুরদৃষ্টি খুবই কম।

তিনি শেষ ভাষণটিতে বলেছেন, 'গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব আধুনিক ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত।' একথা কেবল এমন ব্যক্তিই বলতে পারে, যার আদৌ জানা নেই যে, ইসলাম কি জিনিস, প্রাচীন ও আধুনিকের তুলনার চাইতেও তা কতোবড় মহান ও উন্নত এবং তার পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত কিরূপ হয়ে থাকে? ইসলামী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের প্রতি যাঁর কিছুমাত্র লক্ষ্য আছে এবং যিনি সে চরিত্রের একটি ঝলক মাত্রও দেখতে পেয়েছেন, তাঁর দৃষ্টিতে গান্ধীজীর আর কি গুরুত্ব, বিশ্ব ইতিহাসের বড় বড় নায়করা পর্যন্ত মূল্যহীন। এটা কোনো জাতীয় বিদ্বেষপ্রসূত কথা নয়; বরং এ এক অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য। আবুবকর সিদ্দীক রা., উমর ফারুক রা., আলী মুরতাযা রা., হাসান ইব্‌নে আলী রা., আবু হানিফা র., আহমদ বিন্ হাম্বল র. আবদুল কাদের জিলানী র., প্রমুখের চরিত্র সামনে রাখুন। তারপর ইনসাফের সঙ্গে বলুন, নবীগণকে বাদ দিলে বিশ্ব ইতিহাসের কোন্ ব্যক্তিত্বটিকে এই চরিত্রগুলোর সামনে দাঁড় করানো যেতে পারে?

উস্‌মানীয় জাতির রাজনৈতিক সমাজ গঠনে তুর্কী জাতির প্রাচীন বংশগত বৈশিষ্ট থেকে শুরু করে গ্রীস, বাইজান্টাইন, রোম, এমনকি প্লেটোর গণতন্ত্র পর্যন্ত সবকিছুরই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু লক্ষ্যগোচর হয়না শুধু কুরআন এবং মুহাম্মদ সা.-এর শিক্ষার প্রভাব। অথচ এই বস্তুটিই মধ্য এশিয়ার বেদুঈন তুর্কীদের হাতে তাহযীব ও তমদ্দুনের আলোকবর্তিকা দিয়েছে, তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি এবং জগতজোড়া খ্যাতি লাভের মতো যোগ্যতার সৃষ্টি করেছে এবং তাদেরকে মানব জাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক শক্তির পরিবর্তে এক সুসংগঠিত শক্তিতে পরিণত করেছে। খালেদা খানম উসমানীয়দের মধ্যে বড়জোর ইসলামের সাম্য ও সুবিচারের কিছুটা প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। তারও অবস্থা হচ্ছে এই যে, সুলতান সলীম তাঁর প্রজাদের মধ্যে তরবারির জোরে ইসলাম প্রচার করতে চাইলে শায়খুল ইসলাম জামাল আফেন্দি তাঁকে একাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন এবং সলীমের মতো স্বৈরাচারী শাসকও সে নির্দেশের সামনে মাথা নতো করে দেন। কিন্তু এই বিরাট ঘটনার মধ্যে ইসলামী সুবিচারের পরিবর্তে 'উসমানী জাতিত্বে'র অনুভূতি এবং 'উসমানী রাজ্যশাসন নীতির' সংরক্ষণের প্রেরণাই খালেদা খানমের লক্ষ্যগোচর হয়। তাঁর বোধগম্য নয় যে, জামাল আফেন্দীর ফতোয়ার মধ্যে ছিলো لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ-এর ভাবধারা নিহিত।

ইসলামী সত্যানুরাগের শক্তিই তাঁকে সলীমের সামনে ফতোয়া জারির সাহস যুগিয়েছিল। আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বই সলীমকে তাঁর ফতোয়ার সামনে মাথা নতো করতে বাধ্য করেছিল।

তুরস্কের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর প্রান্তিকধর্মিকতা, যুলুম-পীড়ন, জবরদস্তিমূলক সমাজ-সংগঠন, সীমাহীন পাশ্চাত্য প্রীতি, বস্তুতান্ত্রিক মনোবৃত্তি এবং ধর্ম সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি খালেদা খানমকে অসন্তুষ্ট বলে মনে হয়। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতিনীতির মধ্যে একটা সুষম সমন্বয় কামনা করেন। 'বস্তুবাদ' ও 'আধ্যাত্মবাদের' মধ্যে তিনি একটা সঙ্গতি বিধানের পক্ষপাতি। তিনি এ সত্যও স্বীকার করেন যে, জীবনের এই দু'টি মতবাদের মধ্যে ইসলাম যে সমন্বয় সাধন করেছে তাই সর্বোত্তম। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে তিনি নিজে পূর্ণ দূরদৃষ্টির অধিকারী নন। এই কারণেই ইসলামী নীতি অনুসারে সমন্বয়ের সঠিক উপায় কি এবং দুই চরম প্রান্তের মধ্যে ভারসাম্যের সরল রেখা কোন্‌টি এটা তাঁর জানা নেই। তবু তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত বাদ দিলে তাঁর ভাষণে আমরা আধুনিক তুরস্কের মানসিকতা, তার ভাবধারা এবং সাম্প্রতিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক কার্যকারণের একটি স্পষ্ট ও নির্ভুল বর্ণনা পেতে পারি; আর এটাই হচ্ছে আমাদের কাম্য।

তুর্কী জাতি[১] যখন ইসলামে প্রবেশ করে, মুসলমানদের নৈতিক ও মানসিক অধপতন তখন শুরু হয়েছিল। তাদের মধ্যে জিহাদী ভাবধারা বেঁচেছিল বটে, কিন্তু ইজতিহাদী ভাবধারা মরে গিয়েছিল। ইসলাম সম্পর্কে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তানায়ক ও ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ফকীহগণ (আইনবেত্তা) তখন তিরোহিত হয়েছিলেন। ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতা অর্ধমৃত এবং ইসলামী চিন্তাধারা প্রায় নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছিল। 'শরয়ী' বিধানের ক্ষেত্রে অন্ধ তাকলীদের প্রতিপত্তি ছিলো। সমাজ ও সভ্যতায় অনারব ও রোমদের রীতিনীতি অনুপ্রবেশ করেছিল। তাসাউফের ওপর প্রাচ্যবাদ এবং দর্শনের ওপর নিউ প্ল্যাটোবাদের প্রভাব বদ্ধমূল হয়েছিল। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি জ্ঞানার্জন করার মতো উপযুক্ত লোকের অভাব দেখা দিয়েছিল। আলিম সমাজের বেশির ভাগই শব্দের মারপ্যাঁচে জড়িত কালামের জটিল তর্কে লিপ্ত হচ্ছিলেন এবং পূর্বসুরীদেরই অনুসৃত পথে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ঝড়ো হাওয়া বইয়ে দিচ্ছিলেন। শাসকদের অধিকাংশই কাইজার ও কিসরার অন্ধ অনুকরণে ব্যস্ত ছিলেন। সূফী সম্প্রদায় ও আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ ইসলামের সোনালী যুগের সত্যিকার সূফীবাদ পরিহার করে সন্নাসী ও যোগীদের অনুসরণ করে চলছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় মুসলমানদের উন্নতির ধারা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। চিন্তা গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি প্রায় নিশেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলকথা, উত্থানের পর অধ:পতনের স্পষ্ট লক্ষণাদি তখন গোটা মুসলিম জাহানেই দেখা দিয়েছিল।

এভাবে ইসলামের ইতিহাসে তুর্কীদের আবির্ভাবই ছিলো মৌলিক দুর্বলতা নিয়ে। আর ইউরোপে যে যুগে মানসিক ক্রমবিকাশ ও বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রার সূচনা

---

১. তুর্কী জাতি বলতে এখানে উসমানীয় তুরস্ককে বুঝানো হচ্ছে।

হচ্ছিল, প্রায় সেই সময়েই উসমানীয় সাম্রাজের গোড়াপত্তন হয়। অবশ্য প্রথম দিকের দু'আড়াই শতকে ইউরোপকে উপর্যুপরি পরাভূত করে উসমানীয়গণ ইসলামের বিজয়কেতন উড্ডীন করেছিল। কিন্তু সে যুগে সাধারণ মুসলিম জাতিগুলোর সঙ্গে তুর্কীরাও ধীরে ধীরে অধপতনের দিকে নেমে যাচ্ছিল এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পাশ্চাত্য জাতিগুলো দ্রুততার সাথে বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছিল। ঈসায়ী সতের শতকে পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্নরূপ ধারণ করলো। ফিরিঙ্গীদের সামরিক সংগঠন এবং বৈষয়িক ও মানবিক শক্তি এতোখানি বেড়ে গেলো যে, সেন্ট গোথার্ডের যুদ্ধে প্রথমবার তারা পতনশীল তুর্কীদেরকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করলো। কিন্তু তাতেও তুর্কীদের চক্ষু উম্মীলিত হলোনা। তারা ক্রমাগত অধপতনের দিকেই যেতে লাগলো এবং ফিরিঙ্গীরা সেই অনুপাতে উন্নতির শীর্ষদেশে আরোহণ করতে লাগলো। এমনকি আঠারো শতকে তুর্কীদের নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও তামাদ্দুনিক অবস্থা চরম অতপতনে গিয়ে পৌঁছলো। এবং ফিরিঙ্গীদের আধিপাত্য পুরোপুরি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে সুলতান সলীম তুর্কী জাতির এই সার্বিক দুর্বলতা অনুভব করলেন। তিনি শাসন ব্যবস্থার সংস্কার, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার, নব্য পদ্ধতিতে সামরিক সংগঠন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য যুদ্ধাস্ত্রের প্রচলন শুরু করলেন। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা ও তার ভারধারা সম্পর্কে অজ্ঞ ও মুর্খ সূফী সম্প্রদায় এবং সংকীর্ণমনা আলিম সমাজ ধর্মের নামে এই সংস্কার কার্যের বিরোধিতা করলেন। ইউরোপীয় পন্থায় সামরিক সংগঠনকে তারা ধর্মদ্রোহীতা বলে আখ্যা দিলেন। আধুনিক ফৌজী পোশাককে তারা নাসারাদের অনুকরণ বলে অভিহিত করলেন। সঙ্গীণ ব্যবহার করা তাদের মতে গুনাহর কাজ। পরন্তু সলীমের বিরুদ্ধে এই বলে বিদ্বেষ ছড়ানো হলো যে, কাফিরদের নীতি প্রবর্তন করে সে ইসলামকে বিকৃত করে ফেলছে।

শায়খুল ইসলাম আতাউল্লাহ আফেন্দী ফতোয়া দিলেন, যে বাদশাহ কুরআনের বিরুদ্ধে কাজ করে, সে বাদশাহীরই উপযুক্ত নয়। অবশেষে ঈসায়ী ১৭০৭ সালে সলীমকে পদচ্যুত করা হলো। এই প্রথমবার ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের অজ্ঞতা ও অন্ধত্বের দ্বারা ইসলামকে প্রগতির অন্তরায় বলে ধারণার সৃষ্টি করলেন।

যুগের পরিস্থিতি দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হচ্ছিলো অন্যান্য মুসলমানদের তুলনায় তুর্কীদের ওপর এই পরিবর্তনের প্রভাব অত্যন্ত তীব্রভাবে পড়ছিল। তারা ছিলো ইউরোপের একেবারে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এবং সেই সঙ্গে ছিলো পরস্পর যুদ্ধমান। পাশ্চাত্য জাতিগুলোর সঙ্গেই ছিলো তাদের গভীর রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এমনকি, তাদের অধীনস্থ ইউরোপীয় জাতিগুলো পর্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রহণ করছিলো। কিন্তু ইসলামী জ্ঞানে বুৎপত্তি ও ইজতিহাদী শক্তি থেকে মুক্ত এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তুর্কী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ঐ পরিবর্তন সম্পর্কে ছিলেন একেবারেই

উদাসীন। ফলে তুর্কী জাতিকে তাঁরা সাত'শ বছরের পূর্বেকার পরিস্থিতি থেকে এক পা-ও সামনে না এগুতে বাধ্য করলেন।

সলীমের পর সুলতান মাহমুদ সংস্কার কার্যের চেষ্টা করলেন। আলিম সম্প্রদায় ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ আবার তাঁর বিরোধিতা করলেন। অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রমের পর ১৮২৬ সালে মাহমুদ আধুনিক সামরিক সংগঠনের নীতি চালু করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু আলিম সমাজ ও সূফী সম্প্রদায় অবিরাম এই প্রচার চালাতে লাগলেন যে, এই ধরনের সংস্কার কার্য বিদয়াতের শামিল, এর দ্বারা ইসলামকে বিকৃত করা হচ্ছে; সুলতান বে-দ্বীন হয়ে গিয়েছেন এবং আধুনিক কায়দার সেনাবাহিনীতে ভর্তি হলে মুসলমানদের ঈমান নষ্ট হতে বাধ্য।

এ যুগেই তুরস্কের চিন্তাশীল লোকদের মধ্যে নিজেদের জাতীয় অধপতন সম্পর্কে সাধারণ অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তারা পাশ্চাত্য জাতিগুলোর উন্নতির কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলো, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আচার-পদ্ধতি অধ্যয়ন করলো, তাদের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টিক্ষেপ করলো; সেই সঙ্গে আপন রাজ্যের আইন কানুন, প্রশাসনিক বিষয়াদি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামরিক ব্যবস্থায় এমন সংস্কার নীতি পরিবর্তনের চেষ্টা করলো, যাতে করে তারা পাশ্চাত্য জাতিগুলোর সঙ্গে সমান তালে উন্নতি করতে পারে। খালেদা খানমের ভাষায়, এই লোকগুলোর শিরা-উপশিরায় ছিলো ইসলামী ভাবধারার প্রাণ-প্রবাহ। তাদের মন ও মগজ দুই-ই ছিলো মুসলমান। তাঁদের মধ্যে আপন দুর্বলতার অনুভূতি অবশ্য ছিলো; কিন্তু পাশ্চাত্যের মোকাবিলায় মোটেই হীনমন্যতাবোধ ছিলোনা। তাঁরা পাশ্চাত্যের প্রতি সম্মোহিত ছিলোনা। নির্বিচারে তার প্রত্যেকটি জিনিসই গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলোনা; বরং পাশ্চাত্যের ভালো জিনিসগুলো দ্বারা আপন রাজ্য এবং জাতির দুর্বলতার নিরসন করা এবং জীবনের সর্বত্র ইউরোপীয়দের সাথে সমান তালে প্রতিযোগিতা করাই ছিলো তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তারা সুলতান আবদুল মজীদ খানের আমলে শাসন ব্যবস্থার সংস্কার ও সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন করলো। আপন জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতায় প্রাণের স্পন্দন ফুঁকে দিলো। নতুন নতুন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করলো। এভাবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তারা এমন একটি নয়া জাতি গড়ে তুললো, যার ভেতর ইসলামী সভ্যতার তামাম মণিমুক্তা সমেত চিন্তা গবেষণা করার মতো উন্নত প্রতিভাও বর্তমান ছিলো। সুলতান আবদুল আজীজের পদচ্যুতি (১৮৭৬) পর্যন্ত এই দলটি ভেতর ও বাইরের অসংখ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ উত্তমরূপে সম্পাদন করলো। এর ফলেই উমর পাশার ন্যায় জেনারেল, মুদহাত পাশার ন্যায় সংগঠক এবং নামিক কামাল ও আবদুল হক হামিদের মতো সাচ্চা মুসলিম চিন্তানায়ক ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব হলো।

কিন্তু সুলতান আবদুল হামীদ এসে হঠাৎ গোটা গতিপথই বদলে দিলেন। ১৮৭৬ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত মোট ৩৩ বছর ছিলো তাঁর শাসনকাল। এই সময়ের মধ্যে অন্য একটি প্রাচ্য জাতি (জাপান) উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে কোথা থেকে

কোথায় গিয়ে পৌছলো! আর এই স্বার্থপর সুলতান শুধু নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতার মোহে তুর্কী জাতির মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, তামাদ্দুনিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নতির পথ রোধ করা এবং তার প্রাণচেতনাকে নিস্তেজ করার কাজেই সময় ব্যয় করলেন। এই ব্যক্তির কীর্তিকলাপ সম্পর্কে কোনো বিস্তৃত সমালোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে তার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, গঠনমূলক কার্যের সর্বোত্তম সময়টিকে – যার প্রতিটি ঘন্টাই ছিলো অতি মূল্যবান – তিনি ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যয় করেন। তুর্কী জাতির শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাগুলোকে তিনি বরবাদ করে দেন। এমনকি জামালউদ্দীন আফগানীর মতো অতুলনীয় ব্যক্তিত্বকেও তিনি নষ্ট করে ফেলেন। কিন্তু তার বদৌলতে শুধু তুর্কী জাতির নয়; বরং গোটা মুসলিম জাহানের যে সবচাইতে বড় ক্ষতিটি হয়েছে, তাহলো এই যে, খিলাফতের ধর্মীয় শক্তি এবং প্রতিক্রিয়াশীল আলিম ও ধর্মনেতাদের প্রভাবকে তিনি সংগঠন যুগের তুর্কী সংস্কারকদের গড়া ভিত্তিগুলোর এবং তাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারগুলোর মূলোচ্ছেদের জন্যে ব্যবহার করেন। তাঁর এই স্বার্থপরতামূলক ও অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন কাজের ফলে তুর্কী নওজোয়ানদের মধ্যে এক বিপ্লবাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। এর ফলে তারা সোজা ধর্মকেই প্রগতির অন্তরায় বলে ভাবতে লাগলো। তাদের মন মগজ ইসলামী শিক্ষার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। প্রতিক্রিয়াশীল আলিম ও ধর্মনেতাদের প্রতি স্বাভাবিকভাবে তাদের মনে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছিলো, বিপ্লববাদের আতিশয্যে তার গতিধারা ধর্মের দিকে ঘুরে গেলো। তারা ভাবলো এবং মূর্খ আলিম ও ধর্মনেতারা তাদের ভাবতে বাধ্য করলো যে, ইসলাম একটি অচল ও গতিহীন ধর্ম। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার কোনো ক্ষমতা তার নেই। তার আইন কানুন, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেনা। মাত্র কতিপয় আকীদা বিশ্বাস ছাড়া তার ভেতরে আর কোনো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী জিনিস নেই। এই ৩৩ বছরে জুলুমপীড়ন – দুর্ভাগ্যবশত যা ধর্মীয় রং ধারণ করেছিলো – তুর্কীদের নব্য বংশধরগণের মধ্যে নাস্তিকতা, বস্তুতান্ত্রিকতা, পাশ্চাত্যের প্রতি সম্মোহন, পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার অন্ধ তক্‌লিদ, নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্বেষ, প্রতিটি পুরনো জিনিসের প্রতি বিদ্রোহ এবং খিলাফত ও ইসলামী ঐক্যের প্রতি সুলতান আবদুল হামিদ যাকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার বানিয়েছিলেন – তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করে দিলো। সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে এ ধারণাও দৃঢ়মূল করে দেয়া হলো যে, দুনিয়ার উন্নতি ও সমৃদ্ধিলাভ করতে হলে অতীতের সকল ভিত্তিকে ধ্বসিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য কায়দায় তুর্কবাদের প্রাসাদ গড়ে তোলা আবশ্যক।

১৯০৮ সালের বিপ্লব সুলতান আব্দুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করলো। এর ফলে বিদ্রোহী মানসিকতাসম্পন্ন অত্যুৎসাহী ও উত্তেজনাপ্রবণ নওজোয়ানদের হাতে রাজ্যের একচ্ছত্র ক্ষমতা চলে গেলো। খালেদা খানমের ভাষায়, সংগঠন যুগের সংস্কারপন্থীদের চাইতে এ লোকগুলো ছিলো ভিন্ন ধরণের। এদের মধ্যকার একটি লোকও শিক্ষাগত যোগ্যতা, চিন্তা গবেষণা ও মার্জিত বুদ্ধিতে সংগঠন যুগের চিন্তানায়কদের সমকক্ষ ছিলোনা। এদের সামনে না সেই মহান লক্ষ্য বর্তমান

ছিলো, আর না ছিলো তাদের চরিত্রে তেমনি দৃঢ়তা। ভদ্রতা, সৌজন্য ও শিক্ষা দীক্ষায় তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো তুলনাই ছিলোনা। এদের মধ্যে না সেই প্রখর জাতীয়তাবোধ ছিলো, না ছিলো প্রাচীন ও আধুনিকের সঠিক পার্থক্য বুঝার মতো বিচার ক্ষমতা। এই মুষ্টিমেয় যুব সম্প্রদায়টি ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অজ্ঞ এবং ইসলামী শিক্ষা দীক্ষায় অপরিপক্ক ছিলো। অবশ্য পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানেও এদের প্রগাঢ় দৃষ্টি ছিলোনা। আপন ধর্ম, সভ্যতা, জ্ঞান বিজ্ঞান, রীতি নীতি এবং প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে তাদের মন মগজে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিলো। পাশ্চাত্যের উন্নতি ও অগ্রগতির ফলে তাদের মধ্যে পুরোমাত্রায় সম্মোহনের সৃষ্টি হয়েছিলো। নিজেদের প্রতিটি জিনিসকেই বদলে ফেলার জন্যে এরা অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়েছিলো। তাদের হাতে যখন রাষ্ট্রক্ষমতা এসে পড়লো, তখন দীর্ঘ ৩৩ বছরের বদ্ধ ও দূষিত পানি যেনো বন্যার বেগে ফেটে বেরুল। এই যুগেই তুর্কীদের উপর স্বাদেশিকতা ও তুরাণী[১] জাত্যাভিমানের দৈত্য সওয়ার হয়ে বসলো। ইসলামী ঐক্যের প্রতি নিস্পৃহতা প্রদর্শন শুরু হলো। ধর্মের সমালোচনার কাজ পুরোদস্তুর শুরু হয়ে গেলো । ইসলামপূর্ব প্রাচীন সভ্যতাকে পুরোপুরি গ্রহণ করার জন্যে বিপুল শক্তি নিয়োজিত হতে লাগলো। অতীতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে পাশ্চাত্যের সাথে নৈকট্য স্থাপনের জন্যে লাতিন বর্ণমালা গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপিত হলো। আধুনিক মতাদর্শের ছাঁচে ইসলামকে ঢালাই করার জন্যে সরকারি আলিমদের একটি দল এগিয়ে এলো। যিয়াকোক আল্প ছিলেন এই দলটির পুরোধা। এই লোকটি ইসলামী ঐক্যের মোকাবিলায় তুরাণী ঐক্যের জন্যে তীব্র প্রচার চালালেন। ইসলামী যুগের ইতিহাস ও তার প্রখ্যাত বীর সন্তানদের সম্পর্কে তুর্কীদের মনে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা জাগিয়ে প্রাচীন অসভ্য তাতারীদের জন্যে গর্ববোধ করতে শেখালেন। (যার মধ্যে চেঙ্গিজ ও হালাকুর ব্যক্তিত্ব সবচাইতে বেশি উল্লেখযোগ্য)। তুর্কী ভাষাকে ইসলামী সাহিত্যের প্রভাব মুক্ত করার চেষ্টা করলেন। তুর্কীদের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং বাস্তব জীবনের সমস্ত আচরণে পাশ্চাত্যের পুরোপুরি অনুকরণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেন। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তি আধুনিক বিপ্লবী দলের অগ্রনায়ক হয়ে এলেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে মিলে ইসলামী শিক্ষার এমনি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন, যাতে করে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বিশ্বাস ও নৈতিক বিধান ছাড়া ইসলামের প্রতিটি জিনিসকেই পরিবর্তনশীল মনে করে পাশ্চাত্যের ছাঁচে ঢালাই করা যেতে পারে।

একদিকে তুর্কী জাতির মধ্যে এতোবড় বিপ্লবের সূচনা হচ্ছিল অন্যদিকে তুর্কী আলিম সমাজ ও ধর্ম নেতাগণ তখনো সপ্ত সতকের পরিবেশ থেকে বাইরে বেরুতে প্রস্তুত ছিলেননা, তাঁদের অথর্বতা, কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং

---

১. তুরাণী কথাটি এসেছে 'তুরা' বা 'তুরাণ' নামক জায়গা থেকে। এটি মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত তুর্কীদের আদি বাসভূমি। সম্ভবত মঙ্গল অভিযানকালে এখানকার 'তুক' উপজাতিদের একটি শাখা বর্তমান তুরস্কে গিয়ে বসবাস শুরু করে এবং সেখান থেকেই 'উসমানীয়' তুর্কী বা আধুনিক তুরস্কের অভ্যুদয় ঘটে।

যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার চরম অসম্মতি সুলতান সলীমের আমলের মতোই অব্যাহত ছিলো। তাঁরা তখনো বলছিলেন যে, হিজরী চার শতকের পর ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ তাঁদের সামনেই ধর্মদ্রোহিতার দরজা উন্মুক্ত হচ্ছিলো। তাঁরা তখনও দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের এমনসব কিতাবাদি পাঠন পাঠনে লিপ্ত ছিলেন, যেগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করে যুগের গতি পাঁচশো বছর এগিয়ে গিয়েছিলো। তারা তখনো নিজেদের ওয়ায নসিহতে কুরআনের সেই পুরনো ধরনের তফসীর এবং সেইসব দুর্বল হাদীস শোনাচ্ছিলেন, যা শুনে একশো বছরের আগেকার লোকেরা হায় আফসোস করতো বটে, কিন্তু সমকালীন মস্তিষ্কবান লোকেরা তা শুনে কেবল ঐ মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসদের প্রতিই নয়, বরং খোদ কুরআন ও হাদসের প্রতিও বিতৃষ্ণ হয়ে উঠতো। তারা তখনো তুর্কী জাতির মধ্যে 'শামী' ও 'কানজুদ-দাকায়েক'-এ লিখিত বিধিব্যস্থা প্রবর্তন করার জন্যেই জিদ্ করছিলেন – সে জিদের ফলে তুর্কীরা কুরআন ও সুন্নাহর নির্ধারিত বিধানের আনুগত্য বর্জন করলেও তাঁরা তাঁদের মত পরিবর্তনে প্রস্তুত ছিলেননা।

ফলকথা, আলিম সমাজ ও ধর্মনেতাগণ এমন ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করছিলেন, যা তুর্কী জাতিকে মাত্র এক'শ বছরের মধ্যে সাংগঠনিকতার পর্যায় থেকে বিচ্যুত করে বিপ্লববাদের এই স্তরে নিয়ে এসেছিলো। অন্যদিকে তুর্কী জাতির বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ মনে-প্রাণে মুসলমান হলেও চিন্তা, বুদ্ধি ও কর্মের বাস্তব জগতে ইসলাম থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলেন। ঠিক এই সময়েই প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। এতে আরব ও ভারতের হতভাগ্য মুসলমানেরা ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে মিলে তুর্কীদের গলা কাটলো। অতপর মহাযুদ্ধের অবসানের পর তুর্কীরা যখন আপন জাতীয় জীবনকে চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সংগ্রামে লিপ্ত হলো, তখন তাদের সবচাইতে বেশি বিরোধিতা করলেন তৎকালীন খলীফা ও শায়খুল ইসলাম। বিপ্লবী ও তুর্কীদের অর্ধমৃত ইসলামী চেতনার পক্ষে এই সর্বশেষ আঘাতগুলো ছিলো ধ্বংসাত্মক। এরই অনিবার্য ফল আমরা নব্য তুরস্কের মাত্রাহীন আধুনিকতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। ১৯০৮ সালে যে বিপ্লবী চিন্তাধারা অপরিপক্ক ছিলো এবং ত্রিপোলির যুদ্ধ, বলকান যুদ্ধ ও গ্রীক হামলার ব্যস্ততা যাকে পরিপক্ক হতে বাধা দিয়েছিলো, লোজান[১] সম্মেলনের পর হঠাৎ তা পরিপক্কতা লাভ করলো এবং একেবারে বাস্তব রূপ ধারণ করতে লাগলো। এভাবে সমাজ ও সভ্যতায় পুরোপুরি পাশ্চাত্য নীতির রূপায়ণ; ভাষা সাহিত্য ও রাজনীতিতে পূর্ণমাত্রায় জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন; খিলাফতের পতনের পর ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি খালেদা খানমের ভাষায় রাষ্ট্রকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত করে ধর্মকেই রাষ্ট্রের অনুগত করে দিলো। ইসলামী আইনের পরিবর্তে সুইজারল্যান্ডের আইন প্রবর্তন করা; মীরাস, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি প্রশ্নে

---

১. এটি সুইজারল্যান্ডের একটি শহর। ১৯২৩ সালে এখানে ইংরেজ ও তুর্কীদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের পরই তুরস্ক পুরোপুরি ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের কবলে নিক্ষিপ্ত হয়।

কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশাবলী পর্যন্ত বদলে ফেলা; মহিলাদেরকে ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে ইউরোপীয় মহিলাদের অনুরূপ বল্গাহীন স্বাধীনতার পথে ছেড়ে দেয়া ইত্যাদি সবকিছুই হচ্ছে মূর্খ আলিমদের অথর্বতা, আত্ম পূজারী সূফীদের ভ্রান্তি, খিলাফতের পদমর্যাদা থেকে অবৈধ সুযোগ গ্রহণকারী সুলতানদের স্বার্থপরতা এবং কুরআন ও সুন্নাহের জ্ঞান সম্পর্কে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের নিদারুণ অজ্ঞতারই স্বাভাবিক পরিণতি। পরিতাপের বিষয় যে, এই শতকের মধ্যে তুর্কী জাতি কুরআন ও হাদীসের গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী এবং ইসলামী শিক্ষার মৌল ভাবধারা উপলব্ধি করতে সক্ষম, এমন একটি প্রতিভাও জন্ম দিতে পারেনি – যিনি যুগের পরিবর্তনশীল অবস্থা তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে ইজতিহাদী শক্তি ব্যবহার করতে এবং সে অবস্থার ওপর ইসলামী নীতি প্রয়োগ করে, কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তিশীল এবং যুগের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী একটি সুসামঞ্জস্য জীবনধারা গড়ে তুলতে পারতেন।

তুর্কী ইতিহাসের এই গতিধারা সম্পর্কে যারা অবহিত নয়, তারা এক আজব ধরনের ভ্রান্তিতে লিপ্ত হচ্ছে। পুরনো ধর্মীয় দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা নব্য তুর্কীদের সম্পর্কে কুফরী ও ফাসিকীর ফতোয়া প্রচার করে চলেছেন। কিন্তু ঐ নব্য তুর্কীদের চাইতে তুর্কী আলিম ও ধর্মনেতারাই যে বেশি গুনাহগার, এ খবরটি তাদের জানা নেই। যে মুজাহিদ কওমটি দীর্ঘ পাঁচ'শ বছর ধরে ইসলমের জন্যে এককভাবে লড়াই করছিলো, এইসব আলিম ও ধর্মনেতাদের অথর্বতাই তাদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিঙ্গীপনার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই ধরনের অথর্বতা অন্যান্য মুসলমান কওমকেও একদিন ঐদিকে ঠেলে দিলে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকবেনা।

অন্যদিকে প্রগতিবাদীরা আঙ্কারা থেকে অবতীর্ণ প্রত্যেকটি 'ওহী'-কেই মুসলমানদের সামনে এমনিভাবে পেশ করছে, যেনো কুরআন রহিত হয়ে গিয়েছে, মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাত খতম হয়ে গিয়েছে। এখন হেদায়েত থাকলে আছে শুধু আতাতুর্কের জীবনাদর্শে, জ্ঞানের রশ্মি থাকলে আছে আঙ্কারার আসমান থেকে অবতীর্ণ 'ওহী'র মধ্যে। অথচ বেচারা আতাতুর্ক এবং তাঁর অনুগামীদের অবস্থা হচ্ছে এই যে ঃ

وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ .

(অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা তো কেবল অনুমানের পিছেই ছুটে চলেছে। - সূরা যুখরুফ : ২০)

❖ ❖ ❖

৮

যুক্তিবাদের প্রতারণা*

এক

ইসলামী শিক্ষা দীক্ষায় অপরিণত কিংবা একেবারে আনাড়ী নওজোয়ানদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ওপর পাশ্চাত্য শিক্ষা, কৃষ্টি ও সভ্যতা কিরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করে, তা এই শ্রেণীর লোকদের প্রকাশিত রচনা ও বক্তৃতা থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের জনৈক মুসলিম গ্রাজুয়েটের একটি প্রবন্ধ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি নিজের চীন ও জাপান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

> আমাদের চীনা সহগামীরা বেজায় পেটুক এবং মদখোর। শুকরের মাংস তো তাদের প্রাণতুল্য। এবার আমি খ্রীষ্টধর্মের উন্নতির রহস্যটি বুঝতে পেরেছি। চীনারা তাদের প্রাচীন ধর্মের আনুগত্যকে আধুনিক শিক্ষার পরিপন্থি মনে করে। তারা যদি বুঝতে পারতো তো তাদের ইসলাম গ্রহণে অসুবিধা হতোনা । কিন্তু ইসলাম তাদের সমস্ত প্রিয় খাদ্য থেকেই বঞ্চিত করে; তাই বাধ্য হয়ে তারা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে খ্রীষ্টধর্ম চীনের সরকারি ধর্মে পরিণত হলে তাতে বিস্ময়ের কিছুই থাকবেনা। শুকরের মাংসের ব্যাপারে আমি ইউরোপ ও চীনের নওমুসলিমদের একটু সুবিধা দেবার পক্ষপাতী। কুরআন থেকেও এর স্পষ্ট হারাম হবার ব্যাপারে আমার সন্দেহ রয়েছে। বড়জোর আরবদের জন্যে হয়তো কোনো বিশেষ কারণে এটি হারাম করা হয়েছে। কিন্তু যে দেশে এছাড়া 'ফামানিদ তুর্রা গাইরা বাগিওঁ ওয়ালা আদিন' (অর্থাৎ চলা অসম্ভব) হয়ে পড়ে, সেখানে এর ব্যবহারে ক্ষতিটা কি। মোটকথা, কুরআনের এই একটিমাত্র বিধানের তাৎপর্য, অর্থাৎ এর সাধারণ নিষেধাজ্ঞার কারণটি আমার বোধগম্য হয়নি। নচেৎ নীতিগতভাবে পাকস্থলী ও নৈতিক চেতনার মধ্যে এতোখানি ব্যবধান থাকতেও ধর্ম যদি আমাদের জন্যে খাদ্যতালিকা তৈরি করতে পারে, তবে সে লৌহকর্ম, অলঙ্কার গড়ন, দর্জীগিরী ইত্যাদি কেন শিক্ষা দেবেনা? আমার মতে, দুনিয়ায় ইসলামের উন্নতি ও বিস্তৃতি না হবার গূঢ় কারণ এই যে, সে মানুষের তামাম মানবিক অধিকার হরণ করে তাকে একটি নির্জীব জড়পিন্ড এবং নিতান্ত অবোধ শিশুতে পরিণত করে। যার ফলে সে নিজের পার্থিব উন্নতির পথই হারিয়ে ফেলে। নচেৎ খ্রীষ্টানরা যেমন বুঝতে পেরেছে, আমাদেরও ধর্ম ঠিক তেমনি হওয়া উচিত।

---

* প্রবন্ধটি ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বরে মাসিক তরজমানুল কুরআনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এরপর তিনি সাংহাইয়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখছেন ঃ

> খোদার সৃষ্ট এই বেশুমার সুখী–সমৃদ্ধ মানুষগুলোকে দেখে আমার মন কিছুতেই সায় দেয়না যে, মাত্র কয়েক বছর পরই এরা দোযখের ইন্ধনে পরিণত হবে – যেনো এদের সৃষ্টির পেছনে খোদার এই একটিমাত্র উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে। তাছাড়া এদের জনকয়েক ছাড়া বাদবাকি সবাই যদি কাফির ও মূর্তিপূজক হয়, তবে তাদের দোযখে নিক্ষেপের জন্য এটাই কি অপরাধ বলে গণ্য হবে যে, তারা খোদার দুনিয়াকে সমৃদ্ধ ও সুশোভিত করেছে? তারা তো হাজীদেরকে হত্যা বা রাহাজানি করেনা! লূত কওমের দুষ্কৃতিও তাদের মধ্যে নেই। কারো ধন মাল তারা আত্মসাৎ করেনা এবং তা 'হালাল' করার জন্যে কোনো যুক্তি তর্কেরও অবতারণা করেনা। তারা নির্বিবাদে ও সুশৃংখলভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা দোযখের উপযুক্ত বলে গণ্য হবে কেন? মুশরিকী ধারণা নিসন্দেহে একটি বাজে ও অন্তসারশূন্য জিনিস। কিন্তু আমায় বলুন, এক ব্যক্তি যদি কোনো সত্তাকে স্বভাবতই তার জীবন মৃত্যুর মালিক বলে মনে করে, কিন্তু তার নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে সে আমাদের মতোই অক্ষম কিংবা সে আরবীকে খোদার ভাষা বলে বিশ্বাস করেনা – কেবল এইটুকু কারণেই আপনারা তার দুশমন এবং সে আপনাদের দুশমন হয়ে যাবে? কিন্তু না, আপনাদের দৃষ্টিতে এতো কিছুরও প্রয়োজন নেই। আপনাদের শুধু প্রয়োজন হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের পায়জামা এবং বিশেষ কাটিং-এর জামা পরিধান করতে হবে। বিশেষ ধরনের খাদ্য খেতে হবে। মুখের ওপর চার আঙ্গুল পরিমাণ দাড়ি রাখতে হবে। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা যাবেনা; কারণ সেখানে ধর্মীয় ভাষা ও শাস্ত্র শিক্ষা দেয়া হয়না।

জাপানের কোবে বন্দর সম্পর্কে তিনি লিখছেন ঃ

> দু'ঘন্টাকাল আমি কোবে বন্দর ঘুরে দেখছিলাম। কোথাও একটি ভিক্ষুক আমি দেখতে পাইনি – জীর্ণ-ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত কোনো দরিদ্রও আমার চোখে পড়েনি। যে জাতি ধর্ম বা খোদার নাম পর্যন্ত জানেনা, তারা এতোখানি উন্নত!

এরপর তিনি নিজেই 'সদুপদেশ' ঝাড়তে শুরু করলেন ঃ

> স্মরণ রাখবেন, 'ইহ্‌সান'ই হচ্ছে ধর্মের মূল জিনিস। কিন্তু এটি কোনো ভাষা বা শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী নয়। এর স্বাভাবিক লক্ষ্য হচ্ছে, আমাদেরকে পরকালীন জীবনে কি ইহজীবনে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে দায়িত্বশীল করে তোলা। এটিই হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম। এর বেশি যে জিনিসটির নাম আপনারা ধর্ম রেখেছেন, তা শুধু আপনাদের আত্মপ্রবঞ্চনা কিংবা মস্তিষ্কবিকৃতি মাত্র। যেদিন আপনারা উল্লেখিত দু'টি জিনিসের মধ্যে ধর্মকে সীমাবদ্ধ রাখবেন এবং শরীয়তের যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করে ফেলবেন, সেদিন

> আপনারাও অন্যান্য জাতির সঙ্গে উন্নতির শীর্ষদেশে পৌছতে পারবেন; বরং একথা বলুন যে, সেদিন আপনারা জাতিসমূহের মধ্যে বিবেক বুদ্ধি জাগিয়ে তুলবেন। কারো হাত থেকে যদি দুনিয়ার কতৃর্ত্ব না যায় তো 'আসমানী বাদশাহী'ও যাবেনা। আপনারা নিজেরা কোনো জাতি নয়, বরং অন্যান্য জাতির সংস্কারক। কিন্তু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একথা বলবার সুযোগ দেবেননা যে, অমুক জাতি উন্নতির শীর্ষদেশে আরোহণ করেছে; কিন্তু তাদের মধ্যকার মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এটা নিসন্দেহ যে, তাদের এই শোচনীয় অবস্থার জন্যে দায়ী হচ্ছে তাদের অদ্ভুত প্রকৃতির ধর্ম।

এই উদ্ধৃতিটুকু আমাদের নব্য শিক্ষিত তরুণ সমাজের সাধারণ মানসিক অবস্থার একটি স্পষ্ট নমুনা। তারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, মুসলিম সমাজের অঙ্গ হিসেবেই লালিত পালিত হয়েছে, মুসলমানদের সাথে সমাজ ও সভ্যতার বন্ধনে তারা আবদ্ধ। এই কারণেই ইসলামের প্রতি অনুরক্তি, মুসলমানদের প্রতি সহানুভুতি এবং মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকবার আকাঙ্খা তাদের সহজাত। এই আকাঙ্খা তাদের ইচ্ছাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির প্রভাব ছাড়াই তাদের মনমগজে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই অনিচ্ছাকৃত ও চেতনাহীন ইসলামকে শিক্ষা দীক্ষার সাহায্যে ইচ্ছাকৃত ও চেনতালব্ধ ইসলামে পরিণত করা, মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়ার পূর্বে ইসলামী শিক্ষাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করা এবং বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধি ব্যবস্থা ও আইন কানুন অনুশীলন করে দেখার মতো যোগ্যতা সৃষ্টি করা একান্ত উচিত ছিলো। কিন্তু তার পূর্বেই তাদেরকে ইংরেজী শিক্ষার জন্যে স্কুল কলেজে প্রেরণ করা হলো। সেখানে সম্পূর্ণ অনৈসলামী শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে তাদের মন মানস ও চিন্তা শক্তি বিকাশ লাভ করলো। তাদের মনমস্তিষ্কের ওপর পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করলো। এর ফলে প্রত্যেকটি জিনিসকেই তারা পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে দেখলো। প্রতিটি সমস্যাকে তারা পাশ্চাত্য মানসিকতা দিয়েই বিচার করতে লাগলো। মোটকথা, পাশ্চাত্যবাদের এই সর্বাত্মক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে কোনোরূপ চিন্তা ভাবনা ও পর্যবেক্ষণ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। তারা পাশ্চাত্য থেকে যুক্তিবাদের সবক গ্রহণ করলো বটে; কিন্তু তাদের নিজস্ব কোনো যুক্তি জ্ঞান ছিলোনা, তাদের যুক্তি ছিলো ইউরোপ থেকে ধার করা। এই কারণেই তাদের যুক্তিবাদ মূলত ফিরিঙ্গী যুক্তিবাদে পরিণত হলো – তা আর মোটেই স্বাধীন যুক্তিবাদ রইলোনা। তারা পাশ্চাত্য থেকে সমালোচনার শিক্ষাও গ্রহণ করলো; কিন্তু এটিও স্বাধীন সমালোচনার শিক্ষা ছিলোনা; বরং এ শিক্ষার সারকথা হলো এই যে, পাশ্চাত্য রীতিনীতিকে অভ্রান্ত জানবে, যার মানদন্ডে প্রাচ্যের সবকিছুকেই যাচাই করবে কিন্তু খোদ পাশ্চাত্য রীতিনীতিকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করবে।

এহেন শিক্ষা দীক্ষার পর তারা যখন কলেজের চৌহদ্দি পেরিয়ে জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলো, তখন তাদের মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে বিরাট ব্যবধান

দেখা দিলো। তাদের মন ছিলো মুসলমান, কিন্তু মস্তিষ্ক ছিলো অমুসলিম। তারা বাস করতো মুসলিম সমাজে। দিনরাত সমস্ত কাজ কারবার করতো মুসলিমদের সঙ্গে। সমাজ ও সভ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো মুসলমানদের সাথে। নিজেদের চারিদিকে লক্ষ্য করতো মুসলমানদেরই ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক ক্রিয়াকলাপ। ভালবাসা ও সহানুভূতির সম্পর্ক মুসলমানদের সাথেই সম্পৃক্ত ছিলো; কিন্তু তাদের চিন্তা ভাবনা বিচার বিবেচনা ও মত গঠন করার সমস্ত শক্তিই ছিলো পাশ্চাত্যের ছাঁচে গড়া। তার সাথে ইসলামের কোনো রীতিনীতি বা মুসলমানদের কোনো আচরণের আদৌ সঙ্গতি ছিলোনা। এর ফলে তারা পাশ্চাত্য মানদন্ডেই ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিটি জিনিস বিচার করতে শুরু করলো। এই মানদন্ডের বিপরীত প্রতিটি জিনিসকে – তা ইসলামের কোনো মূলনীতি বা খুঁটিনাটি বিষয় হোক আর মুসলমানদের কোনো আচরণ হোক – তারা ভ্রান্ত ও সংশোধনীয় বলে মনে করলো। তাদের কেউ কেউ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের জন্যে ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা অধ্যয়নও করলো। কিন্তু তাদের সমালোচনা ও গবেষণার মানদন্ড ছিলো তেমনি পাশ্চাত্য ধরনের। কাজেই তাদের মানসিকতার বাঁকা ছিদ্রপথে ইসলামের সোজা পেরেক আঁট্‌বে কি করে?

এই শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা যখন ধর্মীয় ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন, তখন এদের কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট মনে হয় যে, কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যেনো অনর্গল বক্তৃতা ঝেড়ে চলছেন। তার ভূমিকাটা যেমন সুসঙ্গত হয়না তেমনি তা যুক্তি বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী সুবিন্যস্তও নয়। এমনকি, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যে কোনো চেষ্টা পর্যন্ত এরা করেননা। সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, কথা বলবার সময় নিজের ভূমিকাটা পর্যন্তত এরা নির্ধারণ করেনা। একই কথা প্রসঙ্গে এরা অবলীলাক্রমে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন – এক বিশেষ ভূমিকার কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ অন্য এক ভূমিকা গ্রহণ করে বসেন এবং নিজেরাই পূর্ববর্তী ভূমিকার বিরুদ্ধে বলতে শুরু করেন। শিথিল চিন্তা হচ্ছে এদের ধর্মীয় আলোচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। ধর্ম ছাড়া আন্য যে কোনো বিষয়ে এরা অত্যন্ত হুঁশিয়ারী ও সতর্কতার সাথে কথা বলবেন। কারণ সেখানে কোনো অসংবদ্ধ কথা বললে সুধীমন্ডলীর দৃষ্টিতে যে কোনো মর্যাদাই থাকবেনা – একথা তারা ভালো করেই জানেন। কিন্তু তাদের কাছে ধর্মের কোনো মূল্য বা গুরুত্ব না থাকার কারণে সে সম্পর্কে কথা বলার সময় নিজের মস্তিষ্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করার কোনো প্রয়েজনই তারা বোধ করেননা। এই কারণে তারা এখানে সম্পূর্ণই নিশ্চিতভাবে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে পারেন। তাদের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আহারের পর আরাম কেদারায় শুয়ে যেনো একটু রসালাপ করেছন মাত্র, তাই এব্যাপারে কথা বলার রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখারও কোনো প্রয়োজন নেই।

এই জাতীয় লোকদের রচনাবলীতে দ্বিতীয় যে জিনিসটি স্পষ্টত পাওয়া যায়, তাহলো এদের চিন্তার স্থুল এবং জ্ঞানের দৈন্যতা। ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে এতোটা কম জ্ঞান এবং এতো নগণ্য চিন্তা ভাবনা নিয়ে কথা বলার সাহস এদের

নেই। কারণ প্রকৃত তথ্য না জেনে সেখানে কোনো কথা বললে সম্ভ্রমহানি হবার ভয় থাকে। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে অনুসন্ধান, অধ্যয়ন ও চিন্তা ভাবনা করার তারা প্রয়োজনই বোধ করেননা। হালকাভাবে যাকিছু জানতে পারেন, তার ভিত্তিতেই তারা সিদ্ধান্ত করে নেন এবং অসংকোচে তা-ই বিবৃত করে যান। কারণ, এখানে ধরপাকড়ের ভয় নেই। ধরপাকড় করলে হয়তো মৌলুভিরা করবেন; কিন্তু আগে থেকে এটা সুপরিকল্পিতভাবে ধরে নেয়া হয়েছে যে, মৌলুভিরা হচ্ছে অন্ধ, সেকেলে ও সংকীর্ণমনা।

সুযোগ্য লেখকের আলোচ্য নিবন্ধটিতে এই উভয় বৈশিষ্টই পুরোপুরি বজায় রয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ থেকে প্রথমত এটা বোঝাই যায়না যে, তিনি মুসলিম হিসেবে কথা বলেছেন কি অমুসলিম হিসেবে। অথচ ইসলাম সম্পর্কে যিনি কথা বলবেন, তাঁর মাত্র দু'টি ভূমিকাই থাকতে পারে ঃ হয় তিনি মুসলমানদের ভূমিকা গ্রহণ করবেন, নচেত অমুসলিম হিসেবে কথা বলবেন। যিনি মুসলমান হিসেবে কথা বলবেন, তিনি অন্ধবিশ্বাসী (Orthodox), স্বাধীনচেতা, সংস্কারবাদী যাই হোন না কেন, তাকে অবশ্যই ইসলামের সীমার মধ্যে থেকে কথা বলতে হবে। অর্থাৎ কুরআন মজীদকে চূড়ান্ত বিধান (Final Authority) এবং কুরআন নির্ধারিত ধর্মীয় নীতি ও শরয়ী বিধানকে তার নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিতে হবে। কারণ, কুরআনের প্রামাণিকতাকে তিনি বিশ্বাস না করলে এবং কুরআন থেকে প্রমাণিত কোনো বিষয়ের সমালোচনা করার অবকাশ আছে মনে করলে তাঁকে ইসলামের সীমার বাইরে চলে যেতে হবে। এভাবে সীমা অতিক্রমের পর তিনি আর মুসলমানের ভূমিকায় কথা বলতে পারেননা। পক্ষান্তরে তিনি দ্বিতীয় ভূমিকা গ্রহণ করলে, অর্থাৎ ঘোষিত অমুসলিম হলে কুরআনের মূলনীতি ও বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সমালোচনা করতে পারেন। কারণ তিনি কুরআনকে চূড়ান্ত দলিল বলে স্বীকার করেননা। কিন্তু এই ভূমিকা গ্রহণ করার পর মুসলিম হিসেবে কথা বলার, মুসলমান সেজে মুসলমানদেরকে ইসলামের তাৎপর্য বোঝাবার এবং ইসলামের জন্যে উন্নতির পথনির্দেশ করার কোনো অধিকারই তার থাকতে পারেনা। একজন বুদ্ধিমান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি যখন বুঝে শুনে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করবেন, তখন এই দু'টি ভূমিকার মধ্যে কোন্‌টি তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য তার যুক্তিসম্মত শর্তাবলীর প্রতিও তিনি লক্ষ্য রাখবেন। কারণ একই সময় নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়া আবার কুরআন নির্ধারিত মূলনীতি ও বিধি ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনা করা অথবা কুরআনের প্রামাণিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা আবার মুসলমানদেরকে সদুপদেশও খয়রাত করা – কোনো বুদ্ধিমান লোকেরই কাজ হতে পারেনা। এ হচ্ছে দু'টি বিপরীতধর্মী জিনিসকে একত্রিত করার ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। এর মানে হচ্ছে এই যে, একই সময়ে এক ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান এবং অমুসলমান উভয় নামেই পরিচয় দিচ্ছেন – একই সময়ে ইসলামের সীমার মধ্যে এবং বাইরে উভয় জায়গায়ই তিনি অবস্থান করছেন।

লেখকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং তাঁর বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমরা এতোখানি

বিরূপ ধারণা পোষণ করিনা যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলতে হলে একইভাবে দু'টি পরস্পর বিরোধী ভূমিকা তিনি গ্রহণ করতেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে এ প্রত্যাশাও করিনা যে, ভারত সম্রাটের[১] আদালতে বসে তিনি ভারত সম্রাটেরই প্রবর্তিত বিধিব্যবস্থার সমালোচনা করবেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে এ দুসাহসও আশা করিনা যে, তিনি কোনো ধর্ম বা মতাদর্শের (School of Thought) আনুগত্যের দাবি করার পর সেই ধর্মেই মৌলনীতির সমলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ইসলাম সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দু'টি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এমনকি, তিনি যে বারংবার ভূমিকা বদলাচ্ছেন, এই অনুভূতিটি পর্যন্ত তাঁর নেই। একদিকে তিনি নিজেকে মুসলমান বলে জাহির করছেন, মুসলমানী নামে পরিচয় দিচ্ছেন, মুসলমানের দুর্দশার জন্যে আক্ষেপ করছেন, ইসলামের উন্নতির জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করছেন, মুসলমানদেরকে 'ইহ্সান' অর্থাৎ 'খাঁটি ধর্মের' নসীহত শুনাচ্ছেন। অন্যদিকে যে কিতাবের ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত এবং যাকে চূড়ান্ত দলিল বলে স্বীকার করা মুসলমান হবার জন্যে অপরিহার্য শর্ত, তার মূলনীতি ও বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে বেপরেয়া সমালোচনাও করছেন। কুরআন শুধু এক আধটি ক্ষেত্রেই নয়, অন্তত, চার জায়গায় শূকরের মাংসকে[২] স্পষ্ট ভাষায় হারাম ঘোষণা করেছে। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে লোকদেরকে সুবিধা দেবার পক্ষপাতি। মজার ব্যাপার হলো, সুবিধা দেবার এই আগ্রহটাও নাকি 'ইসলামের উন্নতির' খাতিরে! মনে হয় যেনো কুরআনের চাইতেও ইসলামের উন্নতির চিন্তাটা তাঁকে বেশি পেয়ে বসেছে। অথবা তিনি কুরআন বহির্ভূত কোনো ইসলামের তরক্কির জন্যে অধীর হয়ে পড়েছেন! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুরআন অন্যান্য জিনিসের ন্যায় মানুষের জন্যে খাদ্য তালিকাও (Menu) প্রস্তুত করে এবং খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে হালাল-হারাম ও পাক-নাপাকের পার্থক্য নির্ধারণ করে দেয়। এমনকি, স্পষ্টত বলে দেয় যে, 'তোমরা নিজেদের খেয়াল খুশি অনুযায়ী কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করার অধিকারী নও।[৩] কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে নিজের অধিকারের ওপরই জোর দিচ্ছেন এবং কুরআনের অধিকার স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করছেন। অর্থাৎ পানাহারের ব্যাপারে ধর্মের কোনো হস্তক্ষেপ মানতেই তিনি রাজি নন!

বস্তুত সেন্ট পলের[৪] (যিশুখ্রীষ্ট নন) অনুগামীদের ন্যায় কুরআন ধর্মকে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করে রাখেনি। বরং পোশাক পরিচ্ছদ, খানাপিনা, বিবাহ তালাক, উত্তরাধিকার, লেনদেন, রাজনীতি, বিচারালয়, দন্ডবিধি ইত্যাদি প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সে আইন প্রদান করে। অথচ তিনি একে ইসলামের উন্নতি

---

১. মনে রাখতে হবে যে, প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৯৩৪ সালে।

২. দেখুন ঃ আল-বাকারা : আয়াত ১৭৩, আল-মায়েদা : আয়াত ৩, আল-আনয়াম : আয়াত ১৪৫, আন নাহল : আয়াত ১১৫)

৩. আন-নাহল : আয়াত ১১৬।

৪. ইনি যিশুখৃষ্টের অন্যতম প্রধান শিষ্য। মৃত্যু, আনুমানিক ৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। বর্তমান খ্রীষ্টান জগত প্রধানত এঁরই মতের অনুগামী। - সম্পাদক

ও তরক্কির পথের অন্তরায় মনে করেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, এই আইন মানুষকে একটি নির্জীব লাশ এবং অবোধ শিশুতে পরিণত করে। আর তাই তিনি প্রস্তাব করেছেন, খ্রীষ্টানরা (প্রকৃতপক্ষে পল অনুগামারী) যেমন বুঝছে, আমাদের ধর্ম ও ঠিক তেমনটিই হওয়া উচিত। কুরআন নিজেই শরয়ী বিধান তৈরি করেছে এবং তাকে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা আখ্যা দিয়ে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তিনি শরীয়তের এই সীমারেখাকে 'বেড়ি' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সেন্ট পলের ন্যায় ধর্মের প্রচার ও উন্নতির জন্যে সে বেড়ি ছিন্ন করা আবশ্যক মনে করেছেন। কুরআনের দৃষ্টিতে ঈমান হচ্ছে মুক্তির জন্যে প্রথম ও আবশ্যিক শর্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার নয়, তার সম্পর্কে কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে যে, সে দোযখের ইন্ধনে পরিণত হবে।[১] তারা সংখ্যায় অগণিত হোক কি মুষ্টিমেয়, স্বচ্ছল হোক কি দরিদ্র তাতে কিছুই যায় আসেনা। কিন্তু তার অবস্থা হচ্ছে এইযে, কাফির ও মূর্তিপূজারীদের অগণিত জনসংখ্যাকে সুখী স্বচ্ছল ও সমৃদ্ধিশালী দেখে তাঁর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছেনা যে, কয়েক বছর পরই তারা দোযখের ইন্ধনে পরিণত হবে! কারণ তারা খোদার দুনিয়াটাকে সমৃদ্ধ ও সুশোভিত করা ছাড়া আর কি অপরাধ করেছে, এটা তাঁর বোধগম্যই হচ্ছেনা! প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, কুরআনের সঙ্গে এতোটা খোলাখুলি মতবিরোধ পোষণ করে তিনি কিভাবে মুসলমান থাকতে পারেন? কিংবা মুসলমান হয়ে তিনি কিভাবে কুরআনের সঙ্গে মতবিরোধ পোষণ করেন? তিনি যদি মুসলমান হন তো কুরআনের সাথে তার মতবিরোধ না করাই উচিত। আর যদি মতবিরোধ চান, তাহলে ইসলামের নির্ধারিত সীমার বাইরে গিয়েই করা উচিত। যে ব্যক্তি কোনো ধর্মের মূলনীতি ও বিধি ব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট নয়, যার মন সে বিধি ব্যবস্থার সত্যতায় সায় দেয়না, যিনি তার কার্যকারণ ও যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে অক্ষম, যার দৃষ্টিতে তার কতক বা অধিকাংশ বিষয়ই আপত্তিকর, তার সামনে দুটি পথই খোলা রয়েছে ঃ হয় তিনি সে ধর্ম থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার যে কোনো নিয়ম ও বিধান সম্পর্কে নির্বিবাদ সমালোচনা করার অধিকার লাভ করবেন, কিংবা অসন্তুষ্ট মনোভব নিয়ে সে ধর্মের মধ্যে থাকতে চাইলে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ থেকে বিরত থাকবেন এবং 'মুজতাহিদ' সেজে তার বিধি ব্যবস্থার ওপর করাত না চালিয়ে যথার্থ শিক্ষার্থীর ন্যায় নিজের সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করবেন। সুস্থ বিচার বুদ্ধি অনুসারে কেবল এই দুটি পন্থাই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে। আর সত্যিকার বিবেকসম্পন্ন কোনো লোক এমনি পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে এর যে কোনো একটি পন্থাই তিনি অবলম্বন করবেন। কিন্তু লেখক প্রবর এবং তার ন্যায় ফিরিঙ্গী শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক ভদ্রলোকেরই অবস্থা হচ্ছে এই যে, প্রথম পথটি গ্রহণ করবার মতো নৈতিক সাহস তাদের মধ্যে নেই, আর দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করতেও তারা লজ্জাবোধ করেন। এই কারণেই তারা মাঝামাঝি একটা অযৌক্তিক পন্থা অবলম্বন করেছেন; তা হলো এই যে, একদিকে তাঁরা মুসলামানদের মধ্যে শামিল হয়ে ইসলামের উন্নতি ও তরক্কীও

---

১. আল-আম্বিয়া : আয়াত ৯৮।

কামনা করেন, ইসলাম ও মুসলামানদের দুঃখ দরদে অস্থিরতাও প্রকাশ করেন, অন্যদিকে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন সবকিছুই বলেন এবং করেন, যা একমাত্র অমুসলমানদের পক্ষেই সম্ভব। হাদিস ও ফিকাহ্ তো দুরের কথা, খোদ কুরআন মজীদের সমালোচনা করতেও এঁরা কুণ্ঠিত নন। ইসলামের প্রতিটি ভিত্তির ওপরই এঁরা অবলিলাক্রমে আঘাত হেনে চলছেন। এই শ্রেণীর ভদ্রজনেরা দাবি করেন যে, সমাজে এঁরাই একমাত্র যুক্তিবাদী লোক; সুতরাং যুক্তিবিরুদ্ধ কোনো কথা এরা মানতে পারেননা। আর 'মোল্লা'দের বিরুদ্ধে এদের সবচাইতে বড় অভিযোগ এই যে, তারা কোনো ব্যাপারেই বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করেনা। কিন্তু এদেরই অবস্থা হচ্ছে এই যে, ধর্মের ব্যাপারে এরা স্পষ্টত স্ববিরোধী কথা বলছেন, পরস্পর বিরোধী কর্মনীতি অবলম্বন করছেন এবং নিজেরই এক কথার দ্বারা অন্য কথার প্রতিবাদ করে চলছেন – এটা কোন্ ধরনের যুক্তিবাদ যা আবিষ্কার করে প্রগতিবাদী গবেষকরা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন?

এবার তাদের জ্ঞানের বহর এবং চিন্তার গভীরতাটা একটু তলিয়ে দেখুন।

ইসলামের তরক্কির জন্যে লেখকপ্রবর খ্রীষ্টধর্মের ন্যায় তাবৎ শরয়ী বিধি নিষেধ তুলে দেয়া এবং ইসলামকে নিছক একটি বিশ্বাসমূলক ধর্ম বানিয়ে রাখা আবশ্যক মনে করেন। কারণ খ্রীষ্টধর্মের উন্নতির মূলে এই রহস্যটি তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, সেখানে হারাম হালালের কোনো সীমারেখা নেই। কোনো নৈতিক বিধি নিষেধের বালাই নেই। সেখানে মানুষের মানবিক অধিকার হরণ করে তাকে নিষ্প্রাণ লাশ ও অবোধ শিশুতে পরিণত করা হয়নি; বরং খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস রেখে যা খুশি তা করবার স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি এটা তলিয়ে চিন্তাই করেননি যে, যে জিনিসটাকে ইসলাম বলা হয়, তা রয়েছে কুরআনে। আর কুরআন ঈমান ও সৎকাজ উভয়েরই সমবেত নাম রেখেছে ইসলাম। পরন্তু সৎকাজের জন্যে সে স্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করেছে, বিধি ব্যবস্থা তৈরি করে দিয়েছে এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের জন্যে একটি পরিপূর্ণ কর্মপদ্ধতি নির্দেশ করেছে। এমনি পদ্ধতি ছাড়া একটি দীন (জীবন ব্যবস্থা) এবং একটি সভ্যতা হিসেবে ইসলাম কিছুতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনা। আর সে পদ্ধতি এবং তার সীমারেখাকে বিলোপ করার অধিকারও কোনো মুসলমানকে দেয়া হয়নি। কারণ তার বিলুপ্তি ইসলামের বিলুপ্তিরই নামান্তর মাত্র। আর ইসলামই যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় তো তার উন্নতির কি অর্থ থাকতে পারে? তিনি ইচ্ছা করলে নিজেই কোনো ধর্ম আবিষ্কার করে তার প্রচার করতে পারেন, কিন্তু কুরআনের বিরুদ্ধ জিনিসকে ইসলামের নামে চালানো এবং তার উন্নতিকে 'ইসলামের উন্নতি' আখ্যা দেয়ার তার কী অধিকার রয়েছে?

তিনি নিছক একটি বিশ্বাসকে ইসলাম বলতে চান; আর তাহলো এই যে, আমরা ইহজীবন বা পরজীবনে আমাদের কৃতকর্মের জন্যে দায়িত্বশীল। সম্ভবত একথাটি তিনি এই আশায় বলেছেন যে, এর দ্বারা ইসলাম সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। তার প্রকৃতি সহজ ও মোলায়েম হয়ে যাবে এবং তা দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকবে।

কিন্তু তিনি এই বিশ্বাসটির তাৎপর্য সম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই বুঝতে পারতেন যে, এভাবে সীমিত হবার পরও ইসলাম তাঁর মনোপুত হতে পারেনা। কারণ এই বিশ্বাসটিকে ধর্ম আখ্যা দিতে হলে সর্বপ্রথম পারলৌকিক জীবনের প্রতি ঈমান পোষণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। পরন্তু জবাবদিহি বা দায়িত্ববোধ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত যাঁর সামনে জবাবদিহি করতে হবে, তাঁর স্বরূপ নির্ণয় করা এবং তাঁর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া। দ্বিতীয়ত, জবাবদিহির প্রকৃতি নির্ণয় করা এবং তদনুযায়ী বাস্তব জীবনে সফল ও ব্যর্থ কাজগুলোর মধ্যে পার্থক্য করে চলা। তৃতীয়ত, জবাবদিহির ব্যাপারে সাফল্য ও ব্যর্থতার পৃথক পৃথক ফলাফল নির্ণয় করা। কারণ, ব্যর্থতা ও সাফল্য উভয়ের ফলাফল একরূপ হলে কিংবা আদৌ কোনো ফলাফল না থাকলে জবাবদিহিই সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে পড়ে। লেখকপ্রবর যে বিশ্বাসটিকে 'খাঁটি ধর্ম' আখ্যা দিতে চান, এ হচ্ছে তারই যুক্তিসঙ্গত দাবি। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী এই বিশ্বাসটির উপর যদি ইসলামকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়, তবু যে আপদ থেকে তিনি বাঁচতে চান তা এসে চেপে বসবেই। এর ফলে আবার সেই খোদাকে মানা অবশ্যক হয়ে পড়বে, যাকে বাদ দিয়েই জাপান উন্নতির শীর্ষদেশে আরোহণ করেছে বলে মনে হচ্ছে। আবার সেই শরয়ী বন্ধন ও নৈতিক শৃঙ্খল তৈরি হয়ে যাবে, যাকে তিনি ছিন্ন করতে চান এবং যার ভেতরে ইসলামের উন্নতি না করার গোপন রহস্যটি নিহিত রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। অবার সেই আযাব ও সওয়াব তথা শাস্তি ও পুরস্কারের তর্ক আত্মপ্রকাশ করবে এবং খোদার বেশুমার সৃষ্টিকে এ বিশ্বাস ছাড়াই সুখী সমৃদ্ধ দেখে তাঁর মন সায় দিতে অস্বীকার করবে যে, মাত্র কয়েক বছর পরই এরা আযাবের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে।

কাজেই তিনি একটু ভেবে চিন্তে বরং এমন একটা জিনিসের নাম ইসলাম রেখে দিন, যাতে কোনোরূপ বিধি নিষেধের বালাই থাকবেনা। যার প্রতি বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয়েরই পরিণাম ফল একরূপ হবে। যাতে পারলৌকিক সাফল্যের জন্যে খোদার দুনিয়াটাকে সমৃদ্ধ সুবিন্যাস্ত করাই যথেষ্ট হবে এবং যার প্রতি অবিশ্বাসী বেশুমার সৃষ্টিকে সুখী সমৃদ্ধ দেখে তাঁর মন সায় দিতে পারবে যে, কয়েক বছর পরে এদের সবাইকে জান্নাতের বুলবুলে পরিণত করা হবে!

কুরআনের বিধানানুসারে শূকরের মাংস চূড়ান্তভাবে হারাম হবার ব্যাপারটি লেখকের মনে সঠিক ও প্রামাণ্য নয়। তিনি সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, হয়তো আরবদের জন্যে কোনো বিশেষ কারণে এটি হারাম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই অভিমত প্রকাশ করার আগে তিনি কুরআন শরীফ খুলে একটু দেখে নিলেই তাঁর সন্দেহটা ঘুচে যেতো। কুরআনে স্পষ্টত বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لاَّ اَجِدُ فِىْ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلاَّ اَنْ
يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْلَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْفِسْقًا

أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . (سورة الانعام : ١٤٥)

অর্থ ঃ হে নবী! বলে দাও ঃ আমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়েছে, তাতে কোনো ভোজনকারীর ভোজ্য জিনিসকে হারাম করা হয়নি, অবশ্য মৃতদেহ, প্রবাহিত রক্ত আর শূকরের মাংস ছাড়া – কারণ এগুলো নিসন্দেহে অপবিত্র; কিংবা অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নামে জবাই করা প্রাণী ব্যতীত। অতপর যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়েছে (এবং এর কোনো জিনিস খেয়ে ফেলেছে) সে যদি আবাধ্যচারী ও সীমা লঙ্ঘনকারী না হয় তো তোমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়াময়।' (সূরা আনয়াম ঃ ১৪৫)

এই আয়াতে শূকরের মাংস প্রত্যেক 'ভোজন'কারীর (طاعم) জন্যেই হারাম করে দেয়া হয়েছে। আর হারাম ঘোষণার জন্যেই এই কারণ দর্শানো হয়েছে যে, তা হচ্ছে 'অপবিত্র' (رجس)। প্রশ্ন হলো, এখানে ভোজনকারী বলতে কি আরবের ভোজনকারীকে বুঝানো হয়েছে? তাছাড়া একই জিনিস কি আরবের জন্যে পবিত্র এবং অনারবের জন্যে অপবিত্র হতে পারে? এই সূত্র ধরেই কি লেখক মুর্দাখোরদের জন্যেও সুবিধা দেয়া পছন্দ করবেন? শূকরের মাংসের বেলায় তিনি সুবিধা দিতে চাইলে নিজের পক্ষ থেকেই দিন। কিন্তু কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণার বিরুদ্ধে একথা বলার অধিকার তিনি কোথায় পেলেন যে, কুরআন দ্বারা এর চূড়ান্ত হারাম হবার ব্যাপারটি সন্দেহমুক্ত নয়?

আজকের নব্য মুজতাহিদরা ইজ্‌তিহাদের জন্যে এক অদ্ভুত নীতি আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের একটি বিশিষ্ট নীতি হচ্ছে এই যে, ইসলামের যে বিধানটির তাঁরা বিরুদ্ধাচরণ করতে চান, সে সম্পর্কে তারা নির্দ্বিধায় বলে দেন যে, এই বিশেষ ব্যবস্থাটি আরবদের জন্যে করা হয়েছিলো! এই বিশেষিতকরণ সম্পর্কে কুরআনে কোনো সামান্য ইঙ্গিত এবং এর স্বপক্ষে কোনো যুক্তি বা দৃষ্টান্ত না থাকলেও এ ধরনের উক্তি করতে তাঁরা মোটেই কুণ্ঠাবোধ করেননা। এমনিতরো ধারা অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো কুরআনকেই একদিন তাঁরা আরবদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিতে চাইবেন।

পরন্তু فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ (অবাধ্যচারী ও সীমা লংঘনকারী না হয়ে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়ে)-এর সাহায্যে যুক্তি প্রদর্শন করাটা এমনি হাস্যকর যে, ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখকের জ্ঞান বুদ্ধির প্রশংসা করতে ইচ্ছে হয়। সম্ভবত আয়াতটির তিনি এই অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, 'যখন শূকরের মাংস খাবার স্বতস্ফূর্ত ইচ্ছা জাগবে তখন খেয়ে নিও, কিন্তু বাগানে বসে খেয়োনা এবং তার অভ্যেসও করোনা।'

বস্তুত, এই আয়াত থেকে শূকরের মাংসের ব্যাপারে ইউরোপীয় ও চীনাদেরকে সুবিধা দানের অবকাশ এমন ব্যক্তিই বের করতে পারে, যে নিরূপায়, অবাধ্য ও অভ্যস্ত-এর কোনো একটি শব্দেরই অর্থ বোঝেনা। নচেত যে ব্যক্তি এ শব্দগুলোর

অর্থ জানে, তার পক্ষে এতোখানি দুসাহস দেখানো সম্ভবপর নয়। প্রকৃতপক্ষে আয়াতটির অর্থ এ নয় যে, যারা মুর্দাভক্ষণ বা রক্তপানে আসক্ত কিংবা যারা শূকরের মাংসের জন্যে প্রাণপাত করে, অথবা যাদের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা প্রাণীর মাংস ভোজন সাধারণভাবে প্রচলিত, তারা সবাই উপায়হীনের অন্তর্ভুক্ত। এমনি হলে তো গোটা নিষেধাজ্ঞাটিই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াতো। কারণ নিষেধাজ্ঞাটি যদি এই জিনিসগুলোর ভক্ষণকারীদের প্রতি প্রযোজ্য হতো তো তারা ব্যতিক্রম অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের অভ্যাস অনুসারেই খেতে থাকতো কিংবা যারা নিজেরাই এই জিনিসগুলো বর্জনকারী, নিষেধাজ্ঞাটি তাদের জন্যে হলেও এর কোনো প্রয়োজন ছিলোনা। প্রকৃতপক্ষে নিরূপায় (اضطر) শব্দটির সঙ্গে 'অবাধ্য ও সীমা লংঘনকারী ছাড়া'র শর্তারোপ করে যে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করা হয়েছে, তার অর্থ এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাবার উপক্রম হয় এবং হারাম জিনিস ছাড়া অপর কোনো জিনিস সে সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই সে হারাম জিনিস খেতে পারে। কিন্তু সে জন্যে শর্ত এই যে, অনুমতির সীমা লংঘন করা যাবেনা। অর্থাৎ প্রাণ রক্ষার জন্যে যতোটুকু পরিমাণ অপরিহার্য, তার বেশি খাবেনা এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লংঘনের বাসনা মনে পোষণ করবেনা। এ কথাটিই অন্যত্র শূকরের মাংস, মৃতদেহ ইত্যাদির নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে এইভাবে বিবৃত হয়েছে:

فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍ .

–অর্থাৎ ক্ষুধার জ্বালায় কেউ নিরূপায় হয়ে পড়লে তার মনে যদি গুনাহ্র প্রতি আকর্ষণ না থাকে, তবে এমনি অবস্থায় সে হারাম জিনিস খেতে পারে।' কোথায় কুরআনের বিধান আর কোথায় ইউরোপ ও চীনবাসীদের জন্যে লেখকের ওকালতি। ঐসকল দেশের অধিবাসীরা যেহেতু শূকরের মাংসের জন্যে প্রাণপাত করে, এই কারণেই فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ এর সুযোগে তাদের জন্যে শূকরের মাংস জায়েয করতে হবে এবং তাও আবার তাদের ইসলামের দাখিল হবার জন্যে – কী উদ্ভট যুক্তি! এভাবে যদি প্রত্যেক জাতির আসক্তি ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামের বিধি ব্যবস্থায় সুবিধা দানের ধারা শুরু হয়ে যায়, তাহলে মদ, জুয়া, ব্যভিচার, সুদ এবং এ ধরনের তামাম নিষিদ্ধ বস্তুকেই একে একে হালাল করতে হবে। প্রশ্ন হলো এই যে, যারা আল্লাহর বিধানের অনুবর্তন করতে, তার নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলতে এবং হারামকে হারাম ভাবতেই প্রস্তুত নয়, তাদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার প্রয়োজনটা কী? ইসলাম কবে এ ধরনের লোকদের মুখাপেক্ষী ছিলো যে, এদেরকে সম্মত করাবার জন্যে দর কষাকষি করতে হবে?

প্রথমে শুধু শূকরের মাংস হারাম হবার কারণটাই লেখকের বোধগম্য হয়নি। কিন্তু পরে কিছুটা চিন্তা ভাবনার পর তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, নীতিগতভাবে

পাকস্থলী ও নৈতিক চেতনার মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। কাজেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে হালাল হারামের পার্থক্য নির্দেশ করার কোনো অধিকার ধর্মের নেই। তাঁর এই বক্তব্য থেকে এ রহস্যও উদ্‌ঘাটিত হলো যে, কুরআন সম্পর্কে তিনি যা কিছু জানেন, জড় বিজ্ঞান (Physical Science) সম্পর্কে তার চাইতে বেশি মোটেই জানেননা। অবশ্য কুরআন সম্পর্কে না জানাটা একজন শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে তেমন কোনো লজ্জার ব্যাপার নয়, কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে এতোখানি অজ্ঞতা তো নিসন্দেহে এক বিরাট লজ্জাজনক ব্যাপার! এখন পর্যন্ত তিনি এই কথাটুকুই জানেননা যে, মানুষের আত্মার সঙ্গে তার দৈহিক গঠনের এবং দৈহিক গঠনের সাথে খাদ্যের সম্পর্কটা কী? যে বস্তুটি দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত উপাদান সরবরাহ করে, যদ্বারা দেহের তামাম শিরা উপশিরা ও স্নায়ূমণ্ডলী গঠিত হয়, হৃদয় ও আত্মার ওপর তার স্বভাবগত প্রভাব পড়াটা নয়; বরং না পড়াটাই বিস্ময়কর। এই সত্যের প্রতি বিজ্ঞান জগতও পূর্বে সাধারণভাবে উদাসীন ছিলো; কিন্তু খাদ্য বিজ্ঞান (Dietetics) সম্পর্কে ইদানিং যেসব গবেষণা হয়েছে, তার থেকে এই রহস্য প্রতিভাত হয়ে উঠেছে যে, মানুষের নৈতিক চরিত্র ও তার মানসিক শক্তির ওপর খাদ্য অবশ্যই প্রভাবশীল হয়ে থাকে। তাই বিভিন্নরূপ খাদ্য আমাদের আত্মা ও চিন্তাশক্তির ওপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করে, আধুনিক বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান চালাচ্ছেন। মনে হয় বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের গ্রাজুয়েট বন্ধুর জানাশোনা মোটেই অধুনাতম (up-to-date) নয়। নচেত এতোবড় ধৃষ্টতার সাথে তিনি এ দাবি করতে পারতেননা যে, নীতিগতভাবে পাকস্থলী ও নৈতিক চেতনার মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।

❖❖❖

৯

যুক্তিবাদের প্রতারণা*

দুই

যুক্তিবাদ (Rationalism) ও প্রকৃতিবাদ (Naturalism) এই দু'টি জিনিসের প্রচারণা গত দুই শতক ধরে পাশ্চাত্যবাসীরা খুব জোরেশোরে চালিয়ে আসছে। প্রচারশক্তির মাহাত্মকে কে অস্বীকার করতে পারে? কোনো বস্তুকে ক্রমাগত উপর্যুপরি ও বারংবার লোকদের চোখের সামনে তুলে ধরা হলে এবং তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়ে দিলে তার প্রভাব থেকে আপন মন মগজকে তারা কতোক্ষণ রক্ষা করবে? তাই শেষ পর্যন্ত প্রচারের মহিমায়ই দুনিয়া একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও তার সভ্যতার ভিত্তি নিরেট যুক্তিবাদ ও প্রকৃতিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনামূলক অধ্যয়নের ফলে এসত্য একেবারে প্রতিভাত হয়ে উঠছে যে, তার ভিত্তি যুক্তিবাদ কি প্রাকৃতিক নিয়ম এর কোনোটার ওপরই নয়; বরং এর বিপরীত – পাশ্চাত্য সভ্যতার গোটা কাঠামোই নিছক অনুভুতি, কামনা ও প্রয়োজনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত পাশ্চাত্যের নব জাগরণ ছিলো বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক প্রচন্ড বিদ্রোহ মাত্র। সে জাগরণ বিচার বুদ্ধিকে পরিহার করে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ও বস্তুবাদের পথে এগিয়ে চলেছে। বিবেক বুদ্ধির পরিবর্তে অনুভুতির ওপর নির্ভর করেছে। বিবেকের নির্দেশ, যুক্তিসম্মত প্রমাণাদি ও সহজ প্রবৃত্তিকে বাতিল করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত ফলাফলকেই আসল ও প্রকৃত মানদন্ড বলে ঘোষণা করেছে। প্রকৃতির নির্দেশকে ভ্রান্ত ধারণা করে আকাঙ্খা ও প্রয়োজনকেই নিজের দিশারী হিসেবে গ্রহণ করেছে। মাপজোখের সীমা বহির্ভূত প্রতিটি জিনিসকেই অসাড় ও ভিত্তিহীন বলে মনে করেছে। কোনোরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগত স্বার্থ হাসিল হয়না, এমন প্রতিটি জিনিসকেই অকেজো ও অপ্রয়োজনীয় বলে আখ্যাদান করেছে। প্রথমদিকে খোদ পাশ্চাত্যবাসীদের কাছেই এ সত্যটি ছিলো প্রচ্ছন্ন। এই কারণেই তারা যুক্তি ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলা সত্ত্বেও এই ধারণা পোষণ করেছিলো যে, তারা 'মুক্ত বুদ্ধিবাদের' যে নব্য যুগের উদ্বোধন করেছে, তার ভিত্তি 'যুক্তিবাদ' ও 'প্রকৃতিবাদের' ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরে অবশ্য আসল রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু তবু তা স্বীকার করবার সৎসাহস তাদের হয়নি। তাই বস্তুপূজা, প্রবৃত্তির গোলামী ও ইন্দ্রিয় পরবশতার চরম চাতুর্যের সঙ্গে তারা যুক্তি প্রমাণ ও প্রকৃতিবাদের আবরণ টেনে দিচ্ছিলো। কিন্তু ইংরেজী প্রবাদ অনুসারে আজ 'থলের বিড়াল একেবারে বাইরে এসে পড়েছে।' অযৌক্তিকতা ও প্রকৃতি বিরোধিতা আজকে এতোটা প্রকট হয়ে উঠেছে যে, তার ওপর কোনো আবরণ টেনে দেয়াই

---

* প্রবন্ধটি ১৯৩৬ সালের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় করে। - সম্পাদক

আর সম্ভব নয়। এই কারণেই আজ যুক্তি ও প্রকৃতি উভয়ের বিরুদ্ধেই প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করা হচ্ছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের পবিত্র দিঙ্‌মণ্ডল থেকে শুরু করে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি সর্বত্রই বিদ্রোহের ঝাণ্ডা সমুন্নত হয়েছে। ফলে 'পশ্চাৎমুখী' মুনাফিকদের একটি দল ছাড়া আধুনিক বিশ্বের সমস্ত নেতাই আপন সভ্যতার ওপর শুধু কামনা ও প্রয়োজনের কর্তৃত্বই স্বীকার করে নিয়েছে।

প্রাচ্যের পাশ্চাত্যবাদী ও ফিরিঙ্গীপন্থীরা তাদের গুরুদের চাইতে এখনো কয়েক কদম পেছনে রয়েছে। যে শিক্ষা ও মানবিক পরিবেশ এবং যে কৃষ্টি ও সভ্যতার মধ্যে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধিত হয়েছে, স্বভাবত এদের মধ্যেও তেমনি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বস্তুবাদের উপাসনা এবং কামনা ও প্রয়োজনের দাস্যবৃত্তি সৃষ্টি হতে বাধ্য। আর প্রকৃতপক্ষে তা-ই সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু থলের বিড়াল বেড়িয়ে পড়বার মতো পর্যায়ে এখনো তারা উপনীত হয়নি। তারা এখনো আপন বক্তৃতা ও রচনাদির মাধ্যমে এই দাবিই করছে যে, আমরা শুধু যুক্তিপ্রকৃতির নির্দেশই স্বীকার করি। আমাদের সামনে শুধু যুক্তি-প্রমাণ পেশ করো। যুক্তি-প্রমাণ ও প্রাকৃতিক নিদর্শন দ্বারা সপ্রমাণ না করা গেলে কোনো জিনিসই আমরা মানবোনা। কিন্তু এসব বড় বড় বুলির থলের মধ্যে এমন বিড়াল লুকিয়ে রয়েছে, যা যুক্তিযুক্ত কি প্রকৃতিগত, কোনোটাই নয়। তাদের রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই বোঝা যাবে যে, যুক্তি-প্রমাণ ও সহজ প্রবৃত্তির অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করতে তাদের মনমগজ একেবারেই অক্ষম। তারা যে বস্তুটিকে 'যুক্তি প্রসূত কল্যাণ' বলে অভিহিত করে, তার তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, আসলে সেটি হচ্ছে 'অভিজ্ঞতাজাত কল্যাণ'। আর অভিজ্ঞতাজাত কল্যাণ হচ্ছে এমন জিনিস, যা কঠিন, ভারী, গণনা ও পরিমাপযোগ্য। যে জিনিসের কল্যাণ বা উপকারিতা তাদেরকে গাণিতিক নিয়মে হিসেব করে, কিংবা দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ওজন করে অথবা মাপকাঠি দ্বারা পরিমাপ করে দেখানো যাবেনা, তাকে তারা স্বীকার করতে মোটেই প্রস্তুত নয়। আর যতোক্ষণ পর্যন্ত এই বিশিষ্টার্থে তার উপকারিতা সপ্রমাণ না করা যাবে, তার প্রতি ঈমান পোষণ এবং তার আনুগত্য করা, তাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই একটি 'অযৌক্তিক' কাজ। তারা প্রকৃতির নির্দেশ পালন সম্পর্কে যে দাবি করে, একটু তলিয়ে খোঁজ নিলে তার রহস্যটাও প্রকট হয়ে ওঠে। তাদের মতে প্রকৃতি অর্থ মানবীয় প্রকৃতি নয়; বরং জৈবিক প্রকৃতি। আর জৈবিক প্রকৃতিতে বিবেক বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির কোনো স্থান নেই; তা হচ্ছে শুধু অনুভূতি, আকাঙ্খা ও ইন্দ্রিয় পরবশতায় পরিপূর্ণ। তাদের মতে যেসব জিনিস মানুষের ইন্দ্রিয়নিচয়কে প্রভাবিত করতে, তার কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে এবং তার দৈহিক মানসিক দাবি পূরণ করতে সক্ষম, কেবল তা-ই হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্য; যেসব বস্তুর উপকারিতা সহজেই নিরীক্ষণ করা যায়, যার অপকারিতা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, কিংবা উপকারিতার তুলনায় কম দৃষ্টিগ্রাহ্য, শুধু তা-ই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য। পক্ষান্তরে যেসব জিনিস মানুষের প্রকৃতিগত, যার গুরুত্ব মানুষ আপন বিবেক দ্বারা অনুভব করে, যার উপকার কি অপকার বস্তুগত বা অনুভূত নয়; বরং আত্মিক ও আন্তরিক – তা হচ্ছে কুসংস্কার, অর্থহীন, অকেজো ও অপ্রয়োজনীয়।

এরূপ জিনিসকে কোনো গুরুত্ব দেয়া – এমনকি তার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করা অন্ধত্ব, কুসংস্কার ও সেকেলেপনার শামিল। একদিকে যুক্তি ও প্রকৃতির প্রতি এমনি বীতশ্রদ্ধা, অন্যদিকে আবার যুক্তিবাদ ও প্রগতিবাদের দাবি! তাদের বিবেক-বুদ্ধি দেউলিয়াপনার এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, পরস্পর বিরোধিতাকে তারা উপলব্ধি পর্যন্ত করতে পারছেনা।

শিক্ষা, কৃষ্টি ও সভ্যতা থেকে মানুষের অন্তর এতোটুকু উপকার অবশ্যই লাভ করা উচিত যে, তার চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা বিক্ষিপ্ত, অসংলগ্ন ও অব্যবস্থিত হবেনা। সে পরিচ্ছন্ন এবং সহজ-সরল চিন্তাপদ্ধতি অবলম্বন করবে। ঘটনা প্রবাহকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করে সে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। স্ববিরোধিতা ও অর্থহীন প্রলাপের ন্যায় স্পষ্ট ভ্রান্তি থেকে সে বেঁচে থাকবে। কিন্তু কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মানসিক উৎকর্ষের এই প্রাথমিক সুফলগুলো থেকেও বঞ্চিত দেখা যাচ্ছে। কোনো বিষয়ে তর্ক করার আগে নিজের সঠিক ভূমিকা নির্ণয় করা, সেই ভূমিকার বুদ্ধিবৃত্তিক ফলাফল উপলব্ধি করা এবং তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আপন ভূমিকার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যুক্তিধারা অবলম্বন করার মতো কোনো বিচারবোধই তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়না। তাদের সঙ্গে আলাপ করলে কিংবা তাদের রচনাবলীর প্রতি দৃকপাত করলে প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হবে যে, তাদের চিন্তাধারা নিদারুণ অসংলগ্ন। আলোচনার সূত্রপাত এক হিসেবে করার পর কিছুটা এগিয়েই তারা ভূমিকা বদলে ফেলে, আরো কিছুটা এগিয়ে তো একেবারে স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করে। বক্তব্য বিষয়কে সপ্রমাণ করার জন্যে সুচিন্তিতভাবে তথ্য নির্বাচন করা এবং যুক্তিবিজ্ঞানের ধারায় সেগুলোকে বিন্যস্ত পর্যন্ত করা হয়নি। তাদের আসল বক্তব্যটা কি?, কোন বিষয়টির সত্যাসত্য তারা নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন এবং শেষ অবধি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, আদ্যোপান্ত খোঁজখুঁজি করেও এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়না। এই পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত কারণ এই যে, বর্তমান সভ্যতা এবং এর প্রভাবাধীন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণতার ও বস্তুতান্ত্রিকতার প্রতিই নিবদ্ধ। সে মানুষের লালসা বাসনা জাগিয়ে দেয়; তার প্রয়োজনবোধকে উদ্দীপিত করে এবং ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুর গুরুত্ব তার হৃদয়মনে বদ্ধমূল করে দেয়; কিন্তু তার বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিকতার উৎকর্ষ সাধন করেনা। তার মধ্যে বিচার বিবেচনা ও মননশীলতা অহমিকা সৃষ্টি করে বটে এবং সেই অহমিকা তাকে প্রতিটি জিনিসেরই 'যুক্তিসম্মত' সমালোচনা করতে এবং তার দৃষ্টিতে 'যুক্তিগ্রাহ্য' নয় এমন প্রত্যেকটি জিনিসকে অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধও করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুক্তিবাদের প্রতি তার মনমানস একেবারেই বীতশ্রদ্ধ। নির্ভুল যুক্তিধারায় কোনো প্রশ্নের মীমাংসা করার অথবা কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মতো যোগ্যতা তার মধ্যে আদৌ সৃষ্টি হতে পারেনা।

আধুনিক শিক্ষাভিমানীদের এই অযৌক্তিক 'যুক্তিবাদে'র সবচাইতে বেশি প্রমাণ পাওয়া যায় ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে। কারণ এই বিষয়টির আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তির সাথে পাশ্চাত্য মতবাদগুলো প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিবাদমান।

এ কথার সত্যতা প্রমাণ করতে হলে কোনো ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কোনো ধর্মীয় ব্যাপারে আলাপ করুন এবং তার মানসিক অবস্থা যাচাই করার জন্যে তার কাছ থেকে মুসলমান হবার স্বীকৃতি আদায় করুন। অতপর তার সামনে শরীয়তের কোনো নির্দেশ উপস্থাপিত করে তার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে দেখুন। অমনি ভদ্রলোক গা ঝাড়া দিয়ে উঠবেন এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার ভঙ্গিতে বলবেন ঃ 'এতো হচ্ছে নেহাত 'মোল্লাপনা' আমার কাছে যুক্তি-প্রমাণ নিয়ে এসো। নিছক বর্ণনা বা উদ্ধৃতি ছাড়া তোমার কাছে যদি যুক্তি-প্রমাণ না থাকে তো তোমার কোনো কথাই আমি স্বীকার করবোনা।' ব্যাস, এই ক'টি কথা থেকেই এ রহস্যটি প্রকাশ হয়ে পড়বে যে, ভদ্রলোককে যুক্তিবাদের হাওয়া পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। কোন ব্যাপারে যুক্তি-প্রমাণ দাবি করার বুদ্ধিবৃত্তিক পরিণাম কি দাড়ায় এবং দাবিদার ব্যক্তির সঠিক মর্যাদা কি হয়, দীর্ঘদিনের শিক্ষা-দিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনের পরও বেচারা এটুকু উপলব্ধি করতে পারেনি।

ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়ত মানুষের দু'টি মর্যাদাই হতে পারে : হয় সে মুসলমান হবে, নচেত অমুসলমান বা কাফির হবে। মুসলমান হলে তার অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে সে মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে। সে এই স্বীকৃতিও দিয়েছে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর রসূল যে নির্দেশই পৌছাবেন, বিনা বাক্যব্যয়ে সে তাঁর আনুগত্য করবে। এমতাবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি বিধানের সমর্থনে যুক্তি-প্রমাণ দাবি করার তার আর অধিকার থাকেনা। মুসলিম হিসেবে তার কাজ হচ্ছে – রসূলে খোদা কোনো বিশেষ নির্দেশ দান করছেন কিনা, শুধু তা-ই অন্বেষণ করা। অত:পর প্রথাগত যৌক্তিকতা দ্বারা কোনো নির্দেশ সপ্রমাণিত না হলেও সঙ্গে সঙ্গেই তার আনুগত্য করা উচিত। অবশ্য মানসিক প্রশান্তি ও দূরদৃষ্টি লাভের জন্যে সে যুক্তি-প্রমাণ দাবি করতে পারে। কিন্তু এ দাবি কেবল তখনই করা যেতে পারে, যখন সে নির্দেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত হবে। কিন্তু আনুগত্যের পূর্বশর্ত হিসেবে যুক্তি-প্রমাণ দাবি করা এবং যুক্তি-প্রমাণ না পেলে বা মানসিক প্রশান্তি লাভ না করলে আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের অর্থ হচ্ছে এই যে, মূলত সে রসূলে খোদার কর্তৃত্বই অস্বীকার করছে আর এই অস্বীকৃতি হচ্ছে কুফরীর নামান্তর। অথচ প্রথমে সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করেছিল। এখন যদি সে কাফিরের ভূমিকা গ্রহণ করে তো তার যথার্থ স্থান ইসলামের সীমার মধ্যে নয়; বরং তার বাইরে। প্রথমত যে ধর্মের প্রতি তার আদপেই বিশ্বাস নেই, তা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মতো সৎ সাহস তার মধ্যে থাকা উচিত। এরপরই সে যুক্তি-প্রমাণ দাবি করার মতো যোগ্যতা অর্জন করবে এবং সে দাবির জবাবও দেয়া যাবে।

এই হচ্ছে সুস্থ বিচার-বুদ্ধিসম্মত নিয়ম। এছাড়া দুনিয়ার কোনো বিধি ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনা। কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যদি প্রতিটি সরকারি আদেশেরই যৌক্তিকতা দাবি করে এবং যুক্তি ছাড়া আদেশ পালন করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে সে রাষ্ট্র এক মুহূর্তের জন্যেও টিকে থাকতে পারেনা। কোনো সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিকই যদি সেনাধ্যক্ষের প্রদত্ত আদেশের হেতু

জিজ্ঞেস করে এবং প্রতিটি ব্যাপারেই নিজের মানসিক স্বস্তিকে আনুগত্যের জন্যে পূর্বশর্ত হিসেবে পেশ করে, তাহলে মূলত কোনো সেনাবাহিনীই গড়ে উঠতে পারেনা। ফলকথা, প্রতিটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে এবং প্রতিটি ব্যক্তি স্বস্তিলাভ না করা পর্যন্ত কোনো নির্দেশ পালন করবেনা – এই নীতির ভিত্তিতে কোনো স্কুল, কলেজ, সমিতি, এককথায় কোনে সামাজিক ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। মানুষ সাধারণত এই প্রাথমিক ও মৌলিক ধারণা নিয়েই কোনো প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয় যে, সেই প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর ক্ষমতার প্রতি তার সর্বতোভাবে বিশ্বাস রয়েছে এবং তার কর্তৃত্বকে সে স্বীকার করে। অতপর যতোক্ষণ সে এই প্রতিষ্ঠানের অংশ থাকবে, ততোক্ষণ উচ্চতর ক্ষমতার আদেশ পালন তার জন্যে কর্তব্য – কোনো ছোটখাট ব্যাপারে সে সন্তুষ্ট হতে না পারলেও আদেশ পালন করা তার অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য অপরাধী হিসেবে কোনো নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করা ভিন্নকথা। ছোটখাট ব্যাপারে অবাধ্যতা করেও এক ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে; কিন্তু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও কেউ ব্যক্তিগত সন্তুষ্টিকে আনুগত্যের জন্যে পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করলে বুঝতে হবে, সে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব মানতেই অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। এ হচ্ছে সুস্পষ্ট বিদ্রোহেরই শামিল। কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে এমনি কর্মনীতি অবলম্বিত হলে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করা হবে। কোনো সেনাবাহিনীতে এরূপ করা হলে তার বিরুদ্ধে কোর্টমার্শাল করা হবে। কোনো স্কুল কলেজে এরূপ ঘটলে তৎক্ষণাৎ তাকে বহিস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। আর ধর্মের মধ্যে এমন করা হলে কুফরীর ফতোয়া জারি করা হবে। কারণ কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণ দাবির অধিকার কাউকে দেয়া যেতে পারেনা। এমন দাবিদারের প্রকৃত স্থান ভিতরে নয়; বরং তার বাইরে। কাজেই প্রথমত তার বাইরে চলে যাওয়াই উচিত। তারপর সে যতোখুশী আপত্তি বা প্রতিবাদ জানাতে পারে।

ইসলামের সাংগঠনিক ব্যাপারে এটি একটি মূলনীতি বা ভিত্তিতুল্য। ইসলাম প্রথমেই মানুষকে নির্দেশ দেয়নি; বরং প্রথম সে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনার আহবান জানিয়েছে। এই একটি জিনিসের সমর্থনেই সমস্ত যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। প্রতিটি যুক্তিসহ প্রমাণ ও প্রাকৃতিক নিদর্শনের সাহায্যে মানুষকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, এক আল্লাহই তার প্রভু এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল। এই মৌলিক প্রশ্নটি আপনি যতোখুশী যুক্তিতর্ক দ্বারা যাচাই পরখ করে দেখতে পারেন। কোনো যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হতে না পারলে ইসলাম গ্রহণে কখনোই আপনাকে বাধ্য করা হবেনা। আপনার প্রতি ইসলামের কোনো বিধি ব্যবস্থাও প্রয়োগ করা হবেনা। কিন্তু যেইমাত্র আপনি স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করলেন, অমনি আপনি একজন 'মুসলমান' হয়ে গেলেন। আর মুসলমান শব্দের অর্থই হচ্ছে অনুগত। অতপর ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ সম্পর্কে আপনাকে যুক্তি প্রমাণ দেখানো এবং নির্দেশ পালনের ব্যাপারটি আপনার মানসিক প্রশান্তির ওপর ছেড়ে দেয়ার

কোনোই প্রয়োজন নেই; রবং আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ থেকে যে নির্দেশই আপনার কাছে পৌছানো হবে, বিনা বাক্য ব্যয়ে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই হচ্ছে মুসলিম হিসেবে আপনার সর্বপ্রথম কর্তব্য ঃ

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا .

অর্থ ঃ ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তাদেরকে যখন আল্লাহ ও রসূলের দিকে ডাকা হবে – যাতে করে রসূল তাদের মধ্যে ফয়সালা করতে পারেন – তখন তারা বলবে, 'আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।' (সূরা আন নূর ঃ ৫১)

বস্তুত ঈমান এবং আনুগত্যের শর্তস্বরূপ যুক্তি প্রমাণের দাবি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী জিনিস। এই দুটি জিনিসের সমন্বয় একেবারে সুস্থ বিচার বুদ্ধির পরিপন্থি। কোনো মুমিন এভাবে যুক্তি প্রমাণের দাবিদার হতে পারেনা। পক্ষান্তরে এই ধরণের কোনো যুক্তিবাদীর পক্ষেও মুমিন হওয়া সম্ভব নয় ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ .

অর্থ ঃ যখন আল্লাহ ও রসূল কোনো ব্যাপারে ফয়সালা করে দেন, তখন মুমিন নরনারীর পক্ষে নিজেদের ব্যাপারে কোনো স্বতন্ত্র ফয়সালা করার কোনোই অধিকার নেই।' (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

সংস্কার ও সংগঠনের ক্ষেত্রে ইসলাম যে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলো তার মূলে ছিলো এই নীতিটির প্রত্যক্ষ প্রভাব। লোকদের মনে ঈমানী ভাবধারা বদ্ধমূল করে দেবার পর যে বিষয়ে বারণ করা হয়েছে, গোটা ঈমানদার সমাজই তার থেকে বিরত রয়েছেন। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে, একটিমাত্র ইঙ্গিতেই তা লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি ব্যাপারেই যদি যুক্তি প্রমাণ পেশ করা জরুরী হতো এবং প্রতিটি বিধি নিষেধেরই যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য বুঝানোর ওপর আইনানুবর্তিতা নির্ভরশীল হতো, তাহলে মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে রসূলে করীম স. মানব চরিত্র ও আচরণের যে সংশোধন ও সংগঠন করেছিলেন, তা কিয়ামত পর্যন্তও সম্ভব হতোনা।

এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামের বিধি ব্যবস্থাগুলো যুক্তি বিরোধী কিংবা তার কোনো খুঁটিনাটি বিধানও তাৎপর্যহীন। এর অর্থ এ-ও নয় যে, ইসলাম তার অনুগামীদের কাছে অন্ধ তকলিদ দাবি করে এবং তার বিধি ব্যবস্থার যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক ভিত্তি অনুসন্ধান করতে এবং সেগুলোর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে বারণ করে। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এর বিপরীত। ইসলামকে যথার্থভাবে অনুসরণ করতে হলে প্রখর মণীষা ও বিচক্ষণতার একান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি ইসলামী বিধি-ব্যবস্থার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা যতো গভীরভাবে উপলব্ধি করবে, সে ততোখানি নিখুঁতভাবে তা অনুসরণ করতে পারবে। এমনি ধরনের বুৎপত্তি ও

দূরদৃষ্টিতে ইসলাম বারণ করেনা; বরং এজন্যে উৎসাহ প্রদান করে। কিন্তু আনুগত্য প্রকাশের পরবর্তী বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসা আর আনুগত্যের পূর্ববর্তী শর্তরূপ বিচার বিবেচনার মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য রয়েছে। মুসলমান সর্বপ্রথম শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশ করে। অতপর সে ইসলামী বিধি ব্যবস্থার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা উপলব্ধি করার প্রয়াস পায়। কিন্তু তাই বলে প্রতিটি বিধানের যৌক্তিকতাই তার বোধগম্য হবে, এমন কোনো কথা নেই। প্রকৃতপক্ষে তার তো আল্লাহর প্রভুত্ব এবং রসূলের নবুওয়াতের প্রতিই পূর্ণ আস্থা ও সন্তুষ্টি রয়েছে। এরপর পূর্ণ দূরদৃষ্টি লাভ করার জন্যে সে খুঁটিনাটি বিষয়েও অধিকতর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। এমনই সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; কিন্তু অর্জন করতে না পারলে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টির ভিত্তিতে নির্দ্বিধায় সে ইসলামী বিধি ব্যবস্থার আনুগত্য করে যায়। যে ব্যক্তি প্রতি পদক্ষেপেই যুক্তি প্রমাণ দাবি করে বলে যে, 'আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তবেই আমি এগোবো, নচেত পিছনেই হটবো' – তার সঙ্গে এই ধরনের যুক্তি প্রমাণ দাবির তুলনা কোথায়!

ইদানিং কোনো মুসলিম দলের তরফ থেকে প্রকাশিত একটি প্রচারপত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ দলটি উচ্চশিক্ষিত মুসলমানদের সমন্বয়ে গঠিত। দলের লোকেরা ধর্ম বিরোধীও নয়; বরং নিজেদের ধারণায় তারা ধর্মের বিরাট খেদমত করে চলছে। এরা ধর্মীয় 'সংস্কারের' নামে যেসব বিষয়বস্তু প্রচার করে থাকে, তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, প্রতি বছর বকরা ঈদের সময় মুসলমানদেরকে কুরবানী করতে বারণ করা। সেই সঙ্গে এরা মুসলমানদেরকে এই মর্মে পরামর্শও দেয় যে, পশু জবাই করার জন্যে যে অর্থ তারা ব্যয় করেন, তা জাতীয় প্রতিষ্ঠানাদির সাহায্য, ইয়াতীম ও বিধবাদের প্রতিপালন এবং বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের জন্যে ব্যয় করা উচিত। এই প্রচারণা সম্পর্কে জনৈক মুসলমান যে আপত্তি জানিয়েছিলেন তার পূর্ণ বিবরণ আমাদের হস্তগত হয়নি। কিন্তু তাঁর সেই আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে ঃ

কেবল আচার পালন আর অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আজ পর্যন্ত কুরবানীর যুক্তিযুক্ত ও ব্যবহারিক উপকারিতার প্রতি কেউ আলোকপাত করেনি। ... কেউ যদি কুরবানীর যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন, তাহলে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

যারা নিজেদেরকে 'শিক্ষিত' এবং 'আলোকপ্রাপ্ত বলে দাবি করেন, এই হচ্ছে তাদের লেখার নমুনা। একদিকে 'যুক্তিবাদের' উচ্চকণ্ঠ দাবি অন্যদিকে 'অযৌক্তিকতা'র এমনি পরাকাষ্ঠা! ব্যক্তি বিশেষের 'পবিত্র লেখনী' নিসৃত এই দুটি বাক্যই এটা প্রমাণ করছে যে, নিজের সঠিক ভূমিকাটাই তিনি নির্ধারণ করেননি। তিনি যদি মুসলিম হিসেবে কথা বলতে চান তো 'আচারে'র সামনেই তার মাথা নতো করা উচিত। এরপরই তিনি যুক্তি প্রমাণ দাবির অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু তাও আনুগত্যের শর্ত হিসেবে নয়; বরং শুধু মানসিক তুষ্টির জন্যে। কিন্তু তিনি যদি আনুগত্য প্রকাশের আগেই যুক্তি প্রমাণের দাবিদার হন

এবং এটা তার আনুগত্যের শর্ত হয়, তবে তিনি 'মুসলিম' হিসেবে কথা বলারই অধিকারী নন। এ ধরনের যুক্তির দাবিদারের প্রথমেই কোনো অমুসলিমের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত। তার পরই তিনি যে কোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবে আপত্তি তুলবার অধিকারী হবেন। কিন্তু তাই বলে মুসলমানদের কোনো ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো 'মুফতী' সেজে ফতোয়া জারি করার কোনো অধিকার তার থাকবেনা। তিনি একই সময় দুটি পরস্পর বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করছেন, অথচ একটি ভূমিকারও বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্ব পালন করছেননা। একদিকে তিনি শুধু 'মুসলমান'ই নন; বরং 'ইসলামের মুফতি' পর্যন্ত সেজেছেন, অন্যদিকে তিনিই আবার প্রামাণ্য আচার'কে অনর্থক মনে করছেন। কোনো নির্দেশকে প্রামাণ্য 'আচারের' সাহায্যে নির্দেশ প্রমাণ করে দিলে তার আনুগত্য করতে তিনি অস্বীকৃতি জানান; এবং প্রথমেই সে নির্দেশের যৌক্তিকতা ও ব্যবহারিক উপকারিতার প্রতি আলোকপাত করার জন্যে শর্ত পেশ করেন। অন্য কথায়, কোনো আদেশ শুধু আল্লাহ ও রসূলের আদেশ বলেই তিনি মানতে প্রস্তুত নন; বরং যৌক্তিকতা ও ব্যবহারিক উপকারিতার ভিত্তিতেই তিনি তা মানবেন। এ ধরনের উপকারিতা যদি তিনি উপলব্ধি করতে না পারেন, কিংবা তাঁর মাপকাঠিতে তা উপকারী প্রতিপন্ন না হয়, তাহলে তিনি খোদায়ী বিধানকে বাতিল করে দেবেন – তার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাবেন! তাকে 'অবান্তর', 'নিরর্থক', 'বাহুল্য' বরং ক্ষতিকর এবং অপচয়মূলক প্রথা বলে অভিহিত করবেন! শুধু তাই নয়, এর অনুসৃতি থেকে মুসলমানদের বিরত রাখার জন্যে নিজের সর্বশক্তি পর্যন্ত নিয়োগ করবেন! এহেন স্ববিরোধী আচরণ ও পরস্পর বিরোধী ভূমিকাকে কি কেউ বিবেক বুদ্ধিসম্মত মনে করতে পারে? লেখকপ্রবরের যুক্তি প্রমাণের দাবি ন্যায়সঙ্গত, সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি নিজেই যে বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন লোক, পয়লা এটা তো প্রমাণ করুন।

যুক্তিগত ও অভিজ্ঞতাজাত উপকারিতা কোনো একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট জিনিসের নাম নয়; বরং এ হচ্ছে একটি আপেক্ষিক ও গুণবাচক জিনিস। এক ব্যক্তির বিচার বুদ্ধি একটা জিনিসকে উপকারী মনে করে, আবার অন্য ব্যক্তির বিচার বুদ্ধি তার বিরোধী মত পোষণ করে। তৃতীয় ব্যক্তি তার কিছুটা উপকারিতা স্বীকার করে বটে, কিন্তু তার প্রতি মোটেই গুরুত্ব প্রদান করেনা; বরং একটা ভিন্ন জিনিসকে তার চাইতেও বেশি উপকারী মনে করে। অভিজ্ঞতাজাত উপকারিতার প্রশ্নে এর চাইতেও বেশি মতবিরোধ রয়েছে। কারণ উপকারিতা সম্পর্কে প্রত্যেকের ধারণাই আলাদা। সেই ধারণা অনুসারেই প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কিংবা অন্যের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনো জিনিসকে উপকারী বা অপকারী বলে সাব্যস্ত করে। এক ব্যক্তির কাছে আপাত লাভই শুধু কাম্য এবং আপাত ক্ষতিই পরিহারযোগ্য। তার পসন্দ একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের পসন্দ থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। আবার বহুতরো জিনিসের মধ্যেই এক রকমের উপকার এবং অন্য রকমের অপকার রয়েছে। এক ব্যক্তি উপকারের তুলনায় অপকারকে তুচ্ছ মনে করেই ঐ জিনিসগুলো গ্রহণ করে, আবার অন্য ব্যক্তি উপকারের চাইতে অপকারের পরিমাণ বেশি মনে করে ঐগুলো পরিহার করে চলে।

পরন্তু যুক্তিযুক্ত ও অভিজ্ঞতাজাত উপকারের ক্ষেত্রে কখনো কখনো বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। অভিজ্ঞতার দিক থেকে একটা জিনিস হয়তো ক্ষতিকর; কিন্তু বিচার বুদ্ধির ফয়সালা অনুযায়ী কোনো বড় রকমের যুক্তিসহ উপকারিতার খাতিরে এই অনিষ্টকে বরদাশত করা উচিত। অন্য একটা জিনিস অভিজ্ঞতার দিক থেকে উপকারী বটে কিন্তু বিবেকের নির্দেশ অনুসারে কোনো যুক্তিযুক্ত উপকার থেকে বাঁচবার জন্যে তাকে পরিহার করাই কর্তব্য। এই ধরনের বিরোধ বা সংঘাত বর্তমান থাকতে কোনো জিনিসের 'যুক্তিযুক্ত' ও অভিজ্ঞতাজাত' উপকারিতা সম্পর্কে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই সম্ভব নয়। আর কোনো জিনিসের উপকারিতা সম্পর্কে সবাই ঐক্যমত পোষণ করবে এবং কারো ভিন্ন মত পোষণ কিংবা অস্বীকার জ্ঞাপনের কোনো সুযোগই থাকবেনা, এ-ও এক অসম্ভব ব্যাপার। কেবল এক কুরবানীর প্রসঙ্গ কেন – নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং অন্যান্য শরয়ী আদেশ নিষেধের মধ্যে কোনো জিনিসের যৌক্তিকতা ও অভিজ্ঞতাজাত উপকারিতা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে উঠেছে এবং সমস্ত মানুষ কি কি বুঝে শুনে তার আনুগত্য স্বীকার করেছে? তাই যদি হতো, তবে নামায রোযা বর্জনকারী এবং হজ্জ ও যাকাতে অবিশ্বাসী একটি লোকও দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যেতোনা। এই কারণেই বিধি ব্যবস্থা প্রতিটি ব্যক্তির বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং তার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান ও আনুগত্য। মুসলমান কখনো যৌক্তিকতা ও অভিজ্ঞতাজাত উপকারিতার প্রতি ঈমান পোষণ করেনা; বরং তার ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি। তার ধর্ম এই নয় যে, কোনো জিনিসের প্রতি যৌক্তিকতা ও উপযোগিতা প্রতিপন্ন হলে তবেই তাকে গ্রহণ করা যাবে এবং কোনো জিনিসের অযৌক্তিকতা ও অনুপযোগিতা প্রতিভাত হলেই তা পরিহার করতে হবে। বরং তার ধর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ বলে যা প্রমাণিত, তা অবশ্য পালনীয় আর যা প্রামাণ্য নয় তা পালনেরও যোগ্য নয়।

কাজেই লেখকের ঈমান কি যৌক্তিকতা ও উপকারিতার ওপর, না আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি – এটাই হচ্ছে এখানকার আসল প্রশ্ন। প্রথমটি যদি সত্য হয় তো ইসলামের সাথে তাঁর কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। কাজেই তাঁর মুসলমান সেজে কথা বলবার এবং জনসাধারণকে 'মরুভূমির তথাকথিত সুন্নত' পরিহার করবার পরামর্শ দানের কি অধিকার রয়েছে? আর যদি দ্বিতীয়টি সত্য হয় তো যৌক্তিকতা ও উপযোগিতাকে আলোচনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ না করাই উচিত। বরং তার এই প্রশ্ন করা উচিত যে, কুরবানি কি শুধু মুসলমানদের মনগড়া একটি প্রথামাত্র? নাকি আল্লাহ্ ও রসূলের মনোনীত একটি ইবাদত – যা খোদ আল্লাহ্র রসূলই তাঁর উম্মতের মধ্যে প্রবর্তন করেছেন?

❖ ❖ ❖

১০

প্রগতিবাদের ফাঁকাবুলি*

১৯৩৩ সালের জুন সংখ্যা 'নিগার' পত্রিকায় জনাব নিয়াজ ফতেহ্পুরী আমার সম্পাদিত 'তর্জুমানুল কুরআন' সম্পর্কে এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেছেন। এজন্যে আমি জনাব ফতেহ্পুরীর শুকরিয়া আদায় করি। সাধারণত পত্র পত্রিকার সমালোচনা সম্পর্কে বাদানুবাদ কিংবা পাল্টা সমালোচনা করা রীতিসম্মত নয়। কিন্তু যোগ্য সমালোচক তাঁর নিবন্ধটিতে এমন কতকগুলো মতামত প্রকাশ করেছেন, যা তাঁর প্রগতি-ধর্মের বিশিষ্ট মূলনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত; আর এই সমস্ত মূলনীতির সংশোধন করাই তর্জুমানুল কুরআনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ কারণেই আমি এ সম্পর্কে আমার নিজস্ব মতামত প্রকাশের এই প্রথম সুযোগের সদ্ব্যবহার করা একান্ত জরুরি বোধ করছি। তিনি লিখেছেন ঃ

> এই পত্রিকার উদ্দেশ্য এর নাম থেকেই প্রতিভাত হয় – অর্থাৎ কুরআনের অর্থ, তাৎপর্য ও শিক্ষাকে সঠিকরূপে লোকদের মধ্যে প্রচার করা। নিসন্দেহে এই উদ্দেশ্যের উপযোগিতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। কিন্তু যোগ্য সম্পাদক নিজেই যেমন স্বীকার করেছেন, বর্তমান যুগে এই লক্ষ্য অর্জনটা মোটেই সহজসাধ্য নয়। কারণ, অতীতকালে ধর্ম বলতে শুধু পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকৃতি ও পশ্চাৎমুখী ক্রিয়াকলাপকেই বুঝাতো। তখন কারো পক্ষে ধর্ম প্রচারক বা সংস্কারক সাজা মোটেই কঠিন ব্যাপার ছিলোনা। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া মানুষের 'চিন্তা ও কর্ম'কে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দান করছে – তার মনমগজকে 'চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা' দ্বারা সমৃদ্ধ করে দিয়েছে। কাজেই আজকে শুধু পূর্ব পুরুষদের আচরণ, কর্মনীতি ও চিন্তাধারার প্রমাণ দেখিয়েই ধর্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। পূর্বে হয়তো আল্লাহ্র একত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনা বা তর্কবিতর্ক করা হতো; কিন্তু আজকে আল্লাহ্র অস্তিত্বকেই একেবারে অসম্ভব মনে করা হচ্ছে। আগেকার দিনে রসূল সা.-এর পথনির্দেশকে হয়তো মুজিযার সাহায্যে প্রমাণ করা যেতো, আর আজকে সেই মুজিযার ভিত্তিতেই 'চুম্বক বিজ্ঞান' বেশুমার নবী ও রসূল সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছে। অতীতে একজন বক্তা আসমানের দিকে তাকিয়ে আরশ ও কুর্সিবিশিষ্ট আল্লাহ্কে ডাকতে পারতো; কিন্তু আজকে আসমান নামক কোনো জিনিসেরই অস্তিত্ব

---

* প্রবন্ধটি ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। – সম্পাদক

নেই। এমতাবস্থায় কেউ এ ধরনের কাজ করলে তা মোটেই কল্যাণকর হতে পারেনা। ফলকথা, এখন আর 'গায়েবের প্রতি ঈমানে'র দিন নেই, এখন তো অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের প্রতি ঈমানের দিন এসেছে। এমনি সঙ্কটজনক সময়ে ধর্মের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা মোটেই সহজ কাজ নয়। বিশেষত আজকে ধর্মের ধারনাই লোকদের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্য নয় বলে কাজটা আরো কঠিন মনে হয়।

সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি আরো লিখেছেন ঃ

কুরআনপাক তার অর্থের দিক থেকে তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নৈতিক শিক্ষা প্রদত্ত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে বিবৃত হয়েছে আকীদা বিশ্বাস। আর তৃতীয় ভাগে রয়েছে ঐতিহাসিক কাহিনী ও উদাহরণ। পথম ভাগ সম্পর্কে বেশিকিছু লিখবার প্রয়োজন নেই – এ সম্পর্কে কোনো দলিল প্রমাণ উপস্থিত করারও আবশ্যকতা নেই। কারণ সকল ধর্মের নীতিশাস্ত্রই প্রায় এক অভিন্ন। আর প্রত্যেকেই একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইসলামের নীতিশাস্ত্র অন্যান্য ধর্মের নীতিশাস্ত্র থেকে ভিন্ন ও নিম্নমানের নয়। অবশ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের প্রতি বেশি আলোকপাত করা উচিত। কারণ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া এই দু'ভাগ সম্পর্কে লোকদের মনে সন্দেহ ও দ্বৈধ্যবোধের সৃষ্টি করে দিয়েছে। আর সত্য বলতে কি, এসব শোবা-সন্দেহ কেউ নিরসন করতে সক্ষম হলে তিনি বর্তমান শতকের মুজাদ্দিদ বলে সাব্যস্ত হবেন। এ কারণেই আমি এ সম্পর্কে একটি স্থায়ী বিভাগ খুলবার পরামর্শ দেবো। এই বিভাগের মাধ্যমে আকীদা বিশ্বাস ও আখ্যান সম্পর্কিত তামাম কুরআনী আয়াতের পর্যালোচনা করা উচিত। অতপর এসব আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নিধারণ করে আধুনিক পণ্ডিত ও গবেষকদের তরফ থেকে উত্থাপিত যাবতীয় আপত্তি ও প্রতিবাদ খণ্ডন করা আবশ্যক।

উপসংহারে তিনি লিখছেন ঃ

আগামীতে আমি সর্বপ্রথম ওহী ও ইলহামের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করতে তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ এই জিনিসটি উপলব্ধি করার ওপরই কালামুল্লাহ্‌র মর্মোপলব্ধি নির্ভরশীল। সেই সঙ্গে আখিরাত সম্পর্কিত প্রশ্নটিও আলোচিত হওয়া উচিত। কারণ এর মীমাংসার ওপরই ধার্মিকতা ও অধার্মিকতার প্রশ্ন নির্ভর করে। তিনি কালামে ইলাহী এবং আখিরাত সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাই আমি দেখতে চাই। তারপরই আমার শোবা-সন্দেহ এবং আপত্তিগুলো উত্থাপন করবো তাঁর প্রচেষ্টায় সেগুলো দূরীভূত হলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হবো। কারণ বর্তমানে অনেকেই 'দায়ে ঠেকে মুসলমান সাজা'র নিদারুণ অভিশাপে জর্জরিত। এর একটি বিরাট কারণ হচ্ছে পরকাল বিশ্বাস।

এই উদ্ধৃতিতে যোগ্য সমালোচক যেসব খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, সেগুলো বাদ দিয়ে আমি শুধু মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতিই আলোকপাত করতে চাই।

তিনি কুরআন মজিদের আলোচনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু আমরা তাকে অনায়াসেই দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি। এর প্রথম ভাগের বিষয়বস্তু হচ্ছে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতার সীমাবহির্ভূত। এর কোনো একটি বিষয়কেই আমরা চূড়ান্তভাবে ভুল বা নির্ভুল আখ্যা দিতে পারিনা। তাই এগুলোর ব্যাপারে কুরআন আমাদেরকে গায়েবের প্রতি ঈমান পোষণের আহ্বান জানায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষয়গুলো আমাদের জ্ঞান সীমার বহির্ভূত নয় এবং এগুলো সম্পর্কে কোনো যুক্তিসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর। এই হিসেবে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও গুণরাজি, ফেরেশতা, ওহী, খোদায়ী কিতাব, নবুয়াতের তাৎপর্য, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন, পারলৌকিক শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাদি বিষয়াদি ছাড়াও ঐতিহাসিক কাহিনী ও উদাহরণ প্রসঙ্গে বর্ণিত এবং জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতার সীমাবহির্ভূত সমস্ত বিষয়ই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়গুলো সাধারণ মানবীয় বিচার ক্ষমতার সীমাবহির্ভূত হোক কিংবা বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তির ও বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে এগুলোর সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের অক্ষমতাই হোক, তাতে কিছু যায় আসেনা। পক্ষান্তরে ইসলামের নীতিশিক্ষা, আত্মশুদ্ধি এবং মানবীয় জীবন পদ্ধতি সম্পর্কিত তামাম বিষয়ই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

যোগ্য সমালোচকের মতে, দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করারই কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা অন্যান্য ধর্মেরই অনুরূপ। অবশ্য তার মতে প্রথম ভাগটি সম্পর্কে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর সম্পর্কেই লোকদের মনে সন্দেহ ও দ্বৈধবোধের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে কেন সন্দেহ ও দ্বৈধবোধের সৃষ্টি হচ্ছে? এর জবাবে তিনি বলেছেন, অতীতকালে পশ্চাৎমুখিতা ও অজ্ঞতার কারণে লোকেরা গায়েবী বিষয়ের প্রতি ঈমান পোষণ করতো। কিন্তু আজকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনী মানুষের চিন্তা ও কর্মকে নতুন রূপদান করেছে – চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা দ্বারা তার মনমগজকে সমৃদ্ধ করে দিয়েছে। এ কারণেই এখন আর 'গায়েবের প্রতি ঈমানের'র দিন নেই, বরং তার পরিবর্তে 'অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের প্রতি ঈমান' পোষণের দিন এসেছে।'

এই অভিমতটি কয়েকটি ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে প্রথম ভ্রান্তি হচ্ছে অতীত ও বর্তমানকালের মধ্যকার আসল পার্থক্যটা উপলব্ধি না করা। দুর্ভাগ্যবশত জনাব নিয়াজ কেবল একাই নন; বরং একটি বিরাট দল এই ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত যে, ধর্মের প্রদীপ শুধু বিগত যুগের অন্ধকারেই আলো বিকীরণ করতে পারতো; কিন্তু আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সূর্যোদয়ের পর তার পক্ষে আর দীপ্তিমান হওয়া সম্ভবপর নয়। অথচ যে যুক্তি বিজ্ঞানকে এরা আলোকরশ্মি বলে

অভিহিত করেছেন তা এ যুগের কোনো নিজস্ব সম্পদ নয়। এসকল জ্ঞান বিজ্ঞান অতীতকালেও লোকদের দৃষ্টিশক্তিকে এভাবেই ঝলসে দিয়েছে। আর অতীতকালেও যাদের দৃষ্টি ঝলসে গিয়েছিলো, তারাও এটাই ভেবেছিলো যে, ধর্মের প্রদীপ এখন দীপ্তিমান থাকতে পারেনা। তখনকার দিনের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও তাদের মতে চিন্তা ও কর্মকে নতুন রূপদান করেছিলো এবং তা চিন্তা ও বিবেকের যুক্তি দ্বারা লোকদের মন মগজকে এমনি সুসমৃদ্ধ করে দিয়েছিলো যে, তাদের সেই আলোকজ্জল যুগে গায়েবের প্রতি ঈমান পোষণের কোনো অবকাশই ছিলোনা। হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত কি এই অবস্থাই বিরাজমান ছিলোনা? প্লেটো, এরিস্টটল, এপিকোরাস, জিনো, বার্কলাস, আলেকজান্ডার,* ফিরদৌসী, প্লাটিনোস প্রমুখ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা যখন মুসলিম দেশগুলোতে প্রচারিত হলো এবং তার ফলে দার্শনিক চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অন্বেষার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হলো, তখনো কি একদল লোক এরূপ ধারণাই পোষণ করতোনা? তখনকার দিনের চিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি এবং আচরণও ধারণার নতুন রূপ কি এভাবেই লোকদের ধর্মবিশ্বাসে সন্দেহ ও দ্বৈধবোধের সৃষ্টি করেনি? কিন্তু তারপর কি হয়েছিল? দার্শনিকদের যেসব মতবাদ ও আনুমানিক সিদ্ধান্তের প্রতি তখনকার লোকেরা বিশ্বাস স্থাপন করেছিলো, পরবর্তীকালে তার অনেকগুলোই মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। জ্ঞান বিজ্ঞানের যে তীব্র সূর্যালোকে ধর্মের প্রদীপকে তাঁদের নিবু নিবু মনে হচ্ছিলো, যুগের একটি আবর্তনেই তা একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেলো। তাদের 'আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান' সেকেলে বস্তুতে পরিণত হলো। তাদের নব নব 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার' চিন্তা ও কর্মকে নবরূপ দানের শক্তি হারিয়ে ফেললো। যেসব ক্ষেত্রে তাঁরা নতুন রূপ দান করেছিলো, তা পুরনো বলে সাব্যস্ত হলো। এমনকি, সমকালীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস ও আস্থা রেখে তারা যেসব যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করেছিলো, এবং সেগুলোর ভিত্তিতে যেসব দার্শনিক মতবাদ দাঁড় করিয়েছিলো তার অধিকাংশকেই আজকের একজন নগণ্য ছাত্রও অর্থহীন ও অকেজো আখ্যা দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেনা।

এমতাবস্থায় কেউ যদি বলে, অতীতের অন্ধকার যুগেই কেবল ধর্মের প্রদীপ জ্বলতে পারতো, কিন্তু আজকের আলোকজ্জ্বল যুগে তা আর জ্বলতে সক্ষম নয়, তাহলে আমরা ভাবতে বাধ্য হবো যে, ইতিহাস নিজেই তার পুনরাবৃত্তি করছে। আজকে যেসব বিষয়কে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবনী বলে অতীতের ন্যায় দাবি জানানো হবে, তার বেশির ভাগই পূর্বেকার লোকদের 'আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান' ও নতুন আবিক্রিয়ার পরিণতি লাভ করবে এবং 'চিন্তা ও কর্মের নব নব রূপ' ও যুগের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ও সেকেলে হয়ে যাবে

---

* এরা প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক। – সম্পাদক

এ ব্যাপারে আমরা সুনিশ্চিত। যে সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ও আবিষ্ক্রিয়ার কারণে সমালোচক গর্ববোধ করেন, সেগুলোর প্রতি তিনি একবার গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করুন এবং ওগুলোর আসল উদ্ভাবক ও আবিষ্কারকদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন, তবেই তিনি বুঝতে পারবেন যে, অতীতের জ্ঞান বিজ্ঞানের ন্যায় এগুলোর মধ্যেও নিশ্চায়ক বস্তু খুব কমই রয়েছে। এসকল জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে এমনি জিনিস প্রায় নেই বললেই চলে, যার সম্পর্কে একথা নিসংশয়চিত্তে বলা যেতে পারে যে, এটির ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। বাকি জিনিসগুলো শুধু অনুমান, কল্পনা, সন্দেহ, মতামত ও দ্বিধা সঙ্কোচের ওপর ভিত্তিশীল। এগুলো সম্পর্কে পূর্ণ দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলা যেতে পারে যে, যুগের গতি যতোই তরক্কীর দিকে এগুতে থাকবে, 'এসব আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান' ও 'নিত্যনতুন আবিষ্ক্রিয়া' ততোই প্রাচীন ও সেকেলে বস্তুতে পরিণত হবে। এবং সেই সঙ্গে এসকল দুর্বল ও ঠুনকো জ্ঞান বিজ্ঞান ও আবিষ্ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল চিন্তা ও কর্মের নতুন পদ্ধতিগুলোও অপর কোনো নতুন পদ্ধতির জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

কাজেই অবস্থা যখন এই, তখন কোনো চেতনাসম্পন্ন ও পরিণত দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের পক্ষেই ধর্মের ভবিষ্যত চিন্তায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। 'আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান' ও 'নতুন আবিষ্কার উদ্ভাবনী' আজ 'চিন্তা ও কর্মের নতুন ভিত্তি রচনা করেছে এবং 'চিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি' দ্বারা লোকদের মন মগজকে সমৃদ্ধ করে দিয়েছে, কাজেই ধর্মের পরিণতি কি দাঁড়াবে, খোদাই জানেন – এমনি দুশ্চিন্তায় আতঙ্কিত হবারও কোনো হেতু নেই। এসব জ্ঞান বিজ্ঞান ও আবিষ্ক্রিয়ার ওপর একবার সন্ধানী দৃষ্টি ফেললেই দেখতে পাবেন যে, ধর্মের সাথে যেসব জিনিসের বিরোধ রয়েছে, তা প্রামাণ্য ও সন্দেহাতীত কি না? তা যদি বাস্তবিকই প্রামাণ্য ও সন্দেহাতীত হয় এবং ধর্মের মৌল বিশ্বাসের সঙ্গে তার বিরোধও দেখা দেয়, তাহলে নি:সন্দেহে তার সামনে এই প্রশ্ন এসে দাঁড়াবে যে, ধর্ম এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই দু'টির কোন্‌টির প্রতি সে ঈমান পোষণ করবে? কিন্তু তা যদি শুধু অনুমান, কল্পনা, সন্দেহ ও দ্বৈধবোধে নিক্ষেপকারী জিনিসই হয়, তাহলে ধর্মের সঙ্গে তার বিরোধে ঘাবড়াবার কিছু নেই। কারণ ধর্ম যদি ঈমান ও প্রত্যয়ের ওপর ভিত্তিশীল হয় তো তার মুকাবিলায় অনুমান, কল্পনা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কোনোই গুরুত্ব নেই। পক্ষান্তরে ধর্ম যদি আনুমানিক ও কাল্পনিক জিনিস হয় তো আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলোও তো এই অনুমান ও কল্পনার ওপর নির্ভরশীল। কাজেই উভয়ের তারতম্য বিচারের আর কি কারণ থাকতে পারে?

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও নিত্য নতুন আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা অভিভূত হয়ে ধর্মের প্রতি সংস্কার দৃষ্টিক্ষেপ করা এমন লোকের পক্ষেই শোভা পায়, যার মনে এই ধারণা

বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে, প্রতিটি নতুন জিনিসই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কাজেই যুগের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে তাকে গ্রহণ করা কিংবা তার প্রতি ঈমান পোষণ করা একান্ত আবশ্যক। এমনকি, তা যদি শুধু আনুমানিক ও কাল্পনিক জিনিসও হয় এবং প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি নিয়ে, নির্ভুল মানদণ্ডে তা যাচাই করা নাও হয়, তবু তা বরণ করতে হবে। বস্তুত এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লোকদের মধ্যেই আজ 'চিন্তা ও কর্মের নতুন পদ্ধতি রচনা'র আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ চিন্তা ও কর্মের নতুন পদ্ধতি কিভাবে রচিত হয়, কোন্ পদ্ধতিটি যুক্তিসম্মত আর কোন্‌টি নিছক বালসুলভ – এই কথাটি পর্যন্ত তারা জানেনা। অনুরূপভাবে চিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ হবার দাবিটাও এই শ্রেণীর স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের একটা বৈশিষ্টে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তারা এতোটুকু অবহিত নয় যে, নিছক চিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি একটা ফিতনা, বরং একটা ভয়ঙ্কর জিনিস। বিশেষত, তার সঙ্গে যদি প্রশস্ত ও পরিপক্ক জ্ঞান, প্রগাঢ় ও পরিণত দৃষ্টি এবং সুষম ও স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির সমাবেশ না ঘটে, তবে তা গুরুতর আকার ধারণ করতে বাধ্য। আর এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আজকাল যেরূপ ধারণা পোষণ করা হয়, প্রকৃতি ততোটা অকৃপণভাবে এগুলো দান করেনি।

প্রথমোক্ত মতবাদটি থেকে যে দ্বিতীয় মতটির সৃষ্টি হয়েছে, তাহলো এই যে, এখন আর 'গায়েবের প্রতি ঈমানে'র যুগ নেই, বরং এটা হচ্ছে 'অভিজ্ঞতা ও পর্যক্ষেণের প্রতি ঈমানে'র দিন। এই কথাগুলো দ্বারা বক্তা আসলে কি বুঝাতে চান, অনেক চিন্তা ভাবনার পরও তা আমার বোধগম্য হয়নি। একথার তাৎপর্য যদি এই হয় যে, বর্তমান যুগের গায়েব বা অদৃশ্য পদবাচ্য কোনো জিনিসকে স্বীকার করা এবং অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ ছাড়া কোনো বস্তুকে গ্রহণ করাই হয়না, তবে তা নিতান্তই ভুল। অন্যকথায় এর তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, বর্তমান যুগের মানুষ এমন একটি সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমিত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, যেখানে কেবল অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণই তাদের জন্যে জ্ঞানার্জনের উপায় হতে পারে এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ই শুধু ক্রিয়াশীল থাকতে সক্ষম। এই পরিধির বহির্ভূত বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা এবং অনুমান অনুসন্ধান মারফত সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কাজ মানুষ পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু যিনি 'আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও নবতর আবিষ্ক্রিয়া' সম্পর্কে মোটামুটি অধ্যয়নও করেছেন, এই ভাষণকে তিনি মোটেই স্বীকার করবেননা। দর্শন ও অতি প্রকৃতিবাদের কথা ছেড়েই দিন, কারণ এ দু'টির গোটা প্রতিপাদ্যই হচ্ছে অদৃশ্য বিষয়। খোদ জড় বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার কথাই ধরুন, কারণ এর ওপর নির্ভর করেই সমালোচকপ্রবর 'অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে'র প্রতি ঈমানের দোহাই পাড়ছেন। এই শাস্ত্রটির কোন বিভাগের গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান শক্তি, এনার্জি, প্রাকৃতিক বিধান, মৌলসূত্র, কার্যকারণ এবং এই ধরনের বিষয়াদির স্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়? কোন

পদার্থ বিজ্ঞানী এগুলোর প্রতি বিশ্বাস করেননা? কিন্তু আপনি কোনো জাদরেল বিজ্ঞানীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, এসবের মধ্যে কোন্‌টির গুঢ় রহস্য তিনি জানেন? কোন্‌ বস্তুর কতোটুকু তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন? কোন্‌টির অস্তিত্ব তিনি প্রত্যক্ষ ও পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন এবং কোন্‌টির সপক্ষে তিনি যথার্থ প্রমাণ পেশ করতে পারেন? বস্তুত এসব কিছুকেই গায়েবের প্রতি ঈমান ছাড়া আর কি বলা চলে?

এ কথাগুলোর দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, বর্তমান যুগে কেবল এমন জিনিসই স্বীকৃত হয়ে থাকে, যা প্রতিটি মানুষের প্রত্যক্ষ করার উপযোগী এবং গোটা মানব সমাজই যা প্রত্যক্ষ ও পর্যবক্ষেণ করেছে। কিন্তু এ ধরনের কথা কোনো বুদ্ধিমান লোকের মুখ দিয়েই নি:সৃত হতে পারেনা। কারণ, একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, কোনো মানুষই ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত মানবীয় জ্ঞানের অধিকারী নয়, বরং তার একটি বড় ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ দল ও ব্যক্তিদের বিশেষত্ব রয়েছে। এই বিশেষ জ্ঞান ভাণ্ডারের প্রতিটি বিভাগ কেবল সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের কাছে প্রত্যক্ষ, আর বাকি সমস্ত মানুষের কাছে অদৃশ্য। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষকে ঐ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও দলের প্রতিই গায়েবী ঈমান পোষণ করতে হয়।

বক্তব্যটির তৃতীয় অর্থ এ-ও হতে পারে যে, এযুগের মানুষ কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ বিষয়কেই স্বীকার করে এবং নিজের কাছে অদৃশ্য কোনো জিনিসকেই তারা বিশ্বাস করেনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর চাইতে অবাস্তব কোনো কথাই মানুষের মগজ থেকে বের হতে পারেনা। কারণ এ ধরনের মানুষ পূর্বে কখনো দুনিয়ায় পাওয়া যায়নি, আজো পাওয়া যাবেনা এবং কিয়ামত অবধি পাওয়া যাবার কোনো সম্ভাবনাও নেই। এমন লোক যদি বাস্তবিকই কোথাও থেকে থাকে তো তাকে খুঁজে বের করতে আদৌ কালবিলম্ব করা উচিত নয়। কারণ 'সাম্প্রতিক আবিষ্ক্রিয়া'র মধ্যে এটিই হবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

ফলকথা, যে কোনো দিক থেকেই উক্তিটিকে বিচার করা যাক না কেন, এর ভেতর সত্যতার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবেনা। খোদ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণই একথার সাক্ষ্য বহন করে যে বর্তমান যুগটিও অতীতের ন্যায়ই অদৃশ্যে বিশ্বাসী আর এই অদৃশ্যে বিশ্বাস থেকে মানুষ কখনো নিষ্কৃতি পেতে পারেনা। প্রতিটি মানুষ হাজারে ৯৯৯ টিরও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অদৃশ্যে বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য। এখন সে যদি কেবল নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপরই ঈমান আনার সিদ্ধান্ত করে বসে তাহলে অন্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যে বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার সে সঞ্চয় করেছিলো, তা সবই তাকে বিসর্জন দিতে হবে। নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ ছাড়া জ্ঞানার্জনের তামাম উপায় ও সূত্রই তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। এমতাবস্থায় দুনিয়ার কোনো কাজ করা তো দূরের কথা, নিজের অস্তিত্বই সে টিকিয়ে রাখতে পারবেনা। বস্তুত অদৃশ্যে বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ

অস্বীকার এবং অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের প্রতি পুরোপুরি নির্ভরতা যেমন এযুগে সম্ভব নয়, তেমনি এর চাইতে উজ্জ্বলতর কোনো যুগেও তার সম্ভাবনা নেই। যে কোনো যুগে এবং যে কোনো অবস্থায় মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ ছাড়াই শুধু অন্যের প্রতি নির্ভর করে বহুতরো বিষয় মেনে নিতে বাধ্য। কতগুলো বিষয় শুধু প্রচলিত ধারণা হিসেবেই মানতে হয়, যেমন সেঁকোবিষ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এই যে, এটি খেলে মানুষ মরে যায়। অথচ এটি ব্যক্তিগতভাবে খেয়ে সবাই পরিক্ষা করে দেখেনি কিংবা কাউকে খেয়ে মরতেও দেখেনি। কতকগুলো বিষয় আবার এক বা একাধিক নির্ভরযোগ্য লোকের বর্ণনার ভিত্তিতেই মানতে হয়। যেমন আদালতের সাক্ষ্য বিশ্বাস না করলে আইনের যন্ত্রটি এক মুহূর্তের জন্যেও চলতে পারেনা। কতগুলো ক্ষেত্রে আবার নিছক একজন পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞের কথা বিশ্বাস করতে হয়। স্কুল কলেজের ছাত্রদের বেলায় তো এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক ব্যাপার। তারা যদি বিভিন্ন শাস্ত্রের পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের গবেষণা, আবিষ্কার ও মতাদর্শের প্রতি অন্ধভাবে বিশ্বাস পোষণ না করে, তবে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক কদমও সামনে এগোতে পারেনা। ফলে ঐ পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের ন্যায় জ্ঞান গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের মতো যোগ্যতাও তারা কখনো অর্জন করতে পারেনা।

এথেকে প্রমাণিত হলো যে, যেসকল ব্যাপারে আমরা অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা জ্ঞানার্জন করিনি, সেসব ক্ষেত্রে অন্য লোকের প্রতি অন্ধভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে আমরা বাধ্য। এখন কোন্ ব্যাপারে কার প্রতি অন্ধভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত – কেবল এই প্রশ্নটিই বাকি থেকে যায় এবং এর ওপরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ নির্ভর করে। নীতিগতভাবে এ কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, যে ব্যাপারে কোনো ব্যক্তি বা দলের ভালো জ্ঞান আছে এবং জ্ঞানার্জনের ভালো উপায়ও করায়ত্ত রয়েছে বলে আমাদের প্রতীতি জন্মাবে সে ব্যাপারে কেবল তার ওপরই বিশ্বাস পোষণ করা উচিত। এই সাধারণ রীতি অনুযায়ী একজন রুগী ডাক্তারের কাছে না গিয়ে আইনজীবীর পরামর্শ গ্রহণ করেনা। মামলা-মোকাদ্দমার ব্যাপারে কেউ আইনজ্ঞ বাদ দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের শরণার্থী হয়না। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মবাদের প্রশ্নেই কেবল এ-ব্যাপারে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। কেবল সেখানেই প্রশ্ন ওঠে এসব ব্যাপারে দার্শনিক ও যুক্তি-বিজ্ঞানীদের মতামত গ্রহণ করা হবে, কি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুদের কথা শোনা হবে? আল্লাহ্, ফিরিশ্তা, ওহী, ইলহাম, আত্মা, পুনরুজ্জীবন এবং পারলৌকিক শাস্তি ও পুরস্কার ইত্যাকার গায়েবী বিষয়ে কি কান্ট, স্পেনসর, আইনেস্টাইন, বেগর্সন প্রমুখের কথা মানা হবে, না ইব্রাহীম আ., মূসা আ., ঈসা আ. ও মুহাম্মদ স. প্রমুখের বক্তব্য শোনা হবে। 'চিন্তা ও বুদ্ধির স্বাধীনতা'র দাবিদারদের মানসিক ঝোঁক প্রথম দলের দিকে। এরা তাদেরই সংগৃহীত মানদণ্ডে নবীদের কথা যাচাই করে চলেছে এবং

এই যাচাইয়ের ফলে যে বিষয়টি উত্তীর্ণ হচ্ছে, সেটিকেই তারা গ্রহণ করছে। সেটিকে তারা নবীদের কথা বলেই স্বীকৃতি দিচ্ছেনা; বরং দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা তার গ্রহণযোগ্যতার সার্টিফিকেট দিয়েছেন বলেই স্বীকার করা হচ্ছে। (দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ধরনের বিষয় নিতান্তই কম, বরং একেবারে নেই বললেই চলে) পক্ষান্তরে যে বিষয়টি এই মানদণ্ডে অনুত্তীর্ণ হয় সেটিকে তারা অনির্ভরযোগ্য বলে নাকচ করে দিচ্ছে। অপরদিকে 'প্রাচীন পন্থী' ও 'গুরুবাদীদে'র বক্তব্য এই যে, প্রকৃতিবাদ ও যুক্তিবাদ সম্পর্কে ধর্মতাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মবাদীদের কাছে প্রশ্ন করোনা, কিংবা ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মবাদের কথা যুক্তিবাদী প্রকৃতিবাদীর কাছে জিজ্ঞেস করোনা। কারণ উভয়ের কর্মক্ষেত্রই সম্পূর্ণ আলাদা বিধায় একটি শাস্ত্র সম্পর্কে অন্য শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞের মতামত জিজ্ঞেস করা মূলতই ভুল। দার্শনিক ও বিজ্ঞানী তাদের নিজ নিজ শাস্ত্রে যতোই পারদর্শী হননা কেন, ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মবাদে তাঁদের মর্যাদা একজন সাধারণ মানুষের চাইতে মোটেই বেশি নয়। কারণ এ সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহের যেটুকু উপায় তাদের করায়ত্ত, একজন সাধারণ লোকেরও ততোটুকু উপায়ই করায়ত্ত। প্রকৃতপক্ষে এ শাস্ত্রটি শুধু নবীদের জন্যেই নির্দিষ্ট। তারাই এ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ। এ সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহের প্রকৃত উপায়ও তাঁদেরই করায়ত্ত। কাজেই এসব ব্যাপারে তাঁদের প্রতিই 'অদৃশ্য বিশ্বাস' পোষণ করা উচিত। এব্যাপারে বড়জোর এইটুকু প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সত্যবাদী এবং ধর্মতত্ত্বে পূর্ণাঙ্গ দূরদৃষ্টির অধিকারী কিনা? কিন্তু যখনি এটা প্রমাণ হয়ে যাবে যে, তাঁরা বাস্তবিকই এ ব্যাপারে যোগ্যতার অধিকারী, তখন স্বকীয় দূরদৃষ্টি ও জ্ঞানানুযায়ী তারা যা কিছু করেছেন, তা সবই আপনাকে সত্য বলে মানতে হবে। তাঁদের প্রচারিত সত্যকে অস্বীকার এবং তার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করা আর অন্ধ কর্তৃক সূর্যের অস্তিত্ব অস্বীকার এবং চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার জন্যে সূর্যের অস্তিত্ব বিরোধী দলিলপত্র পেশ করা একই কথা। এই ধরনের লোক নিজস্ব ধারণায় যতোবড় দার্শনিকই হোক না কেন; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ চোখে সূর্যকে প্রত্যক্ষ করছে, সে-যে এই অন্ধ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করবে, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

সমালোচক হয়তো বলবেন, নবীগণ অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, 'আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান' ও 'সাম্প্রতিক আবিষ্কার উদ্ভাবনী' দ্বারা তা সমর্থিত হয়না। এ কারণেই লোকেরা 'সন্দেহ ও দ্বৈধবোধে' নিক্ষিপ্ত হয়ে 'দায়ে ঠেকে মুসলমান সাজা'র অভিশাপ ভোগ করছে। কিন্তু আমি বলবো, এসব জ্ঞান বিজ্ঞান ও আবিষ্ক্রিয়ার মধ্যেই বা এমন কোন্ নিশ্চয়তাটা রয়েছে, যা ইসলামী নীতির পরিপন্থী? এমন কোনো বিষয় থাকলে তার উল্লেখ করুন – যাতে করে আমরাও ভেবে দেখতে পারি যে, কুরআন শরীফ এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি, এর মধ্যে কোন্‌টি আমরা মেনে চলবো! যদি তা না থাকে – আর তা কিছুতেই থাকতে পারেনা, যেমন আপনার উক্তি 'সন্দেহ ও দ্বৈধবোধ' 'দায়ে ঠেকে মুসলমান

সাজা' ইত্যাদি থেকেও প্রমাণিত হয় – তবে কি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাম্প্রতিক আবিষ্কার উদ্ভাবনীর অস্ত্রাগারে কেবল ধারণা কল্পনা ও আন্দাজ অনুমানের অস্ত্রই মওজুদ রয়েছে, যার ওপর ভরসা করে ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হচ্ছে? এবং সে অস্ত্রের ধারণা দেখে শুধু চাকচিক্য দেখেই 'স্বাধীন চিন্তাধারা'র উপাসকরা এই আশা পোষণ করছেন যে, ধর্ম তার নাম শুনেই ময়দান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে? আপনি ঐ জ্ঞান বিজ্ঞান ও আবিষ্কারাদিকে যতোই গুরুত্ব দিন না কেন, কিন্তু মনে রাখবেন, অদৃশ্য বিষয়াদির ব্যাপারে তা মোটেই নিশ্চয়ক বস্তু নয়। তার প্রভাবে বড়জোর আপনি নিজে 'সন্দেহ ও দ্বৈধবোধে' নিক্ষিপ্ত হতে পারেন এবং বলতে পারেন যে, ওহী, ইলহাম, পূনরুজ্জীবন, পারলৌকিক শাস্তি ও পুরস্কার, ফিরিশতাদের অস্তিত্ব এমনকি আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কেও আমরা ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিনা। কিন্তু আপনাকে 'দায়ে ঠেকে মুসলমান সাজা'র অভিশাপ থেকে মুক্তি কিংবা 'সানন্দে কাফির সাজা'র আশির্বাদ লাভ করবার ব্যাপারে এসব জ্ঞান বিজ্ঞানের পক্ষে কিছু মাত্র সাহায্য করা সম্ভবপর নয়। কারণ উল্লেখিত বিষয়াদিকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করার মতো কোনো যুক্তি প্রমাণ এসকল জ্ঞান বিজ্ঞানে উপস্থিত থাকতে পারেনা। তাছাড়া কোনো জিনিসের অনস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে শুধু এটুকু যুক্তিই যথেষ্ট নয় যে, তার অস্তিত্বের পক্ষে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, 'আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও 'সাম্প্রতিক আবিষ্কারাদি' আপনাকে শুধু 'সন্দেহ ও দ্বৈধবোধে'র চরম পর্যায়ে নিয়েই পৌঁছিয়ে দিচ্ছে আর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে এ হচ্ছে একটি নিকৃষ্টতম স্থান। **বস্তুত যে জ্ঞান বিজ্ঞান মানুষকে নিশ্চয়তা, নিশ্চিন্ততা ও প্রত্যয়শীলতা দান করতে পারেনা, যা তাকে শূন্যে দোদুল্যমান অবস্থায় নিক্ষেপ করে এবং কোথাও এতোটুকু স্থিরতা লাভের অবকাশ দেয়না, যা তাকে 'কাফির হয়োনা, দায়ে ঠেকে মুসলমান হও' এর মতো ন্যাক্কারজনক অবস্থায় ফেলে দেয়, তা নি:সন্দেহে অজ্ঞতার চাইতেও নিকৃষ্টতর।**

এই সংস্কটাবস্থা থেকে একমাত্র 'ঈমান বিল্ গায়েব' বা অদৃশ্যে বিশ্বাসই মানুষকে রক্ষা করতে পারে। একবার যদি আপনি কাউকে নবী বলে মেনে নেন এবং সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করেন যে, খোদায়ী জ্ঞানশাস্ত্রে তিনি পুরোপুরি ব্যুৎপত্তির অধিকারী এবং তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননা, তবে আর অদৃশ্য বিষয়াদির ব্যাপারে আপনার মনে কোনো সন্দেহ ও দ্বৈধবোধের অবকাশ থাকতে পারেনা। এর ফলে আপনার ধর্মমত বিশ্বাস ও প্রত্যয় এমন এক মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যা কোনো আধুনিক জ্ঞান বা নবাবিষ্কার, চিন্তা ও কর্মের নতুন ধারা এবং 'মুক্তবুদ্ধির' কোনো প্রবল প্রতাপে আহত হয়না। এই কারণেই কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই কিতাব হচ্ছে মুত্তাকী লোকদের

পথপ্রদর্শক। আর মুত্তাকী লোকদের প্রথম পরিচয় হচ্ছে এই যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান পোষণ করে ঃ

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ . (البقرة)

অর্থ ঃ এই কুরআন মুত্তাকীদের পথ প্রদর্শক, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।'

বস্তুত 'ঈমান বিল গায়েব' বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের ওপরই ধর্মের গোটা ঈমারত প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এই মূলভিত্তিকে একবার চুরমার করে ফেললে তারপর ধর্মের এসব বুনিয়াদী মতবিশ্বাস সম্পর্কে – যে গুলোর নিগুঢ় রহস্য জানার কোনো উপায়ই আপনার কাছে নেই – কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আপনি পৌঁছতে পারেননা। এমতাবস্থায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, তার যথার্থতা সম্পর্কে আপনার নিজেরই পুরোপুরি আস্থা হবেনা এবং তার সত্যতা সম্পর্কে অন্য লোককেও আপনি আস্থাবান করতে পারবেননা।

এ ব্যাপারে সর্বশেষ প্রশ্ন হলো, এক ব্যক্তি আল্লাহর নবী এবং তিনি ধর্মতত্ত্বে পুরোপুরি ব্যুৎপত্তির অধিকারী – এটা জানবার উপায় কী? তিনি এতোবড় সত্যবাদী যে, তিনি অদৃশ্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির সীমাবহির্ভূত কথা বললেও আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করবো এবং তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননা, একথা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করবো – এটাই বা বুঝবো কি করে? এই প্রশ্নটির মীমাংসা দু'টি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। প্রথম, তাঁর ব্যক্তি চরিত্র আমাদের সকল সম্ভাব্য পন্থায় এবং কঠোরতর মানদন্ডে যাচাই করে দেখতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাঁর পেশকৃত বিষয়াদির মধ্যে যেগুলো আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচারশক্তির অন্তর্ভুক্ত, সেগুলোকে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। এই উভয় পরীক্ষায় যদি কেউ অনুপম সত্যবাদী বলে প্রমাণিত হন এবং সেই সঙ্গে মানব জীবনের চিন্তা ও কর্মের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে প্রদত্ত তাঁর বিচক্ষণ ও কল্যাণকর ব্যবস্থার মধ্যে কোনো ত্রুটি নির্দেশ করতে সক্ষম না হয়, তবে তাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার না করার কোনোই হেতু নেই। আর তিনি খোঁজ খবর ও জানা শোনা ছাড়াই নিছক দুনিয়াবাসীকে ধোকা দেয়ার জন্যেই আল্লাহ্, ফেরেশতা, আরশ, কুরসী, ওহী, ইলহাম, পুনরুত্থান, বেহশত ও দোযখ ইত্যাদির একটা বিরাট ষড়যন্ত্র পাকিয়েছেন (আল্লাহ মাফ করুন) বলে সন্দেহ পোষণ করারও কোনো যৌক্তিকতা নেই।

কাজেই জনাব নিয়াজের তৃতীয় ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে, তিনি কুরআনের প্রথম অংশকে (আমরা যাকে দ্বিতীয় অংশ বলে উল্লেখ করেছি) আলোচনার যোগ্যই মনে করেননা, বরঞ্চ তিনি এই ধারণা পোষণ করেন যে, 'এ ব্যাপারে সমস্ত ধর্মই প্রায় একরকম এবং ইসলামের শিক্ষা অন্যান্য ধর্ম থেকে ভিন্ন বা নিকৃষ্টতর নয়। পক্ষান্তরে আমাদের বক্তব্য হলো, তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী কুরআনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অংশের (কিংবা আমাদের বিশ্লেষণ অনুসারে প্রথম অংশের) সত্যতা নির্ণয়

করতে হলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত্র এবং কুরআনের অদৃশ্য বহির্ভূত বিষয়াদির পর্যালোচনা করা আমাদের জন্যে অপরিহার্য। পরন্তু ইসলামী শিক্ষার এই অংশটি 'অন্যান্য ধর্ম থেকে ভিন্ন বা নিকৃষ্টতর নয়' কেবল এটুকু ধারণা নিয়ে তুষ্ট থাকলেই চলবেনা; বরং সেটি তামাম অনিসলামী ধর্মের চাইতে উন্নত এবং উৎকৃষ্ট, যুক্তি প্রমাণ দ্বারা এটাও প্রতিপন্ন করা আবশ্যক। কাজেই আলোচনার এই বিষয়টি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অন্য বিষয়ের অবতারণা করা নীতিগতভাবেই ভুল। তাছাড়া এ বিষয়টির মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসা করাও সম্ভবপর নয়।

জনাব নিয়াজের ইচ্ছা হলো, আমরা যেনো 'পরকাল', 'কালামে ইলাহী' এবং আকাইদ ও ইতিহাস সংক্রান্ত আয়াতগুলোর বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু আমাদের মতে, এই আলোচনার দু'টি দিক রয়েছে এবং তা দু'টি ভিন্ন দলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রথম দলটি হলো তারা, যারা রসূলে আকরাম স.-এর নবুয়্যতের প্রতিই ঈমান পোষণ করেনা এবং এই কারণেই তারা উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সন্দেহ পরায়ণ। দ্বিতীয় দলটি হলো, যারা তাঁর নবুয়্যাতকে স্বীকার করে, কিন্তু অদৃশ্য বিষয়াদির ব্যাপারে সন্দিগ্ধচিত্ত। এই দু'টি দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পদ্ধতিও ভিন্ন। কাজেই আপত্তিকারী এর কোন দলের অন্তর্ভূক্ত, তা না জানা পর্যন্ত আমরা তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারিনা।

প্রথম দলটির সঙ্গে পরকাল, কালামে ইলাহী এবং অন্যান্য অদৃশ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা একেবারেই অর্থহীন। কারণ মূল বিষয়ে মতানৈক্য রেখে খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। আমরা পরকাল, কালামে ইলাহী, এমনকি আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণরাজি সম্পর্কেও যে বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান ও প্রত্যয় পোষণ করি, তার ভিত্তি এই নয় যে, আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসা কিংবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা আমরা কোনো চূড়ান্ত ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পেরেছি এবং তার বিরুদ্ধে আর কোনো যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করা যেতে পারেনা। এমনটি যদি হতো, তো নিসন্দেহে নবুয়্যত সংক্রান্ত আলোচনা করা যেতো। কিন্তু এই বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের অটল অনড় ঈমান প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বাসের ওপর গড়ে উঠেছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্যবাদী। তিনি আপন নবুয়্যত এবং কালামে ইলাহী সম্পর্কে যাকিছু বিবৃত করেছেন, তা সবই অভ্রান্ত। এই মৌলিক কারণেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু, আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবিশ্বাসী ব্যক্তির সাথে এই বুনিয়াদী প্রশ্নটিকে স্বীকার না করা পর্যন্ত কোনো খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করতে আমরা সম্মত নই।

দ্বিতীয় দলটির এই অধিকার আমরা স্বীকার করিনা যে, তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতাও স্বীকার করবে আবার অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে

কুরআন মজীদ এবং মুহাম্মদ স.-এর বর্ণনার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করবে। কারণ এরূপ ভূমিকা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা প্রথম দলটির সামিল হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে তাদের দ্বিতীয় দলে শামিল থাকতে হলে এ সত্য স্বীকার করতে হবে যে, কুরআনের প্রতিটি শব্দ অভ্রান্ত এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকিছু পেশ করেছেন তা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমুক্ত। অবশ্য এ ব্যাপারে সে দু'টি দিক থেকে প্রশ্ন তুলতে পারে। প্রথম এই যে, কুরআন শরীফে বাস্তবিকই এ ধরনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে কিনা? আর রসূলের করীম স. সত্যসত্যই এরূপ কথা বলেছেন কিনা। দ্বিতীয়ত, কুরআন সুন্নায় এ সম্পর্কে যাকিছু রয়েছে, তার সঠিক অর্থ এবং মর্ম কি হতে পারে?

পরিশেষে আমার আর একটি কথা বলতে হচ্ছে। জনাব নিয়াজ 'তর্জমানুল কুরআনে' একটি বিতর্ক বিভাগ খোলার অনুরোধ জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি এই অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁর যাবতীয় শোবা সন্দেহ এবং প্রশ্ন ও আপত্তি তিনি উক্ত বিভাগে পেশ করবেন। কিন্তু পেশাদারি বিতর্ক ও বাদানুবাদ থেকে আমি হামেশাই আত্মরক্ষা করে এসেছি এবং এখনো রক্ষা করতে ইচ্ছুক। কারণ যে বিতর্কের উদ্দেশ্য গুরু মস্তিষ্কের ব্যায়াম আর বুদ্ধির কসরৎ দেখিয়ে বাহবা কুড়ানো তেমন বিতর্কের আমি আদৌ পক্ষপাতী নই। তবে জ্ঞানগর্ভ ও তত্ত্বপূর্ণ আলোচনার জন্যে আমি সর্বদাই প্রস্তুত, যদি সে আলোচনার উদ্দেশ্য হয় সত্যানুসন্ধান এবং তাতে উভয়পক্ষ এমনি আন্তরিকতা নিয়ে অংশগ্রহণ করেন যে, আসল সত্য প্রমাণিত হবার পর প্রত্যেকে তা স্বীকার করে নেবেন। এই হিসেবে 'নিগার' পত্রিকায় যেসব শোবা সন্দেহ ও আপত্তি প্রকাশিত হবে, তর্জমানুল কুরআনে তা পুনরুল্লেখ করা হবে এবং সেই সঙ্গে তার জবাবও দেয়া হবে। অনুরূপভাবে 'তরর্জুমানুল কুরআনে'র জবাব সম্পর্কে জনাব নিয়াজ কোনো মন্তব্য করলে মূল জবাবটিও তার সঙ্গে উল্লেখ করবেন বলে আশা করি, যাতে করে উভয় পত্রিকার পাঠকবর্গ আলোচনার উভয় দিক সম্পর্কে অবহিত এবং সেই সম্পর্কে নিজেরাও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। পক্ষান্তরে কেবল একটি দিক উল্লেখ করা এবং অন্যদিক এড়িয়ে যাওয়াকে আপন দুর্বলতার স্বীকৃতি বলেই আমি মনে করি।

❖ ❖ ❖

বিঃ দ্রঃ পাঠকবর্গ হয়তো শুনে অবাক হবেন যে, এই প্রবন্ধের জবাবে নিগার পত্রিকার সঙ্গে 'তর্জমানুল কুরআনে'র বিনিময় বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তা বন্ধ রয়েছে। একশ্রেণীর লোক আমাদের অপরিপক্ক যুব সম্প্রদায়কে কতিপয় চিত্তাকর্ষক বুলি দ্বারা বিভ্রান্ত করার কাজ তো খুব করতে পারেন; কিন্তু জ্ঞান ও তথ্যের ভিত্তিতে যখন যথারীতি আলোচনার আহবান জানানো হয়, তখন তাদের অন্ত:সারশূন্যতা একেবারে প্রকট হয়ে ওঠে।

১১

জাতীয় পুনর্গঠনের সঠিক পন্থা*

সংস্কার-সংশোধন ও বিপ্লব উভয়ের লক্ষ্যই বিকৃত অবস্থার পরিবর্তন সাধন। কিন্তু উভয়ের প্রেরণা ও কর্মপন্থায় রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। সংস্কার প্রচেষ্টার সূচনা হয় চিন্তা ভাবনা থেকে। সেখানে শান্ত মনে ভেবে চিন্তে মানুষ অবস্থা পর্যালোচনা করে; বিকৃতি ও বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করে, বিকৃতির চৌহদ্দি পরিমাপ করে, তার নিরসনের পন্থা উদ্ভাবন করে এবং তা দূর করার জন্যে যতোটা ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য, কেবল ততোটুকু শক্তিই প্রয়োগ করে। পক্ষান্তরে বিপ্লবের সূচনা হয় প্রবল রোষাগ্নি ও তীব্র প্রতিহিংসা পরায়ণতা থেকে। তাতে এক বিকৃতির জবাবে অন্য এক বিকৃতি আমদানি করা হয়। যে অ-মিতাচারের ফলে বিকৃতির উদ্ভব হয়েছিলো, তার মোকাবিলা করা হয় অন্য অ-মিতাচারের দ্বারা যে অ-মিত্যাচার অকল্যাণের সাথে সাথে কল্যাণকেও নিশ্চিহ্ন করে ছাড়ে। একথা নি:সন্দেহ যে, একজন সংস্কারবাদীকেও কখনো কখনো এমনসব কাজ করতে হয়, যা একজন বিপ্লববাদীর পক্ষে মানানসই। উভয়েই দেহের পচনশীল স্থানে অস্ত্রোপচার করে। কিন্তু পার্থক্য হলো, সংস্কারবাদী প্রথমেই অনুমান করে নেয় যে, বিকৃতি কোথায় এবং তার পরিধি কতোটুকু। অতপর বিকৃতি দূরীকরণের জন্যে যতোটা প্রয়োজন, ঠিক ততোটুকু পরিমাণেই সে অস্ত্র প্রয়োগ করে। পরন্তু অস্ত্রপচারের পূর্বে সে ঘা শুকাবার ঔষধের ব্যবস্থা করে রাখে। কিন্তু বিপ্লববাদী তার ক্রোধের অতিশয্যে একেবারে অন্ধভাবে অস্ত্র চালাতে থাকে এবং ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সবকিছুই সে কেটে চলে যায়। এভাবে যখন অনেক কাটাছেঁড়া করা হয় এবং দেহের একটি বেশ সুস্থ অংশ বিলুপ্ত করার পর নিজের ভ্রান্তি অনুভব করতে পারে, তখনি হয়তো তার ঔষধের কথা মনে আসে।

সাধারণত যেখানে বিকৃতি মাত্রাতিক্রম করে যায়, সেখানেই লোকেরা ধৈর্য স্থৈর্য খুইয়ে বসে। বিকৃত পরিবেশ থেকে যে দুখ কষ্ট তারা ভোগ করে, তাতে শান্ত মনে, ভেবেচিন্তে সংস্কার প্রচেষ্টা চালানোর অবকাশই তারা পায়না। এ কারণেই এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণত সংস্কারবাদী আন্দোলনের পরিবর্তে বিপ্লববাদী আন্দোলনই তীব্রতা লাভ করে। রক্ষণশীল ও বিপ্লববাদী দলগুলোর মধ্যে তীব্র সংঘাত দানা বেঁধে ওঠে। এর ফলে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুন আরো বেশি ইন্ধন লাভ করে। উভয় পক্ষই একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার চরম প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়। উভয়ই সত্য ও সততার গলায় নির্মমভাবে ছুরি চালিয়ে দেয়।

* প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। – সম্পাদক

একপক্ষ সত্যের পরিবর্তে মিথ্যার প্রতিরক্ষা করতে গিয়ে চরম শক্তি নিয়োজিত করে, অপরপক্ষ সত্য মিথ্যা নির্বিশেষে সবার ওপর নির্বিচারে হামলা চালায়। শেষ পর্যন্ত বিপ্লববাদীরা যখন জয়লাভ করে, তখন সত্য মিথ্যা, ভালো মন্দ নির্বিশেষে রক্ষণশীলদের প্রতিটি জিনিসকেই ধ্বংস করে ছাড়ে। বস্তুত বিপ্লব ঠিক বন্যার বেগে এগিয়ে চলে। ভালো মন্দ নির্বিচারে সবাইকেই সে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ঠেলে দেয় বিলুপ্তির মুখে। অতপর অনেক ভাঙা চুরার পর যখন বিচারবুদ্ধি স্বস্তি ও স্থিতি লাভ করে, তখন পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু বিপ্লবী মানসিকতা এখানেও অভিনব পন্থা খুঁজে বের করে। পুরনো রক্ষণশীলদের প্রতিটি জিনিসকেই সে বর্জন করার চেষ্টা করে। একটা জিনিস যতোই সঠিক হোক না কেন, কিন্তু প্রাচীন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সেটি সম্পর্কযুক্ত ছিলো- বিপ্লবের দৃষ্টিতে এর চাইতে বড় দোষ আর কিছুই নেই। এভাবে বেশ কিছুকাল ধরে বিপ্লবী নীতির ওপর জীবনের ইমারত গড়ে তুলবার জন্যে প্রচেষ্টা চলে। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ব্যর্থতার ফলে বিপ্লবী মস্তিষ্ক যখন অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন কোনো না কোনো দিক দিয়ে সে ভারসাম্যের পথে আসতে বাধ্য হয়, যা শুরু থেকেই সংস্কারবাদীদের সামনে ছিলো। অন্যকথায়, বুদ্ধিমান লোকেরা যা করে, নির্বোধ লোকেরাও তাই করে থাকে, তবে পানি অনেক ঘোলা করার পর।

বর্তমান যুগে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব। রাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় যে চরম বিকৃত সমাজ-ব্যবস্থা বর্তমান ছিলো, তা যখন দেশবাসীর পক্ষে একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠল, তখন তার প্রতিক্রিয়ায় একটি বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠে। ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক মতবাদগুলো রাশিয়ায় বিকাশ লাভ করতে থাকে। পক্ষান্তরে রাজবংশ এবং তাদের তাবেদার শ্রেণীগুলো নিজেদের অবৈধ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে স্বৈরাচারী শক্তি ব্যবহার করে। এর ফলে শুধু রাজকীয় একনায়কত্ব এবং সম্পদের অসম বন্টনের বিরুদ্ধেই নয়; বরং শতাব্দী কাল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে তামুদ্দুনিক ব্যবস্থা চলে আসছিলো তার বিরুদ্ধেই প্রবল রোষানল জ্বলে উঠে। অবশেষে কার্ল মার্কসের প্রেতাত্মা লেলিনের মূর্তি পরিগ্রহ করে। জার শাসনকে সমূলে উৎখাত করা হলো। সেই সঙ্গে যে সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, তামদ্দুনিক, নৈতিক ও ধর্মীয় নীতির ওপর বিপ্লব পূর্ব যুগের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিলো, যুগপৎ তা সবই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলো। এই ব্যাপকতর ধ্বংসলীলার পর সম্পূর্ণ নতুন কম্যুনিস্ট নীতির ভিত্তিতে এক নতুন সমাজ গঠনের কাজ শুরু হলো। এই নতুন সমাজ প্রাসাদে বুর্জোয়া শ্রেণীর পরিত্যক্ত কোনো একটি জিনিসও যাতে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে, তজ্জন্যে নয়া সংগঠকরা তাদের সমগ্র মানসিক শক্তি নিয়োজিত করল। এমনকি, আল্লাহকে পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়া থেকে বেরিয়ে যাবার নোটিশ দেয়া হলো। কিন্তু দিন যতই অতিক্রান্ত হতে থাকে, গঠনমূলক বুদ্ধি ততই বিপ্লবী উম্মাদনার স্থান দখল করতে থাকে। এভাবে বিপ্লবের সূচনায় যে চরম বলশেভিকবাদ সক্রিয় ছিলো, ক্রমে ক্রমে তা ভারসাম্যের পথে ফিরে আসতে থাকে।

এই ধরনের প্রান্তিকধর্মিতা ফরাসী বিপ্লবকালেও দেখা দিয়েছিলো। তখনো বিপ্লবের ভাবোচ্ছাসে অতীতের সবকিছুই নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা চলছিলো এবং নতুন নতুন বিপ্লবী নীতি উদ্ভাবন করে তার প্রবর্তন করা হয়েছিলো। কিন্তু এহেন চরম বিপ্লবী মানসিকতার ফলেই আজ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রকৃতিতে পুরোপুরি ভারসাম্য স্থাপিত হতে পারেনি। আজকে তার জাতীয় জীবনের কোনো একটি দিক ও বিভাগেই বৃটেনের ন্যায় স্থিতিশীলতা বর্তমান নেই।

এর আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে তুর্কী বিপ্লব। সেখানেও এমনি বিপ্লব মানসিকতাই একটি জাতিকেই যাদু বলে রাতারাতি ভিন্ন জাতিতে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছিলো। এই প্রচেষ্টাব্যাপদেশে ফোঁড়া ফুস্কুড়ির ওপর অস্ত্রপ্রয়োগের সাথে তুর্কী দেহের একটি বেশ সুস্থ অংশও কেটে ফেলে দেয়া হয় এবং তার পরিবর্তে ইউরোপ থেকে কিছু নতুন অঙ্গপ্রতঙ্গ ধার করে এনে লাগিয়ে দেয়া হয়। এমনকি পুরোনো মস্তিষ্কের পরিবর্তে নতুন টুপিযুক্ত একটি নয়া মস্তিষ্কও সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লববাদী তুর্কীরা ক্রমেই এই শিক্ষা লাভ করেছে যে, যে কোনো পুরোনো জিনিসই মন্দ এবং যে কোনো নতুন জিনিসকেই ভালো মনে করবার যে সাধারণ নীতি তারা গ্রহণ করেছিলো, তা মোটেই অভ্রান্ত নয়। তাই অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা প্রচুর ক্ষতি সাধনের পর তাদেরকে বাড়াবাড়ির পথ থেকে ভারসাম্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হচ্ছে।

এ কথাগুলো বলবার কারণ হলো, বর্তমানে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক চরম বিপ্লবী মানসিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই চরমাবস্থার মন্দ পরিণতি দেখা দেবার আগেই আমরা প্রাচীন পন্থী ও বিপ্লববাদী উভয় দলকেই চিন্তা ভাবনা করবার আহ্বান জানাতে চাই।

প্রকৃত পক্ষে তুরস্ক এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে যে বিকৃতাবস্থা বিরাজমান ছিলো এবং এখনো রয়েছে, এখানকার পরিস্থিতিও ঠিক তদ্রূপ। গত কয়েক শতক ধরে যে দলটির হাতে আমাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব করায়ত্ব রয়েছে, তারা ইসলামকে একটি অচল নিষ্ক্রিয় বস্তুতে পরিণত করেছেন। সম্ভবত হিজরী ছয় সাত শতকের পর থেকে তাদের কাছে কালের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা তাদের দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় অবশ্য এটাই পড়তেন এবং পড়াতেন যে, বিশ্ব পরিবর্তনশীল এবং প্রত্যেক পরিবর্তনই হচ্ছে একটি নতুন জিনিস। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিশ্বের পরিবর্তন, যুগের বিবর্তন এবং কালের অগ্রগতি ও নতুনত্বের প্রতি তাঁরা চোখ বন্ধ করে রেখেছেন। দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে; দুনিয়ার অবস্থা, ধ্যান ধারণা, ভাবধারা, মতাদর্শ ইত্যাদিতে কত কি পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটেছে! সামাজিক বিষয়াদি ও সমস্যাবলীতে কতো যে ওলট পালট হয়েছে! কিন্তু আমাদের ধর্ম নেতারা এখনো নিজেদেরকে সেই পাঁচ ছয়'শো বছর পূর্বেকার পরিবেশেই মনে করেছেন। তাঁরা যুগের অগ্রগতির সাথে কোনোই তরক্কী লাভ করলেননা! নিত্যনতুন পরিবর্তন থেকে তাঁরা প্রভাবমুক্ত

রইলেন! জীবনের নতুন সমস্যাবলীর সাথে তাঁরা কোনোই সম্পর্ক রাখলেননা! তাঁরা আপন জাতিকেও যুগের সাথে এগিয়ে চলতে বাধা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন; বরং তাদেরকে ভবিষ্যত থেকে অতীতের দিকে টেনে নিয়ে চললেন! এমনি চেষ্টা কিছুদিনের জন্যেই সফলকাম হতে পারত এবং তাই হয়েছিলো। কিন্তু চিরদিনের তরে এ ধরনের প্রচেষ্টার সাফল্য লাভ অসম্ভব ব্যাপার। দুনিয়ার সঙ্গে যে জাতির মেলামেশা ও সম্পর্ক সম্বন্ধ রয়েছে, সে কতদিন দুনিয়ার চিন্তাধারা ও জীবনের নতুন সমস্যাবলীর প্রভাবমুক্ত হয়ে থাকতে পারে? তার নেতৃবৃন্দ যদি অগ্রবর্তী হয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তব ধর্মী পথে তাকে চালিত না করেন, তবে সে স্বাভাবিকভাবেই আপন ঘাড় থেকে তাদের নেতৃত্বের জোয়াল তুলে দূরে নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হবে।

আসলে এই বিকৃতির মূল শিকড় হচ্ছে অন্য একটি জিনিস। আমাদের ধর্ম নেতারা খুঁটিনাটিতে এতদূর লিপ্ত হয়ে পড়েছেন যে, তার ফলে মূলভিত্তিই তাঁদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে। অতপর খুঁটিনাটিই মূলনীতির জায়গা দখল করে নিয়েছে এবং তার থেকে আরো অসংখ্য খুঁটিনাটি বেরিয়ে এসেছে আর এগুলোই প্রকৃত ইসলাম বলে আখ্যা পেয়েছে। অথচ ইসলামে এগুলোর আদৌ কোনো গুরুত্ব ছিলোনা। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জাতীয়তার প্রাসাদটি এই ধারাক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যে, প্রথমে কুরআন মজীদ, তার পর সুন্নতে রসূল (সা) এবং সর্বশেষে জ্ঞানী ও মনীষীদের ইজতিহাদ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ধারাক্রমকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়া হয় এবং এইভাবে নতুন ধারাক্রম রচনা করা হয় যে, প্রথমে একটি বিশেষ যুগের মনীষীদের ইজতিহাদ, পরে সুন্নাতে রসূল (সা) এবং সর্বশেষে কুরআনে মজীদ! এই নয়া ধারাক্রমই হচ্ছে সমস্ত জড়তা ও ক্লীবতার জন্যে দায়ী, যা ইসলামকে একটি অকেজো ও নিষ্ক্রিয় বস্তুতে পরিণত করেছে।

ফিকাহ্ শাস্ত্রকার, কালামশাস্ত্রবিদ, তফসীরকার ও মুহাদ্দিস (রহ) গণের জ্ঞানগরিমা ও তাঁদের পদমর্যাদাকে কেউই অস্বীকার করতে পারেনা। কিন্তু তাঁরা মানুষ ছিলেন। তাঁদের জ্ঞান অর্জনের উপায় ও পন্থা সাধারণ মানুষের মতই ছিলো। তাঁদের কাছে ওহী আসতো না বরং তারা আপন বিচার বুদ্ধি ও ব্যুৎপত্তির সাহায্যে কালামুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূল সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করতেন। এভাবে যে সব মূলনীতি তাঁদের কাছে নির্ভুল বলে মনে হতো, তার ভিত্তিতেই আইন কানুন ও আকাইদের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তাঁরা নির্ধারণ করতেন। তাঁদের এই সকল ইজতিহাদ আমাদের পক্ষে সহায়ক ও পথ নির্দেশক হতে পারে; কিন্তু এটাই মূলনীতি ও ভিত্তি হতে পারেনা। মানুষ নিছক তার বিচার বুদ্ধির সাহায্যে ইজতিহাদ করুক অথবা কোনো প্রত্যাদেশমূলক কিতাব থেকে আহরিত তথ্যের সাহায্যে ইজতিহাদ করুক কোনো অবস্থাতেই তার ইজতিহাদ দুনিয়ার জন্যে স্থায়ী বিধান ও অটল নিয়মের মর্যাদা পেতে পারেনা। কারণ মানুষের জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি হামেশাই স্থান ও কালের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

স্থান ও কালের সমস্ত গন্ডি থেকে উর্ধ্বে রয়েছেন একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। তাঁর কাছেই রয়েছে প্রকৃত জ্ঞান ভান্ডার। কালের আবর্তনে তাঁর জ্ঞান

রাজ্যে অণু পরিমাণ পরিবর্তনও সূচিত হয়না। সে জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটেছে কুরআন পাকের আয়াত এবং তার ধারক ও বাহকের পবিত্র বক্ষদেশে। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে এমন এক জ্ঞান উৎস, যেখান থেকে প্রত্যেক যুগের মানুষই তার বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হামেশা জ্ঞান বিজ্ঞান, ধ্যান ধারণা ও বিধি ব্যবস্থা আহরণ করতে পারে। যতদিন আলিম সমাজ এই উৎস ও ভিত্তিমূল থেকে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন এবং নির্ভুল চিন্তা শক্তি ও বিচার বুদ্ধি দ্বারা ইজতিহাদ করে আদর্শিক ও বাস্তব সমস্যাবলীর সমাধান করেছিলেন, ততদিন ইসলামও যুগের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিলো। কিন্তু যেদিন থেকে কুরআন সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা পরিহার করা হলো, হাদীসের সত্যানুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষণ বন্ধ হয়ে গেল, নির্বিচারে পূর্ববর্তী তফসীরকার ও মুহাদ্দিসগণের অন্ধ অনুকরণ শুরু হলো, অতীতের ফিকাহশাস্ত্রকার ও কালাম শাস্ত্রবিদদের ইজতিহাদকেই অটল ও চিরস্থায়ী বিধানে পরিণত করা হলো এবং কুরআন ও সুন্নাহর নীতিকে পরিত্যাগ করে বুযর্গদের উদ্ভাবিত খুঁটিনাটিকেই মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হলো, সেদিনই ইসলামের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেলো। তার সম্মুখগতির পরিবর্তে পশ্চাদধাবন শুরু হলো। তার ধারক ও বাহকগণ জ্ঞান ও কর্মের নব নব ক্ষেত্রে দুনিয়ার পথ নির্দেশের পরিবর্তে প্রাচীন বিষয়াদী ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই লিপ্ত হয়ে পড়লো। ছোটখাট খুঁটিনাটি বিষয়ে বাকবিতন্ডায় নিরত রইলো। নিত্যনতুন মাযহাব সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিতর্কমূলক ব্যাপারে ফির্কা সৃষ্টি করে চললো। এমনকি, এর পরিণামে মুসলমানদের উপর মুক্ত হস্তে কুফরী ও ফাসিকীর ফতোয়া জারি হলো যে, দুনিয়ার মানুষ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا (লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনের মধ্যে প্রবেশ করছে)-এর পরিবর্তে- يَخْرُجُوْنَ مِنْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا (লোকেরা আল্লাহ্‌র দীন থেকে দলে দলে বেরিয়ে যাচ্ছে)-এর তামাশা দেখতে পেলো। অপরদিকে اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ-(কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি নম্র)-এর পরিবর্তে اَشِدَّاءُ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ (মুমিনরা কাফিরদের প্রতি নম্র এবং পরস্পরের প্রতি কঠোর)-এর দৃশ্য চারির্দিকে প্রতিভাত হয়ে উঠলো। সর্বোপরি মুনাফিক ও কাফিরদের সম্পর্কে تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى (তোমাদের মনে হবে তারা ঐক্যবদ্ধ, অথচ তাদের অন্তর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন)-এর যে অবস্থার কথা বিবৃত হয়েছিলো, তা মুসলমানদেরই অবস্থায় পরিণত হলো।

এ হচ্ছে উল্লেখিত আচরণের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, যা আজ আমরা এক ভয়াবহ বিপ্লবরূপে দেখতে পাচ্ছি। মুসলমানেরা যখন দেখছে যে, তাদের ধর্ম নেতারা তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে না, বরং তাদেরকে সামনে এগিয়ে নেবার পরিবর্তে উল্টো পিছু টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখনি তারা তাদের কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। অতপর একটি ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলের ন্যায় তারা ইতস্তত বিচরণ করতে

শুরু করেছে। একদল ধর্মের পতাকাবাহীদের সমস্ত ভ্রান্তি ও দূর্বলতার অভিযোগ খোদ ধর্মের ওপরই চাপিয়ে দিয়েছে। তাদের প্রগতির পথে ধর্মকেই সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধক বলে ঘোষণা করেছে। ধর্মকে বর্জন করে 'উন্নতিশীল' জাতিগুলোর অন্ধ অনুকৃতির কথা খোলাখুলি বলতে শুরু করেছে। অন্যদল আলিম সমাজ ও ধর্মনেতাদের গালাগাল করাকে নিজেদের অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছে, যেন এই গালিগালাজ ও গলাবাজির মধ্যেই মুসলমানদের কল্যাণ ও উন্নতির চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে। আর একদল উঠেই ধর্মের কাটছাঁট শুরু করে দিয়েছে। কেউ আবার ইমাম ও ফিকাহশাস্ত্রবিদদের সম্পর্কে কুৎসা প্রচার আরম্ভ করেছে। আবার কেউ ফিকাহর সঙ্গে হাদীসকেও একই পর্যায়ে ফেলে দিয়েছে। কেউ আবার কুরআনী শিক্ষা দীক্ষা ও বিধি ব্যবস্থায় সংশোধনের প্রয়োজনবোধ করেছে। আবার কেউ দীন ও দুনিয়াকে পৃথক করবার ওকালতি করেছে। এদের মতে, ধর্মের সম্পর্ক থাকবে শুধু আকাইদ ও ইবাদতের সঙ্গে, আর পার্থিব ব্যাপারে ধর্ম বা ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থার কোনো কর্তৃত্ব থাকবেনা।

এভাবে ঐ বিকৃতাবস্থার পরিবর্তনের জন্যে বিভিন্ন দল উপদল গজিয়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের আগ্রহ আকর্ষণটা সংস্কারের দিকে নয়, বরং বিপ্লবের দিকে। তারা শান্ত মনে চিন্তা করেই দেখেনি, আসল বিকৃতিটা কি? কোথায় তার উৎস? বিকৃতির পরিধি কতটুকু এবং তার নিরসনের সঠিক পন্থা কি? নিছক অনুমানের সাহায্যেই এটা ধরে নেয়া হয়েছে যে, বিকৃতির অস্তিত্ব রয়েছে। আর তা দূরীকরণের জন্যে উম্মতের দেহে অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলে রোগের সঙ্গে রোগীরও যে সর্বনাশ ঘটতে পারে, এটুকু তলিয়ে চিন্তা করা হচ্ছেনা।

স্বাধীন দেশগুলোতে অবশ্য এ কথা বলা যেতে পারে এবং বললে কতকটা সঙ্গতও হবে যে, বিপ্লবী কার্যক্রম ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কারণ সেখানে একটি মাত্র দলের হাতে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা নিবদ্ধ থাকে। অন্য কোনো দলের পক্ষে সে ক্ষমতার অবসান ঘটাতে হলে এক প্রচন্ড বিপ্লবী কার্যক্রম ছাড়া সাফল্যলাভ করা নাও যেতে পারে। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ্যণীয় যে, বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের ওপর যখন কার্যত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব এসে পড়ে, তখন যুগের অভিজ্ঞতা খুব শীঘ্রই তাদের বিচার বুদ্ধিকে সংহত করে দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে তাদেরকে বাড়াবাড়ির পথ বর্জন করে ভারসাম্যের পথ অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, বর্তমানে* আমরা পরাধীনতার মধ্যে কালাতিপাত করছি। আমাদের পরিস্থিতি স্বাধীন দেশগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে প্রথমত কোনো বিপ্লবী কার্যক্রমের প্রয়োজন নেই। কারণ এখানে এমন কোনো প্রচন্ড ও শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা নেই, যার মোকাবিলায় একটি ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কার আন্দোলন সফলকাম হতে পারেনা। দ্বিতীয়ত, কোনো বিপ্লবী কার্যক্রম শুরু এবং তা সফলকাম হলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার ভারসাম্যের পথে আসবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। কারণ বিপ্লবের ঝান্ডাবাহীদের কোনো

* এটা ১৯৩৪ সালের কথা। তখনকার বৃটিশ-ভারত আর আজকের স্বাধীন বাংলা পাক-ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। - সম্পাদক

বাধ্য বাধকতা পূর্ণ দায়িত্বভার ন্যাস্ত হবেনা, যা তাদের প্রান্তিকধর্মিতাকে ভারসাম্যের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে। কাজেই এখানে কোনো বিপ্লবী কার্যক্রম যথার্থ নয়। বরং সত্য বলতে গেলে নানা ধরনের বিপ্লবী কার্যক্রম বেশি দিন জারী থাকলে তার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। ফলে যে ভিত্তি ভূমির ওপর মুসলিম সমাজটি দাঁড়িয়ে আছে, তা টলমলিয়ে উঠবে এবং তার পরিবর্তে এমন কোনো সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, যার ওপর একটি নয়া সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। পরন্তু যে জাতি আগে থেকেই পরাধীনতা ও নির্বীর্যতার মধ্যে রয়েছে, তার সমাজ ব্যবস্থাকে এভাবে চূরমার করে ফেলা হলে নৈতিক অধপাতের কোন্ গভীর অতলে সে নিক্ষিপ্ত হবে, তাও ভেবে দেখবার বিষয়।

এ কারণেই আমরা কখনো কখনো রক্ষণশীলদের চাইতেও বেশি কঠোরতার সাথে বিপ্লববাদীদের মোকাবিলা করতে বাধ্য হই। নচেত বিকৃতাবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমরাও তাদের সঙ্গে একমত। ইসলামের মধ্যে যে জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তার সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে গতিশীলতায় রূপান্তরিত করতে আমরাও ইচ্ছুক। কিন্তু আমাদের মতে, এই গতিশীলতা সৃষ্টির জন্যে ইসলামী রীতিনীতি বর্জন করে ফিরিঙ্গীপনা আকড়ে ধরা কোনো নির্ভুল পথ নয়; কিংবা কোনো জ্ঞান গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা ছাড়াই অন্ধভাবে ধর্মের কাটছাট শুরু করে দেয়াও কোনো সঠিক পথ নয়। অথবা প্রাচীনকালের মুজতাহিদগণ কঠোর শ্রম মেহনত ও সংগ্রাম সাধনা করে যে বিশাল ইমারত গড়ে তুলেছিলেন, তাকে অযথা ভূমিস্মাৎ করে দেয়াও কোনো যথার্থ পথ নয়; কিংবা হাদীসের গোটা ভান্ডারকে আগুনে নিক্ষেপ করাও কোনো অভ্রান্ত পথ নয়। অথবা মাননীয় বিচার বুদ্ধি দ্বারা কালামে ইলাহীতে কোনোরূপ সংশোধন ও পরিবর্তন করাও সত্যিকার পথ নয়। বস্তুত এগুলো সংস্কারের কোনো পথই নয়; বরং এ হচ্ছে আগের চাইতেও মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টির পথ। এর সঠিক প্রতিকারের একমাত্র পথ এই যে, যে ধারাক্রমকে পাল্টে ফেলা হয়েছে, তাকে আবার সোজা করতে হবে। পূর্বে কুরআন যে নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলো, সেই মর্যাদা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। নবুয়্যাতের যুগে রসূলে আকরাম (সা) এর সাহাবাগণ ও তাঁর পরিবারবর্গ তাঁর কথা ও কাজকে যে মর্যাদা দিতেন আজ হাদীসকে সেই মর্যাদা দান করতে হবে। ফিকাহ্ শাস্ত্রকার, কালামশাস্ত্রবিদ, তফসীরকার ও মুহাদ্দিসগণ তাঁদের নিজস্ব কর্মকান্ডকে যে মর্যাদা দিয়ে গিয়েছেন, আমাদেরকেও কেবল সেই মর্যাদাই দিতে হবে।

মোটকথা, এদের সবার কাছ থেকেই উপকৃত হতে হবে। যে জিনিসগুলো বদলাবার প্রয়োজন নেই, সেগুলো যথারীতি বহাল রাখতে হবে। কিন্তু এটা কখনই ধারণা করা যাবেনা যে, মনীষীরা যা কিছু লিখে গিয়েছেন, তা অটল ও অপরিবর্তনীয় বিধান; কিংবা তাঁদের লিখিত কিতাবাদি আমাদেরকে কুরআন মজীদ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা এবং হাদীসে রসূলের সত্যানুসন্ধান থেকে বে নিয়ায করে দিয়েছে। অথবা তাঁদের 'পর কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি জ্ঞান আহরণের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এই ধারাক্রম যদি আবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে ইসলামের নিশ্চল গাড়িও পুনরায় চলমান হতে থাকবে। কারণ নিশ্চলতার আসল কারণই হলো, ইঞ্জিনকে গাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করে পিছনে ফেলে রাখা হয়েছে। ড্রাইভারকেও ইঞ্জিন থেকে সরিয়ে নিয়ে পিছনের কোনো এক বগিতে বসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সবচাইতে অগ্রবর্তী বগিটির ওপর এই ভরসা পোষণ করা হয়েছে যে, সে নিজেও যেমন চলবে, তেমনি সমস্ত গাড়িও চালিয়ে নেবে।

কিন্তু একাজে রোষাবেগের কোনো প্রয়োজন নেই। রোষ কেবল সেখানেই হতে পারে, যেখানে কেউ স্বেচ্ছায় যুলুম করেছে। কিন্তু এখানে যা কিছু হয়েছে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে হয়নি। এ কথা কেউ বলতে পারবে না যে, আলিমরা কোথাও কোনো সম্মেলন করে এই সিদ্ধান্ত করে ছিলেন যে, আমরা ইসলামের ওপর জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা চালিয়ে দেব এবং তার চলমান গাড়িকে বাধা দান করাবো। প্রকৃতপক্ষে হিজরী ছয় সাত শতক থেকে মুসলিম জাতিগুলোর রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও তামদ্দুনিক শক্তির সঙ্গে তাদের মানসিক, বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিতে ক্রমাগত যে অধপতন সূচিত হয়েছে, এ হচ্ছে শুধু তারই পরিণতি মাত্র। সে অধপাত মুসলমানদের জিহাদী ভাবধারাকে যেরূপ নিস্তেজ করে ফেলেছে, তেমনি তাদের ইতিহাস ও উদ্ভাবনী চেতনাকেও মরচে ধরিয়ে দিয়েছে। জীবনের গোটা সমস্যাবলী সম্পর্কে যেমন মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে, তেমনি ধর্মীয় ও শিক্ষাগত ব্যাপারেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে ধীরে ধীরে অবচেতনভাবেই তাদের গোটা মানস শক্তির ওপর মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছে। এর জন্যে আলিম সমাজ বা তাদের অনুগামী কাউকেই অভিযুক্ত করা যায় না। এর জন্যে বড়জোর প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা যেতে পারে। কিন্তু এ অভিযোগ করে যেমন কোনো ফলোদয় হবে না, তেমনি রোষানল ও ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি দ্বারাও কোনো কল্যাণ সাধিত হবেনা। কল্যাণ বা সংস্কারের একমাত্র নির্ভুল পন্থা হলো, শান্ত মনে বিকৃতির কারণ এবং তার পরিধি নির্ণয় করতে হবে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে বিকৃতির স্থলে সুকৃতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

❖ ❖ ❖

১২

বিদ্রোহের আত্মপ্রকাশ*

জাতি দু'শ্রেণীর লোক নিয়ে গঠিত হয়, এক শ্রেণী সাধারণ মানুষ, অপর শ্রেণী বিশিষ্ট লোক। সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা সংখ্যায় বিপুল আর জাতির সংখ্যাশক্তিও এদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু চিন্তা ভাবনা ও নেতৃত্ব করার মতো মস্তিষ্ক এই দলের থাকেনা। এই শ্রেণীর লোকেরা না জ্ঞান সম্পদে সমৃদ্ধ হয় আর না এদের কাছে আর্থিক শক্তি থাকে। তেমনি এরা যেমন পদমর্যাদাশালী হয়না, তেমনি রাষ্ট্রশক্তিও এদের হাতে থাকেনা। এ কারণেই জাতিকে পরিচালিত করা এদের কাজ নয়, বরং চালকদের পেছনে চলাই হচ্ছে এদের কাজ। এরা নিজেরা কোনো পথ রচনা বা আবিষ্কার করেনা, বরং যে পথ তৈরি করে দেয়া হয়, সে পথেই এরা চলতে থাকে। পথ রচনা এবং তাতে গোটা জাতিকে পরিচালিত করা আসলে বিশিষ্ট লোকদেরই কাজ। কারণ এদের প্রতিটি কথা ও কাজের পেছনে থাকে বুদ্ধি জ্ঞান, ধন দৌলত, মান ইজ্জত ও রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন। আর জনসাধারণকে ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায়, এদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয়। কাজেই এ কথা বললে অসঙ্গত হবেনা যে, জাতির চালিকা শক্তি তার জনগণ নয়, বরং তার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এদের ওপরই জাতির উত্থান পতন ও গঠন ভাঙ্গন নির্ভর করে। এদের সদাচরণ গোটা জাতির সদাচরণের এবং এদের পাপাচার গোটা জাতির পাপাচারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যখন কোন জাতির জীবনে সুদিন আসে, তখন তার মধ্যে এমনি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা নিজেরা যেমন সৎপথে চলেন, গোটা জাতিকেও তেমনি সৎপথে চালিত করেন ঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْتَدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

অর্থ ঃ আমি তাদের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করি, আর তারা আমার নির্দেশমত পথ প্রদর্শন করে। তাদের আমি নির্দেশ প্রদান করি মঙ্গলময় কাজ করার।" (সূরা আল আম্বিয়া ঃ আয়াত ৭৩)

আবার যখন কোনো জাতির ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তার বিকৃতির সূচনা হয় ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা। তাদের ভ্রষ্টতা ও অনৈতিকতার ফলে অবশেষে গোটা জাতিই কদাচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে ঃ

وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا .

---

* প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। - সম্পাদক

অর্থ ঃ আমরা যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করে দিতে চাই তখন সেখানকার দুস্কৃতকারী লোকদেরকে সীমা লংঘনের কাজে লিপ্ত করে দিই। ফলে সে জনপদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। তখন আমি তাকে সমূলে ধ্বংস করে দিই। (সূরা ইসরা ঃ আয়াত ১৬)

কুরআনের ভাষায় এই বিশিষ্ট লোকদেরকে مُتْرَفِيْنَ বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ প্রচুর অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালার সাক্ষ্য অনুযায়ী চিরদিন এমনি ঘটে আসছে যে, প্রথমে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই (مُتْرَفِيْنَ) সমাজে পাপাচার, খোদাদ্রোহিতা, অত্যাচার ও অবিচার শুরু করে। অতপর গোটা জনপদই দুষ্কৃতি ও কদাচারে জড়িয়ে পড়ে।

এই সাক্ষ্যের সত্যতা সম্পর্কে কি কোনো প্রশ্নের অবকাশ আছে? খোদ আমাদের এই জাতির অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; এর বিকৃতিও কি আমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারাই শুরু হয়নি? এই শ্রেণীর লোকেরাই তো খোদায়ী বিধানের অনুগত পথিকৃৎদের পন্থা ছেড়ে শয়তানী পন্থার অনুসরণ শুরু করেছে। এরাই প্রবৃত্তি-পূজার খাতিরে শরীয়তের বন্ধনকে শিথিল করতে লেগেছে। এরাই ফিরাউন ও কাইজারের ন্যায় খোদার বান্দাহদের দ্বারা নিজেদের গোলামী করাতে শুরু করেছে এবং নিজ জাতিকে আল্লাহপরস্তির পরিবর্তে শাসকপরস্তি ও আমলাপরস্তিতে অভ্যস্ত করে তুলেছে। এরাই মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে বান্দাহর সামনে নতি স্বীকার করতে শিখিয়েছে। এরাই চটকদার পোশাক ও শানদার মহলে বসে পাপাচার ও দুষ্কর্মকে চমকপ্রদ বানিয়েছে। এরাই হারাম মাল খেয়ে নিজ জাতির মধ্যে হারাম খাওয়া ও খাওয়ানোর অভ্যাস সৃষ্টি করেছে। এরাই জ্ঞান বিজ্ঞানকে ভ্রষ্টতার জন্যে, বুদ্ধিকে দুষ্কৃতির জন্যে, ধী-শক্তিকে প্রতারণা ও চক্রান্তের জন্যে, ধন-দৌলতকে ঈমান ক্রয়ের জন্যে, রাষ্ট্রশক্তিকে জুলুম নিপীড়নের জন্যে এবং শক্তিমত্তাকে দাম্ভিকতার জন্যে ব্যবহার করেছে। পরন্তু এরাই লোকদের অধিকার, উপকার এবং উন্নতি লাভ করবার অধিকাংশ সঙ্গত পন্থা বন্ধ করে দিয়েছে এবং লোকদেরকে তোষামোদ, উৎকোচ, মিথ্যা চক্রান্ত ইত্যাকার ঘৃণ্য পথে আপন লক্ষ্য অর্জনে বাধ্য করেছে। ফলকথা, নৈতিক চরিত্র ও আচার ব্যবহারের এমন কোনো বিকৃতি নেই, যার সূচনা এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা হয়নি। তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা যে অনুগ্রহ সম্পদ দান করেছিলেন, তাকে তারা ভ্রান্তপথে ব্যবহার করেছে। তারা নিজেরা যেমন বিগড়েছে, সেই সঙ্গে গোটা জাতিকেও বিগড়ে দিয়েছে।

এই সবকিছু কয়েক শতক ধরেই ঘটে আসছিলো এবং নৈতিক বিকৃতির ঘুণ মুসলমানদের জাতীয় শক্তিকে ভেতরে ভেতরে খেয়ে ফেলছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকদের হৃদয়ে অন্তত ঈমানের রৌশনী বর্তমান ছিলো। আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ প্রতিপালিত না হলেও লোকদের মনে খোদা ও রসূলের শ্রেষ্ঠত্ববোধ বজায় ছিলো। ইসলামী আইনের বিরুদ্ধাচরণ যতোই করা হোক না কেন, কিন্তু সে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ লোকদের মন থেকে একেবারে তিরোহিত হয়ে যায়নি;

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি লোকদের মন যতোই অপ্রসন্ন হোক না কেনো, কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো দু:সাহস কখনো হয়নি; বরং ইসলাম যাকে সত্য বলেছে, তাকে সত্য বলেই স্বীকার করা হতো। তাকে বর্জন করে মিথ্যার পায়রবীতে যতোই আতিশয্য দেখানো হোক না কেনো – ইসলামের নির্দেশিত সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, ফরয বা অবশ্য করণীয়কে বাহুল্য ও অবান্তর, বৈধকে অবৈধ, হারামকে হালাল, সৎ কাজকে গুনাহ্ এবং গুনাহকে পুণ্যকাজ বলা বা ভাবার মতো ধৃষ্টতা কারুর মধ্যেই ছিলোনা। পাপাচার নিসন্দেহে অনুষ্ঠিত হতো। অপরাধ ও দুষ্কৃতিতে লোকেরা অবশ্যই লিপ্ত হতো। শরীয়তের সীমারেখা বহু ক্ষেত্রেই লংঘন করা হতো। ইসলামী আইনের বিরুদ্ধাচরণে মাত্রাতিক্রমও করা হতো। কিন্তু সেই সঙ্গে লোকদের মন লজ্জাবোধও করতো। অনুশোচনায় তাদের মস্তক নুইয়ে আসতো। অন্তত হৃদয় তাদের স্বীকার করতো যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা করছে।

এর কারণ হলো, ঈমানের দুর্বলতা ও আচরণের বিকৃতি সত্ত্বেও মুসলমানদের সভ্যতার প্রাসাদ ইসলামের গড়া ভিত্তি-স্তম্ভের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। গ্রীক ও ইরানী চিন্তাধারার আমদানির ফলে যদিও অনেক গুমরাহী বিস্তার লাভ করেছিলো; কিন্তু তা মুসলমানদের দৃষ্টিকোণকে একেবারে বদলে দেবার এবং তাদের মানসিক গড়নকে ইসলামের প্রতি অপ্রসন্ন করে তুলবার মতো সাফল্য কোনো দিনই লাভ করেনি। তারা মুসলমানের দৃষ্টিতে দেখা এবং মুসলমানদের মগজ দিয়ে চিন্তা করা একেবারে ছেড়ে দেবে – তাদের বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাধারা ও বিচার শক্তিকে তা কখনোই এতোটা প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। অনুরূপভাবে তাহযীব ও তমদ্দুনের ক্রমবিকাশ যদিও বহিরাগত প্রভাবের দরুন ইসলামের নির্ধারিত পথ থেকে অনেকটা ভিন্ন পথে হয়েছে; কিন্তু যে মূলনীতির ওপর তাহযীব ও তমদ্দুনের গোড়াপত্তন করা হয়েছিলো, তা যথারীতিই তার ভিত্তিমূলে বর্তমান ছিলো এবং অপর কোনো তাহযীব ও তমদ্দুনের মূলনীতি এসে তার জায়গা দখল করে নেয়নি। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকখানি বিগড়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তবু তার মধ্যে ধর্মতত্ত্বের বিশিষ্ট স্থান ছিলো। কোনো শিক্ষিত মুসলমান ইসলামী আকাইদ, শরয়ী বিধি-নিষেধ ও জাতীয় রীতিনীতির অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকতোনা। মুসলমানদের বাস্তব জীবনে ইসলামী আইনের বন্ধন অনেকখানি শিথিল হয়ে পড়েছিলো, কিন্তু তবু তাদের গোটা বিষয়কর্মে একটিমাত্র আইন চালু ছিলো আর তা ছিলো ইসলামী আইন। ফলকথা, তামাম বিকৃতি সত্ত্বেও মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা, স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহারে ইসলামের গভীর প্রভাব বর্তমান ছিলো। তার মূলনীতির প্রতি তারা একনিষ্টভাবে ঈমান পোষণ করতো – অন্তত তাদের ঈমানের চৌহদ্দীতে ইসলাম-বিরোধী নীতি অনুপ্রবেশ করবার সুযোগ পায়নি। তাছাড়া স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম যে মূল্যমান নির্ধারণ করে দিয়েছিলো, তা একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়নি এবং তার বিরোধী অন্য কোনো মূল্যমান কর্তৃক তার স্থান দখল করবার মতো পরিবর্তন তাতে ঘটেনি।

কিন্তু উনিশ শতকে রাষ্ট্রক্ষমতা হাতছাড়া হবার পর আমাদের জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দেখলেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতার সংগে পদমর্যাদা, মানসম্ভ্রম, ধন-দৌলত, সবকিছুই হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে এবং পরাধীন অবস্থায় এগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে এবং সমূহ ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে হলে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা নেই। এ সময়ে তাদের কর্মনীতিতে আর একটি পরিবর্তন সূচিত হলো; প্রকৃত প্রস্তাবে যা শুধু পরিবর্তনই নয়; বরং একটি 'বিপ্লব' ছিলো। কারণ পরিবর্তনের মানে হচ্ছে বদলে যাওয়া আর বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে ওলট-পালট হওয়া। আর প্রকৃতপক্ষে তারা এমনি ডিগবাজি খেলো যে, তাদের লক্ষ্যস্থল, মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি সবকিছুই পাল্টে গেলো। তাদের গতিবেগ ইসলাম থেকে ফিরিঙ্গীপনার দিকে ঘুরে গেলো – যা ইসলামের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত।

ইসলামী আইনের বিরুদ্ধাচরণকালে প্রথমদিকে যে লজ্জা ও অনুশোচনা বোধ করা হতো, এই বিপ্লবের সূচনা হবার পর তা ধীরে ধীরে বিদায় হতে লাগলো; বরং শরয়ী বিধি-ব্যবস্থা লংঘন করে তারা যে আদৌ কোনো গুনাহ্ ও অপরাধ করছে, এই অনুভূতিই লোপ পেতে লাগলো। তারপর ধীরে ধীরে লজ্জা ও অনুশোচনার পরিবর্তে সাহসিকতা ও নির্লজ্জতা দেখা দিলো। প্রকাশ্যে সর্ববিধ আইনের বিরুদ্ধাচরণ হতে লাগলো এবং এব্যাপারে লজ্জার পরিবর্তে গর্ব প্রকাশ পেতে লাগলো। কিন্তু বিপ্লবের তরঙ্গ এ পর্যন্ত এসেও ক্ষান্ত হয়নি। অধুনা পাশ্চাত্য ঘেষা মহলে যাকিছু শোনা ও দেখা যাচ্ছে, তা নির্লজ্জতাকে অতিক্রম করে ইসলামের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহের লক্ষণই প্রকাশ করছে। এক্ষণে পরিস্থিতি এই দাড়িয়েছে যে, এক ব্যক্তি ইসলামী আইনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করা সত্ত্বেও নিজের অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, যেব্যক্তি আজো ঐ পুরনো আইনটি অনুসরণ করে চলছে, উল্টো তাকেই শরমিন্দা করার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে, ইসলামী আইন ভঙ্গকারী যেনো আজ আর অপরাধী বা গুনাকারী নয়; বরং অপরাধী হচ্ছে ইসলামের অনুসরণকারীরাই। আজকে নামায-রোযা শুধু পরিহারই করা হচ্ছে না, বরং এ ব্যাপারে গর্বও প্রকাশ করা হচ্ছে। সাধারণ্যে নামায-রোযা ত্যাগের স্বপক্ষে প্রচার চালানো হচ্ছে। যারা নামায পড়ে, কুরআন পাঠ করে ও রোযা পালন করে, তাদেরকে প্রকাশ্যে উপহাস করা হচ্ছে। পরন্তু নামায রোযা পালনকারীরা (বিশেষত তারা যদি শিক্ষিত হয়) নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে উল্টো নিজেরাই শরমিন্দা হবে – এই আশাবাদ পোষণ করা হচ্ছে। একজন লোকের পক্ষে নামায-রোযা ত্যাগ করা নয়; বরং তা পালন করাকেই একটা দোষাবহ ও লজ্জাজনক কাজ বলে গণ্য করা হচ্ছে। এমনকি কোনো নামাযী যদি কোনো দূষণীয় কাজ করে বসে, তাহলে অত্যন্ত বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলা হয় যে, 'লোকটা না নামাযী?' অর্থাৎ লোকটির দোষী হবার প্রকৃত কারণ হচ্ছে এমন একটি কাজ, যাকে আল্লাহ্ তায়ালা পাপাচার ও অশ্লীলতার প্রতিরোধকারী বলে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর রসূল যাকে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এই বিদ্রোহ শুধু নামায-রোযা পর্যন্তই সীমিত নয়; বরং জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এটি বিস্তার লাভ করেছে। আজকে ইসলামী বিধানের আনুগত্যকে 'মোল্লাপনা' বলে অভিহিত করা হচ্ছে। আর 'মোল্লাপনা' হচ্ছে আমাদের নব্যযুগের ভাষায় সঙ্কীর্ণদৃষ্টি, অন্ধতা, মূর্খতা, সেকেলেপনা ও নির্বুদ্ধিতার এক নিকৃষ্ট মিশ্রণের নামান্তর। অর্থাৎ মতলবটা হলো এই যে, দৃঢ়প্রত্যয়ী ও শরীয়তনিষ্ঠ মুসলমানের নামই হচ্ছে 'মোল্লা' আর 'মোল্লা' হচ্ছে এমন ব্যক্তি, সভ্যতা ও আলোকপ্রাপ্তির সঙ্গে যার কোনো দূরতম সম্পর্কও থাকবে না – সভ্য সমাজেও যে ব্যক্তি কোনো মতে খাপ খাইয়ে চলতে পারবেনা! এ হচ্ছে অসংখ্য গালির মধ্যে একটি মাত্র গালি। আর ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশের জন্যে আমাদের 'কালো ফিরিঙ্গীরা' দেশি কতকগুলো শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে সকল দোষের আধার এই 'মোল্লা' শব্দের মধ্যেই তাদের সমস্ত ভাবালুতাকে একত্রে পুরে দিয়ে থাকে।*

আজকে কোনো কথা বা কাজের সপক্ষে এটা কোনো দলিল হিসেবেই গ্রাহ্য নয় যে, তা কুরআন ও হাদিস সম্মত। কোনো অমুসলিম নয়; বরং দূর্ভাগ্যক্রমে 'শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত' বলে পরিচিত মুসলমান পর্যন্ত কুরআন ও হাদিসের প্রামাণিকতাকে নি:সঙ্কোচে উড়িয়ে দেয়। এ ব্যাপারে সে এতোটুকু লজ্জা অনুভব তো করেই না; বরং আশা করে যে, ইসলামী আইনের সনদ পেশকারী উল্টো শরমিন্দা হবে। কুরআন ও হাদিসকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা তো দূরের কথা; বরং আমাদের তো এমন অবস্থা দেখবারও সুযোগ ঘটেছে যে, কোনো বিষয়কে ইসলামের নামে পেশ করলে সঙ্গে সঙ্গেই তার বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে যায়। অথচ সেই একই বিষয়কে যুক্তি প্রমাণসহ পেশ করা হলে অথবা কোনো পাশ্চাত্য লেখকের উদ্ধৃতির সাহায্যে বর্ণনা করলে তা একেবারে নির্ভুল বনে যায়। মোটকথা, ইসলামের প্রসঙ্গ উঠলেই আমাদের পাশ্চাত্য ঘেষা মুসলমানদের মনে নানারূপে শোবা সন্দেহের সৃষ্টি হতে থাকে। তাদের মনে এই সংশয় চেপে বসে যে, এর মধ্যে অবশ্যই কোনো দুর্বলতা রয়েছে। ভাবখানা এই যে, তাদের দৃষ্টিতে আজ কুরআন ও হাদিসের প্রামাণিকতা কোনো বিষয়কে শক্তিশালী করেনা; বরং উল্টো তাকে আরো দুর্বল ও প্রমাণ সাপেক্ষ করে তোলে।

কয়েক বছর আগে এই ব্যাধি শুধু আমাদের পুরুষ মহলেই সীমিত ছিলো এবং মহিলা সমাজ ছিলো এর থেকে নিরাপদ। **অন্তত ইসলামী সভ্যতার ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যে, 'অন্তপুর' হচ্ছে তার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। এখানেই ইসলাম তার তাহযীব ও তমদ্দুনের পরিচর্যা ও নিরাপত্তা বিধান করে। ইসলাম নারীকে যেসব কারণে শরয়ী পর্দার মধ্যে রাখতে ইচ্ছুক, তার একটি বড় কারণ এই যে, যে বক্ষদেশ থেকে মুসলিম শিশু দুগ্ধ পান করে, অন্তত সে বক্ষদেশটি ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত থাকা প্রয়োজন। যে ক্রোড়ে মুসলিম শিশু প্রতিপালিত হয়, সে ক্রোড়টি অন্তত কুফর ও ভ্রষ্টতা,**

---

* এই লেখা ১৯৩৪ সালের। বর্তমানে ২০০২ সাল। এরি মধ্যে খাঁটি মুসলিমদের ঘায়েল করার জন্যে আরো অনেক উপাধি তাদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। যেমন, সন্ত্রাসী, উগ্রবাদী, মৌলবাদী, তালেবান, আল কায়েদা ইত্যাদি। - সম্পাদক।

অনৈতিকতা ও কদাচার থেকে নিরাপদ থাকা দরকার। যে দোলনায় মুসলিম সন্তানের জীবনের প্রারম্ভিক স্তরগুলো অতিক্রান্ত হয়, তার চার পার্শ্বে অন্তত খালেস ইসলামী পরিবেশ বিরাজ করা প্রয়োজন। যে চার দেয়ালের মধ্যে মুসলিম শিশুর সরল মন-মগজে শিক্ষা-দীক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রাথমিক চিত্র অঙ্কিত হয়, সেটি অন্তত বহি:প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকা আবশ্যক। কাজেই অন্তপুর হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সভ্যতার সবচাইতে সুদৃঢ় দুর্গ। এ দুর্গটিও বিধ্বস্ত হতে চলেছে। ফিরিঙ্গীপনার মহামারী আজ আমাদের অন্দর মহলেও দ্রুত প্রবেশ করছে। আমাদের পাশ্চাত্য ঘেষা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আজ তাদের স্ত্রী কন্যাদেরও টেনে হিচড়ে বাইরে নিয়ে আসছে, যাতে করে তাদের ন্যায় এরাও বিষাক্ত প্রভাবে প্রভাবিত হতে পারে। আমাদের জাতির মেয়েদেরকে আজ গুমরাহী, অবিশ্বাস, অনৈতিকতা ও ফিরিঙ্গী সভ্যতা শিক্ষা গ্রহণের জন্যে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হচ্ছে, যা ইতোপূর্বেই আমাদের ছেলেদেরকে এসবকিছু শিখিয়ে ইসলামের প্রতি বিদ্রোহী করে তুলেছে।

আমাদের মতে, এই সর্বশেষ পদক্ষেপটি উপরে উল্লেখিত বিপ্লবকে পূর্ণ পরিণতিতে নিয়ে পৌছাবে। এটা শুধু আমাদের অনুমানই নয়; বরং বিপ্লবের এই পূর্ণতার লক্ষণ আমাদের দেখবার ও শুনবার মতো দুর্ভাগ্যও হয়েছে। আজকে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, একজন মুসলমান নারী কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট বিধান অমান্য করে নির্বিবাদে আপন দেহ সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে বেড়াচ্ছে; ইংরেজি হোটেল রেস্তোঁরায় গিয়ে 'লাঞ্চ ও ডিনার' খাচ্ছে, সিনেমা হলে গিয়ে পুরুষদের মাঝে উপবেশন করছে, বাজারে ঘূরে অসঙ্কোচে কেনাকাটা করছে। অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইসলামী আইন ভঙ্গ করে এসকল কাজ করার দরুন লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবার পরিবর্তে তারা আপন কার্যকলাপকে আরো গর্বের সঙ্গে বর্ণনা করছে। উপরন্তু যে বেচারী ইসলামী আইন অনুসারে প্রথমত শরয়ী পর্দা বর্জনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং তারপর স্বামী কর্তৃক বলপূর্বক বাইরে টেনে নিয়ে আসার পর পুরুষদের মধ্যে নির্লজ্জভাবে দেহ প্রদর্শনী করতে লজ্জানুভব করছে এবং সর্বোপরি যারা বাজারের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো, নৈশক্লাবের আনন্দ ভোগ, পর্যটন কেন্দ্রের বায়ু সেবন ইত্যাদিকে আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশিত চৌহদ্দীর মধ্যবর্তী নিরানন্দের চাইতে পছন্দনীয় হয়নি – তাকে তারা নিন্দার যোগ্য বলে মনে করছে। এর মানে হচ্ছে এই যে, ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মনোবৃত্তি পুরুষদের সীমা ডিঙ্গিয়ে মেয়েদের মধ্যেও দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। পুরুষদের ন্যায় তারাও ইসলামী আইনের বিরুদ্ধাচরণকে নয়; বরং তার অনুবর্তনকেই একজন মুসলিম নারীর পক্ষে লজ্জা ও অনুতাপজনক বলে মনে করছে।

আল্লাহর ওয়াস্তে কেউ আমায় বলুন, প্রাচীন ধর্ম পরায়ণা মহিলাদের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও এদের অবস্থা যখন এই, তখন এদেরই ঘরের মেয়েরা ঈমানী সম্ভ্রমের সঙ্গে অপরিচিত হলে এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যসীমা থেকে বেরিয়ে গেলে নব্য পাশ্চাত্যঘেষা মহিলাদের ক্রোড়ে প্রতিপালিত সন্তানদের ভবিষ্যত কি দাড়াবে? যে শিশু চোখ খুলেই তার চারপাশে শুধু ফিরিঙ্গিপনারই

নিদর্শন দেখতে পাবে, যার নিষ্পাপ দৃষ্টি ইসলামী তাহ্যীব ও তমদ্দুনের কোনো লক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করবেনা, যার কানে কখনো আল্লাহ ও রসূলের কথা প্রবেশ করবেনা, যার মন মগজের নির্মল পটে শুরু থেকেই ফিরিঙ্গীপনার চিত্র অঙ্কিত হয়ে যাবে, সে তার আবেগ অনুভূতি, ধ্যান ধারণা, নৈতিক চরিত্র, কার্যকলাপ, এক কথায় কোনো একটি দিক দিয়েও মুসলমান হয়ে গড়ে উঠবে – এ প্রত্যাশা কি করা চলে?

অপরাধের প্রথম পর্যায় হলো, মানুষ অপরাধ করে, কিন্তু তাকে অপরাধই মনে করে এবং তার জন্য শরমিন্দা হয়। এই ধরনের অপরাধ শুধু নিজস্ব গুরুত্বের প্রেক্ষিতেই শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হয়; বরং তওবা বা অনুশোচনা করলে ক্ষমাও করে দেয়া যেতে পারে। কারণ এই ধরনের দায়িত্ব শুধু মানুষের দূর্বলতার ওপরই চাপানো হবে।

অপরাধের দ্বিতীয় পর্যায় হলো, মানুষ অপরাধ করে এবং তাকে দোষের পরিবর্তে গুণ মনে করে – পরন্তু তা গর্বের সঙ্গে সাধারণ্যে জাহির করে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সংশ্লিষ্ট লোকটির অন্তরে এই আইনের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই; যা তার আচরণকে অপরাধ বলে ঘোষণা করছে।

অপরাধের শেষ পর্যায় হলো এই যে, মানুষ একটি আইনের বিরুদ্ধে শুধু অপরাধই করেনা; বরং তার মোকাবিলায় অপর একটি আইন অনুযায়ী নিজের অপরাধকে সঙ্গত ও পুণ্য বলে মনে করে। পরন্তু যে আইনটি এহেন আচরণকে অপরাধ বলে ঘোষণা করছে, তাকে উপহাস করে এবং তার অনুবর্তীদেরকে অন্যায়াচারী ভাবে। এহেন ব্যক্তি শুধু আইনের বিরুদ্ধাচরণই করেনা; বরং তাকে রীতিমতো তাচ্ছিল্য করে এবং তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে লিপ্ত হয়।

যে কোনো সামান্য কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোক স্বীকার করবে যে, মানুষ যখন এই সর্বশেষ পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন যে আইনের বিরুদ্ধে সে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, তার সীমার মধ্যে সে আর থাকতে পারেনা। কিন্তু তবু পাপাত্মা শয়তান লোকদেরকে এই ভূয়া নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে, তোমরা ইসলামী আইনকে উপহাস ও তাচ্ছিল্য করো এবং তার অনুবর্তনকে দূষণীয়, বিরুদ্ধাচরণকে পুণ্যের কাজ ঘোষণা করেও মুসলমান থাকতে পারো। তাই একদিকে তারা আল্লাহ ও রসূলের ভালোকে মন্দ ও মন্দকে ভালো বলছে, তাদের গুনাহকে সওয়াব ও সওয়াবকে গুনাহ মনে করছে, তাদের নির্দেশাবলীকে উপহাস করছে, তাদের নির্ধারিত আইনের বিরুদ্ধাচরণে লজ্জা করার পরিবর্তে উল্টো তার অনুবর্তীদেরকেই লজ্জিত করার চেষ্টা করছে – অন্যদিকে তারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান পোষণকারী, তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গমকারী এবং তাদের মনোনীত দীন ইসলামের অনুবর্তী বলে নিজেদেরকে দাবি করছে। এহেন আচরণের সঙ্গে এই ধরনের দাবিকে কোনো বুদ্ধিমান মানুষই কি যথার্থ বলে স্বীকার করতে পারে? যদি ঈমানের সঙ্গে অবিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাচ্ছিল্য একত্র হতে পারে, যদি অন্তরে কাউকে সম্মান আর মুখে তাকে উপহাস করা সম্ভব হতে

পারে, যদি বিরুদ্ধাচরণে গর্ব প্রকাশকারী এবং অনুবর্তনে অপমানবোধকারী ব্যক্তিকে বাধ্য ও অনুগত বলে ধারণা করা চলে, তাহলে বিদ্রোহকে আনুগত্য, তাচ্ছিল্যকে শ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসকেই ঈমান বলে মানতে হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আঘাত হানে, সে-ই ভালোবাসে; যে উপহাস করে, সে-ই আসলে শ্রদ্ধা করে; যে মিথ্যা বলে, সে-ই সত্যবাদী প্রতিপন্ন হয় – এই উল্টো যুক্তিও স্বীকার করতে হবে!

বস্তুত ইসলাম আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই নয়, আর প্রকৃত আনুগত্য ঈমান ছাড়া কিছুতেই যথার্থ হতে পারেনা। ঈমানের সর্বপ্রথম দাবি এই যে, মানুষের কাছে আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ পৌঁছামাত্রই মাথা নতো করে দেবে এবং তা অগ্রাহ্য করে কখনো মাথা তুলতে পারবেনা ঃ

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

অর্থ ঃ মুমিনদের কাজ হচ্ছে এই যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ডাকা হবে – যাতে করে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়া যায় – তখন তারা বলবে ঃ 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।' প্রকৃতপক্ষে এরাই হচ্ছে কল্যাণপ্রাপ্ত।' (সূরা নূর ঃ ৫১)

পরন্তু এই নতি স্বীকারও অনিচ্ছা ও বিরক্তির সঙ্গে নয়; বরং স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে করতে হবে। এমনকি আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে মনে কোনো প্রচ্ছন্ন বিরক্তি কিংবা অসন্তোষও রাখা যাবেনা। যে ব্যক্তির মাথা কেবল দৃশ্যত নতো হবে আর মনে বিরক্তি অনুভব করবে, সে মুমিন নয়; বরং মুনাফিক ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا... فَلَا وَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

অর্থ ঃ যখনি তাদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ও রসূলের দিকে এসো, তখন তুমি দেখেছো যে, মুনাফিকরা তোমাদের দিকে আসতে ইতস্তত করে। ...তোমার প্রভুর শপথ! তারা কখনোই মুমিন হতে পারবেনা, যতোক্ষণ না তারা নিজেদের মতানৈক্যের ব্যাপারে তোমাকে ফয়সালাকারী বলে স্বীকার করবে এবং তুমি যা কিছু ফয়সালা করে দেবে, সে সম্পর্কে মনে কোনো বিরক্তি বোধ না করে তার সামনে মাথা নতো করে দেবে।' (সূরা নিসা ঃ ৬১-৬৫)

কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করবে, আল্লাহ ও রসূলের বিধান পরিহার করে অন্যবিধ কানুনের অনুবর্তন করবে এবং তাকেই সত্য-যথার্থ মনে করবে, ভিন্ন আইনের অনুবর্তনকালে আল্লাহ ও রসূলের কানুনকে উপহাস করবে এবং তার আনুগত্যকে দূষণীয় কাজ মনে করবে, সে কিছুতেই মুমিন হতে

পারেনা। এমন ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করুক আর মুসলমানের ন্যায় নাম ধারণ করুক, কিংবা আদম শুমারী খাতায় সে মুসলমান হিসেবে স্বীকৃত হোক – তাতে কিছুই আসে যায়না। মানুষ গুনাহ করেও মুমিন থাকতে পারে; কিন্তু তার জন্যে শর্ত এই যে, গুনাহকে গুনাহ ভাবতে হবে এবং তার জন্যে অনুতপ্ত হতে হবে। পরন্তু যে আইনের বিরুদ্ধে নিছক চারিত্রিক দুর্বলতার কারণেই একটি অপরাধ করে বসেছে, তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু গুনাহর সঙ্গে যখন নির্লজ্জতা ও দুসাহসিকতার মিশ্রণ ঘটে, তার জন্যে গর্ব ও অহঙ্কার প্রকাশ করা হয় এবং তাকে পুণ্যকাজ বিবেচনা করে তাতে লিপ্ত না হওয়ার দরুন কাউকে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা হয় – তখন আল্লাহর শপথ! এমন দুষ্কৃতির সঙ্গে কখনো ঈমান টিকে থাকতে পারেনা। এই পর্যায়ে কারো প্রবেশ করতে হলে পূর্বাহ্নেই তাকে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, সে কি মুসলমান থাকতে ইচ্ছুক, না ইসলামকে পরিহার করে যে আইনের অনুবর্তন করে মর্যাদাবোধ করছে, তার আনুগত্য সীমায় প্রবেশ করতে উৎসুক?

আল্লাহর ফযলে মুসলিম জনসাধারণ এখনো পর্যন্ত ফিরিঙ্গীপনা ও কুফরীসূলভ বিদ্রোহের এই বন্যা প্রবাহ থেকে নিরাপদ রয়েছে। এখনো পর্যন্ত তাদের অন্তরে আল্লাহ ও রসূলের বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা বাকি রয়েছে। তাদের মধ্যেই ইসলামী আইনের অনুসৃতি কম বেশি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর চালচলন পূর্বে যেমন তাদের স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহারের ওপর প্রভাবশালী হয়েছে, তেমনি তাদের ঈমানের ওপর নব্য রীতিনীতিরও ধীরে ধীরে ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা রয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে হারে নামায রোযা পরিত্যাগ, দুষ্কৃতি ও পাপানুষ্ঠান, ফিরিঙ্গী রীতিনীতির অনুকৃতি এবং ফিরিঙ্গী সভ্যতার খোলস্বরূপ চোখঝলসানো খেল তামাশার প্রতি আগ্রহ বেড়ে চলছে, তা এই প্রত্যাসন্ন বিপদেরই ঘন্টাধ্বনি মাত্র। আমাদের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি যদি পরিশুদ্ধ না হয় এবং ইসলামের সিরাতুল মুস্তাকীমের প্রতি তাদের বিরূপতা এভাবেই অব্যাহত থাকে, তবে সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন সমগ্র জাতিই এই পাপ সমুদ্রে ডুবে যাবে এবং আল্লাহর এই সুন্নতও পূর্ণতা লাভ করবে ঃ

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا .

অর্থ ঃ আমরা যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করে দিতে চাই তখন সেখানকার দুস্কৃতকারী লোকদেরকে সীমা লংঘনের কাজে লিপ্ত করে দিই। ফলে সে জনপদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। তখন আমি তাকে সমূলে ধ্বংস করে দিই। (সূরা ইসরা ঃ আয়াত ১৬)

❖ ❖ ❖

১৩

সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ ও বাঁচার উপায়*

কুরআন মজীদে এই সত্যটি একটি সাধারণ নীতি হিসেবে বিবৃত হয়েছে যে, কোনো জাতি সৎকর্মশীল হলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে অযথা ধ্বংস করে দেবেন – তিনি এমন জালিম নন ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ .

অর্থ ঃ তোমাদের প্রভু এমন নন যে, তিনি জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন – যদি তার বাসিন্দারা সৎকর্মশীল হয়।' (সূরা হুদ ঃ ১১৭)

ধ্বংস ও বিনাশ করার মানে কেবল জনপদগুলোকে বিপর্যস্ত করা এবং তার অধিবাসীকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করাই নয়; বরং তার একটি বিশিষ্ট পন্থা হলোঃ জাতিসমূহকে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, তাদের সামগ্রিক শক্তিকে চূর্ণ করে ফেলা এবং তাদেরকে পরাভূত ও পদানত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা। তবে উল্লিখিত নীতির ভিত্তিতে কোনোরূপ ধ্বংস ও বিনাশ কোনো জাতির উপর ততোক্ষণ পর্যন্ত আপতিত হতে পারেনা, যতোক্ষণ না সে কল্যাণ ও সংস্কারের পথ বর্জন করে অনিষ্ট, বিশৃংখলা, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের পথে চলতে থাকে এবং এভাবে নিজেই নিজের জন্যে জুলুম ডেকে আনে। এই নীতিকে সামনে রেখে আল্লাহ তায়ালা যেখানেই কোনো জাতিকে আযাবে নিক্ষেপ করার কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে তাদের অপরাধের কথাও সঙ্গে সঙ্গে বিবৃত করেছেন – যাতে করে লোকেরা উত্তমরূপে জানতে পারে যে, তাদের আপন কর্মদোষেই তাদের ইহকাল ও পরকাল বরবাদ হয়ে থাকে ঃ

فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ - وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ . (العنكبوت : ٤٠)

অর্থ ঃ প্রত্যেককেই আমরা তার অপরাধের জন্যে পাকড়াও করেছি। আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেননা; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিলো।' (আল-আনকাবূত ঃ ৪০)

এই নীতি থেকে উদ্ভুত দ্বিতীয় বিষয়টি হলো এই যে, ধ্বংস ও বিনাশের কারণ ব্যক্তিগত পাপাচার নয়; বরং সামগ্রিক তথা জাতীয় ও জাতীয় পাপাচার। অর্থাৎ বিশ্বাস ও আচরণের বিকৃতি যদি লোকদের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যায়, কিন্তু মোটামুটিভাবে লোকদের ধর্মীয় ও নৈতিক মান উন্নত হয় এবং তার প্রভাবে

---

* প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম ১৯৩৫ সালের মার্চে তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। - সম্পাদক

ব্যক্তিগত অনাচার চাপা পড়ে থাকে, তাহলে পৃথক পৃথকভাবে ব্যক্তিরা যতোই খারাপ হোক না কেনো, সামগ্রিকভাবে জাতি বেঁচে থাকেই। সে অবস্থায় এমন কোনো ফিতনার সৃষ্টি হয়না, যা গোটা জাতির বিনাশের কারণ হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস ও আচরণের বিকৃতি যখন ব্যক্তিকে অতিক্রম করে গোটা জাতির মধ্যে ব্যাপ্তিলাভ করে এবং জাতির ধর্মবোধ ও নৈতিক চেতনা একেবারে বিগড়ে যায়, আর তাতে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণেরই বিকাশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সে জাতির ওপর থেকে আল্লাহ তায়ালার কৃপা দৃষ্টি একেবারে উঠে যায়। অতপর সে সম্ভ্রমের উচ্চাসন থেকে অপমানের নিম্নস্তরে নামতে থাকে। এমনকি এক সময় আল্লাহ্ তায়ালার কোপানল তার বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে এবং তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়া হয়।

কুরআনে হাকীমে এর বহুতরো দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত নূহের জাতির মধ্যে যখন বিশ্বাস ও আচরণের বিকৃতি শিকড় গেড়ে বসলো এবং চারদিকে তা বিস্তৃতি লাভ করলো, সেই সঙ্গে এই বিষবৃক্ষ থেকে মিষ্টি ফল লাভের আশাও একেবারে তিরোহিত হয়ে গেলো, তখনই তাকে ধ্বংস করে দেয়া হলো। শেষ পর্যন্ত হযরত নূহ আ. বাধ্য হয়ে রব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করলেন ঃ

رَبِّ لَاتَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا - اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَايَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا .

অর্থ ঃ আমার প্রভু! দুনিয়ার বুকে এই কাফিরদের মধ্য থেকে একজনকেও জীবিত রেখোনা। তুমি যদি এদেরকে বাঁচিয়ে রাখো তো তোমার বান্দাদের এরা গুমরাহ করে ফেলবে এবং এদের বংশ থেকে শুধু কদাচারী ও নিরেট অবিশ্বাসীরাই জন্মলাভ করবে।' (সূরা নূহ ঃ ২৬-২৭)

আ'দ সম্প্রদায়কে তখনি ধ্বংস করা হলো, যখন তার অন্তরে পাপাচার একেবারে শিকড় গেড়ে বসলো, জালিম, দুবৃর্ত্ত ও বিপর্যয়কারী লোকেরা তাদের নেতা ও শাসকের মর্যাদা লাভ করলো এবং কল্যাণ ও মঙ্গলকামী লোকদের জন্যে সামাজিক-সামগ্রিক ব্যবস্থায় কোনো স্থানই বাকী রইলোনা ঃ

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ .

অর্থ ঃ আ'দ সম্প্রদায় তাদের প্রভুর আদেশকে অগ্রাহ্য করলো এবং তার রসূলদের অবাধ্যতা করলো আর প্রত্যেক উদ্ধত সত্য দুশমনের আনুগত্য করলো।' (সূরা হুদ ঃ ৫৯)

লুত সম্প্রদায়কে তখনি ধ্বংস করা হলো, যখন তাদের নৈতিক চেতনার চরম অবনতি ঘটলো এবং নির্লজ্জতা এতোখানি বৃদ্ধি পেলো যে, প্রকাশ্য মজলিস ও হাট বাজারে পর্যন্ত ব্যভিচার হতে লাগলো; এমনকি ব্যভিচারকে ব্যভিচার মনে করার মতো অনুভূতিই লোকদের মধ্যে বাকী রইলোনা ঃ

اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ . (سورة العنكبوت : ٩)

অর্থ ঃ (লুত বললেন), তোমরা কেন মেয়েদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে গমন করো এবং পথচারীদেরকে উৎপাত করো আর (প্রকাশ্যে) মজলিসে বসে ব্যভিচার করো?' (সূরা আনকাবূত ঃ ৯)

মাদায়েনবাসীদের ওপর ঠিক তখনি গযব নাযিল হলো, যখন গোটা জাতি বেঈমান, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হলো। ওজনে কম দেয়া ও বেশি নেয়া কোনো দূষণীয় কাজ রইলোনা। জাতির নৈতিক চেতনা এতোখানি বিলুপ্ত হলো যে, এহেন দূষণীয় কাজের জন্য তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হলে লজ্জায় মাথা নতো করার পরিবর্তে উল্টো ভর্ৎসনাকারীকেই তারা তিরস্কার করতো। এমনকি তাদের কোনো কাজ যে ভর্ৎসনাযোগ্য হতে পারে, এ কথাটিই তাদের বোধগম্য হতোনা। তারা ব্যভিচারকে দূষণীয় মনে করতোনা; বরং এই কাজটিকে যে ব্যক্তি মন্দ বলতো, তাকেই ভ্রান্ত ও নিন্দার্হ বিবেচনা করতো ঃ

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ..... قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا. وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ .

অর্থ ঃ (শুয়াইব বল্লেন), হে আমার জাতি! ইনসাফের সঙ্গে মাপো এবং ওজন করো, লোকদেরকে তাদের জিনিসপত্র কম দিওনা এবং দুনিয়ায় ফাসাদ ছড়িয়োনা। .....তারা বললো, হে শুয়াইব! তুমি যা কিছু বলছো, তার অধিকাংশই আমাদের বোধগম্য হচ্ছেনা। আমরা তোমাকে খুবই দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। যদি তোমার গোত্রটি না থাকতো তো আমরা তোমায় 'সঙ্গেসার' করে দিতাম।' (সূরা হূদ ঃ ৮৫-৯১)

বনী ঈসরাঈলকে অপমান, লাঞ্ছনা ও গযব-অভিশাপোর মধ্যে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত তখনি কার্যকরী হলো, যখন তারা জুলুম, দুষ্কৃতি ও হারামখোরীর দিকে ছুটতে লাগলো। তাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সুবিধাবাদের ব্যাধি সংক্রমিত হলো। সাধারণ লোকদের মধ্যে পাপাচারের সঙ্গে সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি হলো এবং অন্যায়কে অন্যায় বলা এবং তার থেকে বিরত রাখার মতো কোনো মানবগোষ্ঠী বাকী রইলোনা ঃ

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ لَوْلَايَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ

وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَصْنَعُوْنَ . (سورة المائدة : ٦٣-٦٢)

অর্থ ঃ তুমি তাদের অধিকাংশকেই দেখছো যে, পাপাচার ও খোদা নির্ধারিত সীমালংঘন এবং হারামখোরীর দিকে ছুটে চলেছে। তারা কিরূপ নিকৃষ্ট কাজ করে যাচ্ছিলো! তাদের পীর ও আলিমরা কেন তাদেরকে মন্দ কথা বলতে এবং হারাম মাল খেতে বারণ করলোনা? তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ করছিলো।' (সূরা মায়েদা ঃ ৬২-৬৩)

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ـ كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ .

অর্থ ঃ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা কুফরী করলো, তাদের প্রতি দাঊদ ও ঈসা বিন্ মরিয়মের ভাষায় লানত করানো হলো; এই জন্যে যে, তারা বিদ্রোহ করেছিল এবং সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তারা অপরকে দুষ্কর্ম থেকেও বিরত রাখতোনা। (সূরা মায়েদা ঃ ৭৮-৭৯)

এই সর্বশেষ আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী করীম সা. থেকে যে হাদিসগুলো বর্ণিত আছে, কুরআনে করীমের উদ্দেশ্যকে তা আরো সুস্পষ্ট করে তোলে। হাদিসগুলোর সার সংক্ষেপ হলো – নবী করীম সা. বলেছেন ঃ

> বনী ইসরাঈলের মধ্যে যখন পাপাচারের বিস্তৃতি শুরু হলো, তখনকার অবস্থা ছিলো এই যে, এক ব্যক্তি তার ভাই, বন্ধু বা পড়শীকে দুষ্কর্ম করতে দেখলে বারণ করতো। তাকে বলতো, 'ওহে! খোদাকে ভয় করে চলো।' কিন্তু তারপর সে (প্রথমোক্ত) লোকটি তারই সঙ্গে মেলামেশা ও ওঠাবসা করতো। এমনকি ঐ পাপাচারী লোকটির দুষ্কৃতি প্রত্যক্ষ করেও তার সঙ্গে মেলামেশা ও পানাহারে অংশগ্রহণ করতে সে বিরত হতোনা। অবস্থা যখন এমনি দাঁড়ালো, তখন তাদের একের ওপর অন্যে প্রভাব বিস্তার করলো। ফলত আল্লাহ সবাইকে এক রঙে রাঙিয়ে দিলেন এবং তাদের নবী দাউদ ও ঈসা বিন মরিয়মের ভাষায় তাদের ওপর অভিসম্পাৎ করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন যে, বক্তৃতা প্রসঙ্গে নবী করীম সা. এই পর্যন্ত পৌঁছেই আবেগের আতিশয্যে বসে পড়েন এবং বলেন ঃ

> **যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! লোকদেরকে সুকৃতির আদেশ দেয়া ও দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখা, কাউকে অসৎ কাজ করতে দেখলে বাধা দান করা ও তাকে সৎপথে চালিত করা এবং এ ব্যাপারে কিছুমাত্র উদারতা না দেখানো তোমাদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য। নচেত আল্লাহ্**

তোমাদের একের মনের উপর অন্যের প্রভাব বিস্তার করে দেবেন এবং বনী ইসরাঈলের মতোই তোমাদের ওপর অভিসম্পাৎ করবেন।

বস্তুত বিশ্বাস ও আচরণের বিকৃতি হচ্ছে মহামারীর অনুরূপ। যে কোনো মহামারী প্রথমত কতিপয় দুর্বল লোককে আক্রমণ করে। এমতাবস্থায় আবহাওয়া ভালো হলে, স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগের প্রচেষ্টা সঠিক হলে, ময়লা ও আবর্জনা সাফ করবার ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট হলে এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির যথাসময়ে চিকিৎসা করা হলে ব্যাধি আর ব্যাপক মহামারীর রূপ ধারন করতে পারেনা; বরং জনসাধারণ তার আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। কিন্তু একই ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা যদি অলস ও দায়িত্বহীন হয়, স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ উদাসীন হয়, পরিচ্ছতা বিধানকারীরা ময়লা ও আবর্জনাকে প্রশ্রয় দেয়, তবে রোগ জীবাণু ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়াতে থাকে এবং আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে পরিবেশকে অত্যন্ত খারাপ করে তোলে। ফলে তা স্বাস্থ্যের পরিবর্তে রোগের পক্ষে অনুকূল হয়ে উঠে। অবশেষে সমাজের সাধারণ লোকেরা যখন হাওয়া, পানি, খাদ্য, পোশাক, বাড়ি মোটকথা কোনো জিনিসকেই ময়লা ও দুর্গন্ধমুক্ত পায়না, তখন তাদের জীবনীশক্তি দুর্বল হতে থাকে এবং গোটা সমাজই ব্যাপক মহামারীর কবলে নিক্ষিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় বড় শক্তিমান ব্যক্তির পক্ষেও রোগের কবল থেকে আত্মরক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি খোদ চিকিৎসক, পরিচ্ছন্নতা বিধানকারী ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের সংরক্ষকরা পর্যন্ত রোগের কবলে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে যারা নিজেদের ব্যাপারে অন্তত স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়গুলো অবলম্বন করে নিয়মিত ওষুধাদি সেবন করে, তারাও ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়না। কারণ তাদের কাছে বাতাসের বিষাক্ততা, পানির নোংরামী, খাদ্যবস্তুর দূষণীয়তা ও মাটির কলুষতার কি প্রতিকার আছে?

এরই পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিকতা ও আচরণের বিকৃতি এবং চিন্তা বিশ্বাসের ভ্রষ্টতাকে অনুমান করে নেয়া যেতে পারে। আলিমরা হচ্ছেন জাতির চিকিৎসক। শাসক ও বিত্তবানরা তার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে দায়িত্বশীল। জাতির ঈমানী সম্ভ্রম ও সমাজের নৈতিক চেতনা হচ্ছে জীবনীশক্তির তুল্য। সামাজিক পরিবেশ হচ্ছে হাওয়া, পানি, খাদ্য, পোশাক ও বাড়ীর অনুরূপ। আর জাতীয় জীবনে ধর্ম ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ হচ্ছে দৈহিক সুস্থতার দৃষ্টিতে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত প্রচেষ্টার সমতুল্য। এমতাবস্থায় আলিম ও শাসক সম্প্রদায় যখন তাদের আসল দায়িত্ব – অর্থাৎ সুকৃতির প্রতিরোধ পরিহার করে দুষ্কৃতির ও বিকৃতির সঙ্গে আপোষরক্ষা করতে থাকে, তখন জাতির মধ্যে অনাচার, পাপাচার ও অনৈতিকতা বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে জাতির ঈমানী সম্ভ্রম ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। এমনকি পরিণামে গোটা সামাজিক পরিবেশই বিকৃতিদুষ্ট হয়ে যায়। জাতির জীবন পরিবেশ কল্যাণ ও সুকৃতির জন্যে প্রতিকূল এবং দুষ্কৃতি ও বিকৃতির জন্যে অনুকূল হয়ে ওঠে। লোকেরা সুকৃতির দিক থেকে পালাতে থাকে এবং দুষ্কৃতিকে ঘৃণা করার পরিবর্তে তার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। লোকদের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণ বদলে যায়।

দোষ গুণের স্থান আর গুণ দোষের স্থান দখল করে বসে। এমতাবস্থায় গোমরাহী, কদাচার ও অনৈতিকতা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। কল্যাণ ও সুকৃতির কোনো বীজেরই প্রস্ফুটিত ও ডালপালায় পল্লবিত হবার সামর্থ থাকেনা। মাটি, হাওয়া, সবই তাকে প্রতিপালন করতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ তাদের সমগ্র শক্তিই বিষবৃক্ষের বিকাশ বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত হয়ে যায়। বস্তুত কোনো জাতির সামগ্রিক অবস্থা যখন এই পর্যায়ে এসে পৌছে, তখনি সে খোদায়ী আযাবের উপযোগী হয়ে উঠে। তার প্রতি এমন ধ্বংসলীলা অবতীর্ণ হতে থাকে যে, তার কবল থেকে কেউ নিষ্কৃতি পেতে পারেনা। এমনকি কেউ খানকার মধ্যে আত্মগোপন করে দিনরাত ইবাদত বন্দোগীতে মশগুল থাকলেও তার রেহাই নেই।

এই অবস্থা সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّاتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً .

অর্থ ঃ সেই ফিতনাকে ভয় করো, যা শুধু তোমাদের মধ্যকার জালিম ও পাপাচারী লোকদেরকেই দুর্যোগের মধ্যে নিক্ষেপ করবেনা।' (সূরা আনফাল ঃ ২৫)

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন ঃ 'এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার অভিপ্রায় হচ্ছে এই যে, তোমরা দুষ্কৃতিকে নিজেদের সামনে দৃঢ়মূল হতে দিওনা; কারণ দুষ্কৃতির সঙ্গে তোমরা আপোষ রফা করলে এবং তাকে বিস্তার লাভের সুযোগ দিলে আল্লাহ্র তরফ থেকে ব্যাপক আযাব নাযিল হবে এবং ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সবাই তার কবলে নিক্ষিপ্ত হবে।' একটি হাদিস থেকে জানা যায় খোদ নবী করীম সা. এই আয়াতের ব্যাখ্যা দান করে বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَايُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ خَاصَّةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّنْكِرُوْهُ فَلَا يُنْكِرُوْهُ فَاِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ عَذَابَ اللّٰهِ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ .

অর্থ ঃ আল্লাহ্ বিশিষ্ট লোকদের কাজের জন্যে সাধারণ লোকদেরকে আযাব দেননা; কিন্তু তারা যখন নিজেদের সামনে দুষ্কৃতিকে দেখতে থাকে এবং প্রতিরোধ করার শক্তি থাকতেও তাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে না আসে, তখন বিশিষ্ট ও সাধারণ সবাইকে আল্লাহ্ আযাবের কবলে নিক্ষেপ করেন।'

জাতির নৈতিক ও ধর্মীয় স্বাস্থ্যকে অটুট রাখবার সবচাইতে বড় উপায় হলো এই যে, তার প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই ঈমানী সম্ভ্রম ও নৈতিক চেতনা বর্তমান থাকতে হবে। নবী করীম সা. একে একটি ব্যাপক অর্থপূর্ণ শব্দ 'হায়া' যা লজ্জাশীলতা দ্বারা আখ্যায়িত করেছেন। 'হায়া' হচ্ছে আসলে ঈমানেরই একটি শাখা। তিনি বলেছেন ঃ إِنَّ الْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অংগ।' এমনকি একবার হযরতের কাছে নিবেদন করা হলো যে, 'হায়া' হচ্ছে আসলে দীনের একটি অংশ।' তিনি বললেন ঃ بَلْ هُوَالدِّيْنُ كُلُّهٗ – বরং তা পূর্ণাঙ্গ দীন।

হাদিসে উল্লেখিত 'হায়া' শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, দুষ্কৃতি ও পাপাচার দেখামাত্রই লোকদের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ স্পৃহা জেগে উঠবে এবং হৃদয় মন তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করবে। এই গুণটি যার মধ্যে বর্তমান থাকবে, সে কেবল অন্যায় থেকে বিরতই হবেনা; বরং অন্যের মধ্যেও এর অস্তিত্ব বরদাশ্‌ত করবেনা। দুষ্কৃতির প্রতি সে উদারতা দেখাবেনা। জুলুম ও পাপাচারের সঙ্গে আপোষ রফা করা তার পক্ষে সম্ভব হবেনা। তার সামনে কোনো দুষ্কর্ম অনুষ্ঠিত হলে তার ঈমানী সম্ভ্রম অমনি উদ্দীপিত হয়ে উঠবে। সে তাকে হাত বা মুখ দিয়ে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করবে কিংবা অন্তত তাকে নিশ্চিহ্ন করার আকাঙ্ক্ষায় তার হৃদয় মন উদ্বেল হয়ে উঠবে ঃ

مَنْ رَاَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانَ .

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো দুষ্কৃতি দেখতে পেলে তাকে নিজ হাতে নিশ্চিহ্ন করবে, এতে অক্ষম হলে মুখ দিয়ে (চেষ্টা করবে), আর এতেও অক্ষম হলে অন্তর দিয়ে (ঘৃণা) করবে; আর এ হচ্ছে দুর্বলতম ঈমানের লক্ষণ!' (মুসনাদে আহমদ)

যে জাতির মধ্যে এ গুণটি সাধারণভাবে বর্তমান থাকবে, তার দীন ও ধর্ম সুরক্ষিত থাকবে। তার নৈতিক মানের কদাচ অবনতি ঘটবেনা। কারণ তার প্রতিটি ব্যক্তিই হবে অপরের জন্যে তত্ত্বাবধায়ক ও জিজ্ঞাসাবাদকারী। তার মধ্যে প্রত্যয় ও আচরণের বিকৃতি নাক গলানোরই পথ খুঁজে পাবেনা।

প্রকৃতপক্ষে কুরআন মজীদের লক্ষ্যই হচ্ছে এমনি একটি আদর্শ সমাজ গঠন করা, যে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই আন্তরিক ঝোঁক-প্রবণতা ও স্বাভাবিক লজ্জা সম্ভ্রম এবং নিজস্ব বিবেকের তাড়নায় জিজ্ঞাসাবাদ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করবে এবং কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই খোদায়ী ফৌজদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا .

অর্থ ঃ এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক ন্যায়পরায়ণ ও মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি যাতে করে তোমরা লোকদের ওপর তত্ত্বাবধানকারী হও আর রসূল তোমাদের প্রতি তত্ত্বাবধানকারী হন।' (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)

এ জন্যেই বারবার মুসলমানদের বলা হয়েছে, সুকৃতির আদেশ দান এবং দুষ্কৃতির প্রতিরোধকরণ হচ্ছে তোমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট। এটি প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যেই পরিস্ফুট হওয়া উচিত ঃ

كُنْتُمْ خَيْرًا اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ .

অর্থ ঃ তোমরাই উৎকৃষ্ট জাতি; তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে লোকদের (কল্যাণের) জন্যে। তোমরা (লোকদেরকে) সুকৃতির আদেশ দাও এবং দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করো আর আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান পোষণ করো।' (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

অর্থ ঃ মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের মদদগার; তারা সুকৃতির আদেশ দেয় এবং দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করে।' (সূরা তওবা ঃ ৭১)

اَلْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ .

অর্থ ঃ তারা সুকৃতির আদেশদাতা, দুষ্কৃতির প্রতিরোধকারী এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা সংরক্ষণকারী।' (সূরা তওবা ঃ ১১২)

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ .

অর্থ ঃ এদেরকে আমরা দুনিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতা দান করলে এরা নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দান করবে, সুকৃতির আদেশ দেবে ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করবে।' (সূরা হজ্জ ঃ ৪১)

মুসলমানদের অবস্থা যদি এরূপ হয়, তাহলে তাদেরকে এমন একটি লোকালয়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যার প্রতিটি বাসিন্দার মধ্যেই পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষাবোধ বর্তমান রয়েছে। তারা শুধু নিজেদের দেহ এবং গৃহকেই পাক সাফ রাখেনা; বরং লোকালয়ের যে কোনো জায়গায় ময়লা ও আবর্জনা দেখলে তা দূর করে ফেলে। তারা কোথাও ময়লা, আবর্জনা ও দুর্গন্ধ থাকতে দেয়ার পক্ষপাতী নয়। স্পষ্টত এমনি লোকালয়ের আবহাওয়া পাক সাফ ও পরিচ্ছন্ন থাকতে বাধ্য। এখানে রোগ জীবাণু সৃষ্টি হবার কোনো সুযোগই পাবেনা। যদি ঘটনাচক্রে কেউ দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়েও পড়ে, তবু যথাসময়ে তার চিকিৎসা হবে; কিংবা অন্তত তার রোগটা ব্যক্তিগত রোগ পর্যন্ত সীমিত থাকবে অন্য লোকদের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে ব্যাপক মহামারীর রূপ ধারণ করবেনা।

কিন্তু মুসলিম জাতি যদি এই উন্নত নৈতিক মান বজায় রাখতে না পারে, তাহলে সমাজের দীনি ও নৈতিক স্বাস্থ্য টিকিয়ে রাখার জন্যে অন্তত একটি দল তাদের মধ্যে অবশ্যই বর্তমান থাকা উচিত। এই দলটি সর্বদা এই খেদমত আঞ্জাম দেবার জন্যে তৈরি থাকবে এবং লোকদের চিন্তা বিশ্বাসের ময়লা ও স্বভাব চরিত্রের অপবিত্রতা দূর করতে থাকবে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকা উচিত, যারা (লোকদেরকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে, সুকৃতির আদেশ দেবে ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করবে।' (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)

এই দলটি হচ্ছে আলিম ও শাসকবর্গের সম্মিলিত দল। এর পক্ষে সুকৃতির আদেশ দান ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধে ব্যাপৃত থাকা ততোটাই আবশ্যক, শহরের পরিচ্ছন্নতা বিধান ও স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত বিভাগের পক্ষে আপন দায়িত্ব সম্পাদনে সচেতন থাকা যতোটা প্রয়োজন। এই শ্রেণীর লোকেরা যদি আপন কর্তব্য পালনে গাফিল হয়ে যায় এবং জাতির মধ্যে সুকৃতির দিকে আহবান ও দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখার মতো একটি দলও বর্তমান না থাকে, তাহলে ধর্ম ও নৈতিকতার দিক থেকে জাতির বিনাশ ঠিক তেমনি নিশ্চিত, যেমন দেহ ও প্রাণের দিক থেকে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাহীন লোকালয়ের ধ্বংস সুনিশ্চিত। প্রাচীন জাতিগুলোর ওপর যে ধ্বংসলীলা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণ এই যে, তাদেরকে দুষ্কৃতিতে বাধা দান এবং সুকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার মতো কোনো দলেরই অস্তিত্ব তখন ছিলোনা ঃ

فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْ بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الاَرْضِ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ .

অর্থ ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে অন্তত এমন শিক্ষিত ও জ্ঞানবান লোকই বা থাকলোনা কেন, যারা দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি থেকে (লোকদেরকে) বিরত রাখত – কেবল যে কয়টি লোককে আমরা তাদের মধ্য থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি, তাদের ছাড়া।' (সূরা হূদ ঃ ১১৬)

لَوْلاَيَنْهٰهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ .

অর্থ ঃ তাদের আলিম ও পীরগণ কেন তাদেরকে কুকথা বলা ও হারামখোরী থেকে বিরত রাখলোনা?' (সূরা মায়েদা ঃ ৬৩)

কাজেই এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জাতির আলিম, পীর ও শাসকদের দায়িত্বই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারা শুধু আপন কৃতকর্মের জন্যেই দায়িত্বশীল নয়; বরং গোটা জাতির কৃতকর্মের দায়িত্ব অনেকটা তাদের ওপর ন্যস্ত। জালিম, নিপীড়ক ও বিলাসপ্রিয় শাসক এবং তাদের তোষামোদকারী আলিম ও পীরদের কথা আর কি বলা যায়! আল্লাহ্‌র কাছে তাদের যে পরিণতি হবে, তার উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে শাসক, আলিম ও পীর সম্প্রদায় আপন লোকালয়, গৃহকোণ ও খানকার মধ্যে বসে তাকওয়া, পরহেজগারী, ইবাদত ও দরবেশীপনার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন, তাঁরাও আল্লাহ্‌র কাছে

জিজ্ঞাসাবাদ থেকে রেহাই পাবেননা। কারণ তাদের জাতির ওপর চারদিক থেকে যখন গুমরাহী ও অনৈতিকতার ঝড় ঝঞ্ঝা ধেয়ে আসছে, তখন গৃহকোণে শুধু মাথা নুইয়ে বসে থাকা তাদের কাজ নয়; বরং তাদের কাজ হচ্ছে বীর পুরুষের ন্যায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং আল্লাহ্ তাঁদেরকে যাকিছু শক্তিসামর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছেন, তার সাহায্যে ঐ ঝড় ঝাঞ্ঝার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ঝড় ঝঞ্ঝাকে দূরীভূত করার দায়িত্ব অবশ্য তাদের ওপর ন্যস্ত নয়, কিন্তু তার মোকাবিলায় নিজের তামাম সম্ভাব্য শক্তি নিয়োজিত করার দায়িত্ব অবশ্যই তাদের ওপর আরোপিত। এ কাজে তারা কিছুমাত্র অবহেলা করলে তাদের ব্যক্তিগত ইবাদত বন্দেগী ও তাকওয়া পরহেযগারী তাদের পারলৌকিক জবাবদিহি থেকে মোটেই নিষ্কৃতি দেবেনা। কোনো শহরে যদি মহামারী বিস্তার লাভ করে এবং তাতে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করতে থাকে আর এমতাবস্থায় পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগের কোনো কর্মচারী নিজের ঘরে বসে শুধু নিজের ও সন্তান সন্ততির জীবন রক্ষার চেষ্টা করতে থাকে, তবে এমন কর্মচারীকে কেউ কখনো নিরাপরাধী দায়িত্বশীল বলবেনা। কোনো সাধারণ নাগরিক এরূপ করলে ততোটা আপত্তিকর হয়না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগের কোনো অফিসার এরূপ করলে তার অপরাধী হবার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহের অবকাশ থাকেনা।

❖ ❖ ❖

১৪

ঈমান ও আনুগত্য*

সামাজিক ব্যবস্থা যে ধরনের এবং যে উদ্দেশ্যের হোকনা কেন, তার প্রতিষ্ঠা, সংস্থিতি ও সাফল্যের জন্যে দু'টি জিনিস হামেশাই প্রয়োজন। প্রথমত, যে নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে কোনো সমাজ গঠিত হবে, সে নীতি গোটা সমাজ ও তার প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে বদ্ধমূল হবে এবং তার প্রতি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিরই সর্বাধিক অনুরুক্তি থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, সমাজে আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার ভাবধারা বর্তমান থাকতে হবে। অর্থাৎ সে যাকে নির্দেশদাতা বলে স্বীকার করবে, তার নির্দেশের পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে, তার নির্ধারিত বিধিব্যবস্থার কঠোরতার সঙ্গে অনুবর্তী হতে হবে এবং তার নির্দিষ্ট সীমারেখা কখনো লংঘন করতে পারবেনা। যে কোনো ব্যবস্থাপনার কামিয়াবীর জন্যে এগুলো হচ্ছে অপরিহার্য শর্ত। ব্যবস্থাপনা সামরিক হোক কি রাজনৈতিক, সামাজিক হোক কি ধর্মনৈতিক এ দু'টি শর্ত ছাড়া তা না কায়েম হতে পারে, আর না তার লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম।

দুনিয়ার গোটা ইতিহাস খুলে দেখুন। কাপুরুষ, মুনাফিক, অবাধ্য ও অননুগত লোকদের নিয়ে কোনো আন্দোলন কামিয়াব হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তা চলমানও রয়েছে এমন একটি দৃষ্টান্ত কেউই খুঁজে পাবেনা। এ ব্যাপারে কারো ইতিহাস ঘাঁটা ঘাঁটিরও প্রয়োজন নেই। একবার নিজেদের চারদিকেই চোখ বুলিয়ে দেখুন। যে সেনাবাহিনী তার আপন রাজ্য ও প্রধান সেনাধ্যক্ষের অনুগত ও আজ্ঞানুবর্তী নয়, যার সৈনিকরা সামরিক নিয়ম কানুনের অনুবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানায়, কুচকাওয়াজের জন্যে বিউগল বাজলে কোনো সৈনিকই নিজের জায়গা থেকে নড়তে প্রস্তুত নয়, কমাণ্ডার কোনো নির্দেশ দিলে সৈনিকরা তা অগ্রাহ্য করে যায়, এমন বাহিনী সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করা চলে? সৈনিকদের এমন একটি সমাবেশকে কি কেউ 'সেনাবাহিনী' আখ্যা দিতে পারনে? এমন বিশৃংখল একটা বাহিনী কি কোনো যুদ্ধে জয়লাভ করবে বলে কেউ আশা পোষণ করেন? যে রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে আইনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই, যার বিধি বিধান প্রকাশ্যভাবে ভঙ্গ করা হয়, যার অফিসাদিতে কোনোরূপ নিয়ম শৃংখলার অস্তিত্ব নেই, যার কর্মচারীরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালনে সম্মত নয়, তেমন রাষ্ট্র সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে? এই ধরনের প্রজা আর এমনি শাসক নিয়ে কোনো রাষ্ট্র কি দুনিয়ার বুকে বেশিদিন দিকে থাকতে পারে? আজকে দুনিয়ার চোখের

---

* প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম ১৯৩৪ সালের ডিম্বেরে তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। - সম্পাদক

সামনেই জার্মানী ও ইটালীর দৃষ্টান্ত* বর্তমান রয়েছে। হিটলার ও মুসোলিনী যে বিপুল শক্তি অর্জন করেছে গোটা দুনিয়া সে সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু তাদের এই সাফল্যের মূল কানণটা কি জানেন? সেই দু'টি জিনিস অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্য। নাজী ও ফ্যাসিস্ট পার্টিদ্বয় যদি নিজেদের নীতি ও আদর্শের প্রতি এতোটা দৃঢ় প্রত্যয় না রাখতো এবং এতোখানি কঠোরভাবে আপন নেতৃবৃন্দের অনুগত না হতো, তাহলে তারা কখনোই অতো শক্তিশালী ও সফলকাম হতে পারতোনা।

এই সাধারণ নিয়মের মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম নেই। ঈমান ও আনুগত্য হচ্ছে আসলে সংগঠনের প্রাণতুল্য। ঈমান যতোটা দৃঢ় এবং আনুগত্য যতোটা পূর্ণ হয় সংগঠন ততোই বেশি সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে তার ঈমানে যতোটা দুর্বলতা ও আনুগত্যের প্রতি সে যতোখানি বিমুখ হবে সংগঠন ততোখানিই দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সেই অনুপাতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতেও সে ব্যর্থকাম হবে। কোনো সমাজ ও সংগঠনে কপটতা, অবিশ্বাস, চিন্তার অনৈক্য, বিদ্রোহ, অবাধ্যতা ও বিশৃংখলার ব্যাধি বিস্তার লাভ করবে এবং তারপরও তাতে নিয়ম শৃংখলা বজায় থাকবে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকে উন্নতির পথে এগুতে দেখা যাবে – এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এ দু'টি অবস্থা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। যেদিন থেকে দুনিয়ায় মানুষের বসবাস শুরু হয়েছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত কখনো দু'য়ের সমন্বয় ঘটেনি। যদি প্রাকৃতিক আইন অপরিবর্তনীয় হয়, তাহলে আইনের এই ধারাটিও অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ উক্ত অবস্থা দু'টির মধ্যে কখনো সমন্বয় ঘটতে পারেনা।

এবার যে কওমটি নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিচ্ছে, তার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক। কপটতা ও অবিশ্বাসের এমন কোন ধরনটি মুসলমানদের মধ্যে বর্তমান নেই যা মানুষ কল্পনা করতে পারে? আজ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এমন লোকও শামিল রয়েছে, যারা ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা দীক্ষা পর্যন্ত অবহিত নয় এবং আজ পর্যন্ত জাহিলী আকীদা বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছে। এখানে এমন লোকও রয়েছে, যারা ইসলামের মৌল নীতিগুলো সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করে এবং এই সন্দেহের কথা প্রকাশ্যে প্রচারও করে বেড়ায়। এ সমাজে এমন লোকও রয়েছে, যারা ধর্ম ও ধার্মিকতার বিরুদ্ধে খোলাখুলি অসন্তোষ ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ করছে। এর ভেতর এমন লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রদত্ত শিক্ষার মোকাবিলায় কাফিরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ধ্যান ধারণা ও চিন্তা ধারাকে অগ্রাধিকার দান করেছে। এখানে এমন লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রদত্ত বিধানের উপর জাহিলী রসম রেওয়াজ ও কুফরী আইন কানুনকে প্রধান্য দিচ্ছে। এ সমাজে এমন লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ ও রসূলের শত্রুদেরকে তুষ্ট করার জন্যে ইসলামী রীতিনীতিকে অবমাননা করে চলছে। এর মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা নিজেদের ক্ষুদ্রতম ও তুচ্ছতম স্বার্থের খাতিরে ইসলামী ইমারতের মারাত্মক ক্ষতি সাধান করতেও প্রস্তুত – যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কুফরের সহায়তা করে চলছে, ইসলামের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাফিরদের

---

* এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেকার কথা। - সম্পাদক

সেবা করে যাচ্ছে এবং নিজেদের আচরণ দ্বারা একথাই প্রমাণ করছে যে, ইসলাম তাদের কাছে এতোটুকু প্রিয় বস্তুও নয়, এর জন্যে তারা এক চুল পরিমাণ ক্ষতিও স্বীকার করতে পারেনা। ফলকথা, মজবুত ঈমান ও নির্ভুল প্রত্যায়সম্পন্ন মুসলমানদের একটি নগণ্য দল ছাড়া এই জাতির বিরাট অংশই এ ধরনের মুনাফিক ও ভ্রান্তবিশ্বাসী লোকদের দ্বারা পরিপূর্ণ।

এতো গেলো ঈমানের কথা। এবার আনুগত্যের প্রতি দৃকপাত করা যাক। কোনো পরিদর্শক মুসলমানদের কোনো মহল্লায় গেলেই এর একটি অদ্ভুত চিত্র দেখতে পাবে। সেখানে আযান হচ্ছে; কিন্তু মুয়াযযিন কাকে ডাকছে, কিসের জন্যে ডাকছে, বহু মুসলমানের মধ্যে এ অনুভূতিই নেই। নামাযের সময় আসে, আবার চলে যায়; কিন্তু একটি নগণ্য দল ছাড়া বাকি সব মুসলমান নিজের কাজ কারবার ও খেলাধুলাকে আল্লাহ্‌র জন্যে ত্যাগ করতে রাজী নয়। প্রতি বছর রমযান মাস আসে; কিন্তু এটা যে কী গুরুত্বপূর্ণ মাস, বহু মুসলমান পরিবারে এই চেতনাটা পর্যন্ত দেখা যায়না। এ সময় বহু মুসলমান প্রকাশ্যে পানাহার করে এবং এই রোযা না রাখার দরুণ তারা বিন্দু পরিমাণ লজ্জাও অনুভব করেনা; বরং উল্টো রোযাদার লোকদেরকেই তারা শরমিন্দা করার চেষ্টা করে। পরন্তু যারা রোযা পালন করে তাদের মধ্যেও খুব কম লোকই পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সহকারে তা পালন করে থাকে; বরং কেউ শুধু রসম হিসেবে পালন করে, কেউবা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী ভেবে পালন করে, আবার কেউ রোযা রেখেও আল্লাহ ও রসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ সবকিছুই করে যায়। যাকাত ও হজ্জের অনুবর্তন এর চাইতেও নিম্নমানের। হালাল হারাম ও পাক নাপাকের পার্থক্যবোধ মুসলমানদের মধ্য থেকে প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। বস্তুত আল্লাহ ও রসূলের নিষিদ্ধ কোন্ জিনিসটি মুসলমানরা বৈধ করে নিচ্ছেনা? আল্লাহ ও রসূলের নির্ধারিত কোন্ সীমারেখাটি মুসলমানরা লংঘন করছেনা? আল্লাহ ও রসূলের প্রতিষ্ঠিত কোন বিধি ব্যাবস্থাটি মুসলমানরা ভঙ্গ করছে না? আদমশুমারীর দিক থেকে দেখলে তো মুসলমানদের সংখ্যা কোটি কোটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই কোটি কোটি লোকের মধ্যে শতকরা বা হাজারকরাও নয়, লাখ প্রতি কতোজন আল্লাহ ও রসূলের বিধানের প্রতি বিশ্বস্ত এবং যথার্থভাবে ইসলামী আইন ব্যবস্থার অনুবর্তনকারী?

বস্তুত যে জাতির মধ্যে মুনাফিকী ও ঈমানী দৌর্বল্যের ব্যাধি বিস্তার লাভ করে, যার মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের কোনো অস্তিত্ব থাকেনা, যার ভেতর থেকে আনুগত্য ও আইনানুবর্তিতা বিলুপ্ত হয়ে যায় তার যা পরিণতি হওয়া উচিত, মুসলমানদের ঠিক সেই পরিণতিই হচ্ছে। মুসলমানরা আজ সমগ্র দুনিয়ায় পরাধীন ও পরাভূত। যেখানে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রক্ষমতা রয়েছে, সেখানেও তারা অপরের নৈতিক, মানসিক ও বৈষয়িক আধিপত্য থেকে মুক্ত নয়। তাদের অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, দারিদ্র ও দুরবস্থা হচ্ছে জনশ্রুতির মতো। নৈতিক অবনতি তাদেরকে লাঞ্ছনার চরম সীমায় নিয়ে পৌঁছিয়েছে। আমানতদারী, বিশ্বাসপরায়ণতা, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পালন ইত্যাকার গুণরাজির দরুণ

এককালে তারা সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলো – সেসব গুণ আজ তাদের থেকে অন্যদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং তার পরিবর্তে বিশ্বাস ভঙ্গ, মিথ্যাচার, প্রতারণা, ওয়াদা খেলাফ ও অসদাচরণ স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তাকওয়া, পরহেযগারী ও নৈতিক পবিত্রতার দিক থেকে তারা প্রায় অন্তসারশূন্য হতে চলেছে। সামাজিক ও জাতিগত সম্ভ্রমবোধ দিনদিন তাদের মধ্য থেকে তিরোহিত হতে চলেছে। তাদের মধ্যে নিয়ম শৃংখলার কোনোরূপ লেশমাত্র নেই। পরস্পরের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বীতশ্রদ্ধায় তাদের মন ভরে উঠেছে। কোনো সাধারণ স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের জন্যে মিলেমিশে কাজ করার মতো যোগ্যতা তাদের বাকী নেই। অপরাপর জাতির চোখে তারা চরম লাঞ্ছিত ও অপমানিত। তাদের ওপর থেকে অন্যান্য জাতির আস্থা চলে গিয়েছে এবং বাকীটুকুও চলে যাচ্ছে। তাদের জাতিগত, সামাজিক ও সামগ্রিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিলীন হতে চলেছে। নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ এবং জাতীয় মর্যাদার নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা অপারগ হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার লাভ করেছে, গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট ও ইউরোপীয় শিক্ষাপ্রাপ্তদের হারও বেড়ে চলেছে – তাদের মধ্যে আধুনিক কায়দার বাংলোতে বসবাসকারী, মোটর কারে আরোহণকারী, স্যুট কোট পরিধানকারী, বড় বড় উপাধীধারী এবং উচ্চ পদমর্যাদা লাভকারীদের সংখ্যা দিনদিনই বেড়ে যাচ্ছে বটে; কিন্তু যে সুউচ্চ নৈতিক গুণরাজিতে পূর্বে তারা বিভূষিত ছিলো, তার থেকে আজ তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। প্রতিবেশী জাতিগুলোর ওপর তাদের যে প্রভাব প্রতিপত্তি বর্তমান ছিলো, আজ আর তার নাম নিশানাও বাকী নেই। পূর্বে যে মানসম্ভ্রম ও শক্তি সামর্থের তারা অধিকারী ছিলো, আজ তার কিছুই বর্তমান নেই আর ভবিষ্যতে এর চাইতেও মারাত্মক লক্ষণ পরিলক্ষিত হবে।

যে কোনো ধর্ম বা সভ্যতা অথবা কোনো সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে দু'রকম কর্মনীতিই মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। সে যদি তার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার মূলনীতির প্রতি পুরোপুরি বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। তার আইন কানুন ও বিধি ব্যবস্থার পুরোপুরি অনুবর্তন করতে হবে। সে যদি এরূপ করেত না পারে, তবে তার অন্তর্ভুক্তই হতে পারবেনা, কিংবা হলেও প্রকাশ্যভাবে তার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এ দু'টিরই মধ্যে কোনো তৃতীয় পন্থা যুক্তিযুক্ত হতে পারেনা। এক ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তও হবে, তার একটি অংশ বলে স্বীকৃতও হবে, তার অনুগত হবার দাবিও করবে, আবার তার মূলনীতিকে পুরোপুরি কি অংশত অমান্যও করবে, তার নির্ধারিত আইনকানুনের বিরুদ্ধাচরণও করবে, তার রীতিনীতি ও বিধি ব্যবস্থার অনুবর্তন থেকে নিজেকে মুক্তও করে নেবে – এটা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত কর্মনীতি হতে পারেনা। এরূপ কর্মনীতির অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, লোকদের মধ্যে মুনাফিকী চরিত্রের সৃষ্টি হবে। তাদের মন থেকে আন্তরিকতা ও নিস্বার্থপরতা বিদায় নেবে। কোনো মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে তাদের হৃদয়ে উদ্দীপনা ও দৃঢ় সংকল্পের সৃষ্টি হতে পারবেনা। দায়িত্ববোধ, কর্তব্যজ্ঞান, আইনানুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা তাদের থেকে বিদায় গ্রহণ

করবে। ফলে কোনো সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে কার্যপযোগী সভ্য হবার যোগ্যতাই তাদের মনে থাকবেনা। এহেন দুর্বলতা, অক্ষমতা ও দোষত্রুটি নিয়ে তারা যে সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে, তার পক্ষে একটা বিরাট অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। যে সভ্যতার দেহে প্রবেশ করবে, তার পক্ষে একেবারে কুষ্ঠরোগের জীবাণু বলে প্রমাণিত হবে। যে ধর্মের অনুবর্তী হবে, তাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে ছাড়বে। এই সকল গুণাবলী নিয়ে মুসলমান হবার চাইতে বরং যে দলের নীতি ও আদর্শের প্রতি তাদের মন সায় দেয় এবং যার কর্মনীতি তারা অনুবর্তন করতে চায় তার মধ্যে শামিল হয়ে যাওয়া শতগুণে উত্তম। বস্তুত যে কাফির তার ধর্ম ও সভ্যতাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং তার রীতি নীতি ও বিধি ব্যবস্থার অনুবর্তন করে, অন্তত মুনাফিক মুসলমানের চাইতে সে উত্তম।

যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা, আধুনিক সভ্যতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভকে মুসলমানদের জাতীয় ব্যাধির প্রতিকার বলে মনে করে, তারা নিসন্দেহে ভ্রান্ত। আল্লাহ্‌র কসম! যদি প্রতিটি মুসলমান এম এ, পি এইচ ডি কিংবা ব্যারিস্টারও হয়ে যায়, ধন সম্পদে সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠে, পাশ্চাত্য সাজ পোশাকে আপাদমস্তক সুসজ্জিতও হয় এবং রাষ্ট্র সরকারের তাবৎ পদমর্যাদা ও পরিষদগুলোর সমুদয় আসনও* তারা দখল করে বসে – আর তাদের হৃদয়ে মুনাফিকীর ব্যাধি লুক্কায়িত থাকে, কর্তব্যকে তারা কর্তব্যই জ্ঞান না করে, অবাধ্যতা, বিদ্রোহ ও উচ্ছৃংখল আচরণে তারা অভ্যস্ত হয়, তাহলে আজকের মতো অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্বলতার মধ্যেই তারা নিমজ্জিত থাকবে। বস্তুত নিজেদের স্বভাব চরিত্র ও নৈতিকতার কারণে যে গভীর খাদে** তারা পতিত হয়েছে, তার শিক্ষাদীক্ষা, চালচলন, ধনসম্পদ, রাষ্ট্রক্ষমতা এর কোনোটাই তাদেরকে উদ্ধার করতে পারেনা। মুসলমানদের যদি উন্নতি ও প্রগতি লাভ করতে হয় এবং একটি শক্তিমান ও মর্যদাবান জাতি হিসেবে দাঁড়াতে হয়, তাহলে সর্বপ্রথম তাদের ঈমান ও আইনানুবর্তিতার গুণরাজি সৃষ্টি করতে হবে। এতোদভিন্ন তাদের ব্যক্তিজীবনে যেমন শক্তি সঞ্চারিত হতে পারেনা, তেমনি জাতীয় জীবনেও নিয়ম শৃংঙ্খলা ফিরে আসতে পারেনা। পরন্তু তাদের সামগ্রিক শক্তি এতোখানি প্রচন্ডরূপ ধারণ করতে পারেনা, যাতেকরে দুনিয়ার জীবনে তারা সমুন্নত হতে পারে। কারণ, একটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জাতি – যার জনসমষ্টির নৈতিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা যারপর নেই শোচনীয়, সে কখনো দুনিয়ার সুদৃঢ়, শক্তিশালী ও সুসংগঠিত জাতিগুলোর মোকাবিলায় শিরোন্নত করতে পারেনা। খড়কুটোর গাদা যতো বড়ই হোকনা কেন, তা কখনো দুর্গ বলে গণ্য হতে পারেনা।

* মনে রাখা দরকার, এখানে বৃটিশ ভারতের সরকারী পদ ও পরিষদের আসনের কথা বলা হয়েছে। - সম্পাদক

** এখানে খাদ মানে – পরাধীনতা।

যারা মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার প্রচার করছে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের নিকৃষ্টতম শত্রু। এরা হচ্ছে সবচাইতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর মুনাফিক – এদের অস্তিত্ব মুসলমানদের পক্ষে সশস্ত্র কাফিরদের চাইতেও বেশি মারাত্মক। কারণ এরা কখনো বাহির থেকে হামলা করেনা; বরং ঘরের মধ্যে বসে গোপনে গোপনে ডিনামাইট বিছাতে থাকে। এরা মুসলমানদেরকে দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই অপদস্থ করতে চায়। এই শ্রেণীর লোক সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, এরা নিজেরা যেমন কাফির হয়েছে, তোমাদেরকেও তেমনি কাফির বানাতে ইচ্ছুক ঃ وَدُّوا لَوْتَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاءً (এরা চায় তোমরাও যেনো তেমনি কুফুরীতে নিমজ্জিত হও, যেমনি নিমজ্জিত হয়েছে তারা এবং এভাবেই যেনো তোমরা তাদের বরাবর হও।' (সূরা আন নিসা ঃ ৮৯) এদের দুষ্কৃতি থেকে বাঁচবার ন্যূনতম পন্থা হচ্ছে এই যে, যারা মনেপ্রাণে মুসলমান এবং মুসলমান থাকতেই ইচ্ছুক, এদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ করা উচিত' – فَلَاتَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ . (তোমরা তাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করোনা) নচেৎ কুরআন তাদের জন্যে এই চরম শাস্তি ঘোষণা করেছে যে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।'

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ .

(তারা যদি একথা না মানে, তবে তাদের পাকড়াও করো এবং যেখানেই পাও নিধন করো।)

❖❖❖

১৫

মুসলমান শব্দের প্রকৃত মর্ম*

আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় প্রায়শ কতিপয় এমন শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হয়, সে শব্দ ও বাক্যগুলো যদিও সবাই উচ্চারণ করে কিন্তু তার মর্ম বোঝে খুব কম লোকই। বহুল ব্যবহারের ফলে সেগুলোর একটা মোটামুটি অর্থ লোকদের অন্তর্নিবিষ্ট হয়েছে মাত্র। কথক লোক যখন ঐ শব্দগুলো উচ্চারণ করে, তখন তারা উক্ত ধরনের মর্মই মনে পোষণ করে। আর শ্রবণকারী যখন শোনে, তখন তারাও ঐ ধরনের মর্মই গ্রহণ করে। কিন্তু যে ব্যাপক ও গভীর মর্মের জন্যে এই শব্দগুলো উদ্ভাবিত হয়েছে, তা অশিক্ষিত লোক তো দূরের কথা, অনেক বড় বড় শিক্ষিত লোকের পর্যন্ত জানা নেই।

দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ইসলাম' ও 'মুসলমান' শব্দ দু'টির উল্লেখ করা যেতে পারে। কতো বিপুলভাবে এই শব্দ দু'টি উচ্চারণ করা হয়, আর কী ব্যাপকভাবেই না এরা আমাদের বাকশক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে! কিন্তু ক'জন উচ্চারণকারী এই শব্দ দু'টি বুঝে শুনে বলে? আর ক'জন শ্রোতাই বা এগুলোর প্রকৃত মর্ম, যে মর্মের জন্যে এদের উদ্ভাবন করা হয়েছিল তা বুঝে? অমুসলিমদের কথা ছেড়েই দিন। খোদ মুসলমাদের শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশি লোক নিজেকে 'মসলমান' বলে পরিচয় দেয় এবং নিজের ধর্মমত প্রকাশ করতে ইসলাম শব্দটি উচ্চারণ করে, কিন্তু 'মুসলমান' হবার মানে কি এবং 'ইসলাম' শব্দেরই বা প্রকৃত মর্ম কি? এটা তারা জানেনা। তাই এখানে শব্দ দু'টির কিছুটা ব্যাখ্যা পেশ করা যাক।

ধর্ম বিশ্বাস ও আচরণের দিক থেকে লোকদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে সাধারণত তিন শ্রেণীর লোক পাওয়া যায় ঃ

১. প্রথম শ্রেণীর লোক হচ্ছে মতামত ও কর্মের স্বাধীনতার দাবিদার। তারা প্রতিটি ব্যাপারে নিজস্ব মতের উপর ভরসা করে। নিজস্ব বিবেক বুদ্ধির ফয়সালাকেই নির্ভুল বলে মনে করে। তাদের নিজস্ব ধারণায় যে কর্ম পন্থা সঠিক, সেটিই তারা অবলম্বন করে। কোনো বিশেষ ধর্মের অনুবর্তনের সঙ্গে তাদের কোনো সংশ্রব নেই।

২. দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা দৃশ্যত কোনো ধর্মকে মানে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজস্ব ধ্যান ধারণার অনুসরণ করে চলে। তারা আকীদা বিশ্বাস ও কর্মবিধির জন্যে ধর্মের প্রতি মনোনিবেশ করেনা; বরং নিজস্ব মানস প্রকৃতি, ঝোঁক প্রবণতা বা স্বার্থ ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নিজেদের মন মগজে কিছু আকিদা বিশ্বাস বদ্ধমূল করে নেয়; কাজের কতিপয় মনগড়া পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং তারপর ধর্মকে সেই অনুসারে ঢালাই করবার প্রয়াস পায় – যেনো তারা ধর্মের অনুগামী নয়; বরং ধর্মই তাদের অনুগামী।

---

* প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম ১৯৩৩ সালের নভেম্বরে তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। - সম্পাদক

৩. তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা নিজস্ব বিচার বুদ্ধির সাহায্যে কোনো কাজ করেনা। তারা বিবেক বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে এবং চোখ বন্ধ করে শুধু অপরের – তা তাদের বাপ দাদা হোক, কি সমকালীন অন্য লোক-তকলীদ করতে থাকে।

প্রথম দলটি স্বাধীনতার নামে প্রাণপাত করে; কিন্তু তার সঠিক সীমারেখাটি কী, এটাই জানেনা। চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা কতকাংশে যথার্থ, সন্দেহ নেই। কিন্তু তা যখন নিজস্ব সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন তা ভ্রান্তির হেতু হয়ে দাঁড়ায়। যে ব্যক্তি প্রতিটি ব্যাপারে নিজস্ব মতের ওপর নির্ভর করে, প্রতিটি বিষয়ে শুধু বুদ্ধিরই নির্দেশ মানে – সে প্রকৃতপক্ষে এই ভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে যে, তার বুদ্ধি জ্ঞান দুনিয়ার প্রতিটি বিষয়ই আয়ত্ব করে ফেলেছে, কোনো সত্য বা জটিলতা তার দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন নয়, প্রত্যেক মনযিলের পথঘাট সম্পর্কেই সে অবহিত, প্রতিটি মতবাদের যৌক্তিকতা সম্পর্কেই সে সুবিদিত, প্রত্যেক পথের সূচনার মতো তার শেষ সীমা সম্পর্কেও সে পরিজ্ঞাত। এই জ্ঞান ও সচেতনতার ধারণা প্রকৃতপক্ষে একটি ভ্রান্ত ধারণামাত্র। মানুষ যদি বাস্তবিকপক্ষে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে অনুজ্ঞা বানিয়ে নেয়, তবে খোদ বুদ্ধিবৃত্তিই বলে দেবে যে, তার অন্ধ অনুগামী তাকে যে গুণরাজিতে বিভূষিত মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোতে সে বিভূষিত নয়। তাকে একমাত্র দিশারী মনে করে, কেবল তারই নির্দেশে যে পথ চলতে চায় – আঘাত, হোঁচট, বিচ্যুতি, ভ্রান্তি ও ধ্বংসের হাত থেকে সে কিছুতেই বাঁচতে পারেনা।

বস্তুত চিন্তা ও কর্মের এই ধরনের স্বাধীনতা তাহযীব ও তমদ্দুনের পক্ষেও মারাত্মক। স্বাধীনতার দাবিই হচ্ছে এই যে, ব্যক্তির নিজস্ব ধারণায় যে ধর্মবিশ্বাসটি নির্ভুল মনে হবে, কেবল সেটিই সে পোষণ করবে – যে পথটি তার বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিতে সঠিক বলে বিবেচিত হবে, সেটিই সে অবলম্বন করবে। পক্ষান্তরে তাহযীব ও তমদ্দুনের দাবি হচ্ছে এই সমাজ ব্যবস্থার অধীনস্থ লোকেরা কতিপয় বুনিয়াদী প্রত্যয় ও চিন্তার ক্ষেত্রে একমত হবে এবং সমাজবদ্ধ জীবন সংগঠন ও পরিচালনার জন্যে নির্ধারিত বিশিষ্ট নিয়ম প্রণালীও বিধি ব্যবস্থা নিজেদের বাস্তব জীবনে অনুসরণ করবে। কাজেই চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা এবং তাহযীব ও তমদ্দুনের মধ্যে স্পষ্টত বিরোধ রয়েছে। স্বাধীনতা ব্যক্তির মধ্যে অহমিকা, অসংযম ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। তমদ্দুন তার কাছে আনুগত্য, অনুসৃতি এবং বাধ্যতা ও বশ্যতা দাবি করে। যেখানে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা থাকবে, যেখানে তুমদ্দুন বা সমজবদ্ধ জীবন থাকবেনা। আর যেখানে তমদ্দুন থাকবে, সেখানে ব্যক্তিকে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা অনেকখানি বিসর্জন দিতে হবে।

দ্বিতীয় দলটির অবস্থা প্রথম দলটির চাইতেও নিকৃষ্ট। প্রথম দলটি শুধু ভ্রান্ত; দ্বিতীয় দলটি তার সঙ্গে মিথ্যাবাদী, মুনাফিক, প্রতারক এবং পরশ্রীকাতরও। যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সঙ্গত সীমার মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি তার ধর্ম, চিন্তাধারা ও ঝোঁক প্রবণতার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করতে পারে, তবে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা নিয়েও সে ধর্মের আনুগত্য করতে পারে। যদি মানুষের ঝোঁক প্রবণতা ধর্মের প্রতিকূল হয় আর তা সত্ত্বেও সে ধর্মকে সঠিক ও নিজস্ব প্রবণতাকে ভ্রান্ত মনে করে – তবুও তার এ দাবিকে অনেকখানি সত্য বলা যাবে যে, সে নিজেকে যে ধর্মের অনুসারী বলে দাবি করে, সে ধর্ম বাস্তবিকই মানে। কিন্তু ধর্মের স্পষ্ট

শিক্ষা ও অনুজ্ঞা থেকে তার বিশ্বাস ও আচরণ যদি সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয় এবং সে নিজস্ব ধ্যান ধারণাকে সত্য ও ধর্মের শিক্ষাকে ভ্রান্ত মনে করে আর তার পরও সে নিজেকে ধর্মের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্যে ধর্মীয় শিক্ষাকে নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও রীতিনীতি অনুযায়ী ঢালাই করবার প্রয়াস পায় – তবে এমন ব্যক্তিকে আমরা নির্বোধ বলবোনা; কারণ নির্বোধ ব্যক্তি এতোটা সতর্কতামূলক কাজ কোথায় করতে পারে? আমাদের বাধ্য হয়েই তাকে বেঈমান বলতে হবে। আমরা এ-ও ধারণা করতে বাধ্য হবো যে, তার মধ্যে ধর্মের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার মতো যথেষ্ট সৎ সাহসের অভাব রয়েছে; এ জন্যেই সে মুনাফিকীয় পথে ধর্মের অনুগামী সেজেছে। নচেৎ যে ধর্মের শিক্ষা তার বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্তের বিরোধী – তার প্রকৃত চিন্তা ও প্রত্যয়ের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, সে ধর্মটি বর্জন করতে কোন্ জিনিসটি তার বাধ সেধেছে? আর যেসব পন্থায় চলতে সে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহশীল, সেসব পথে চলতে কে-ই বা তাকে বারণ করেছে?

তৃতীয় দলটি বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিতে সবচাইতে বেশি অপকৃষ্ট। প্রথম দল দু'টির ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে, বুদ্ধিবৃত্তি যতোটা কাজ করতে অপারগ, তার কাছ থেকে ততোটা কাজই তারা গ্রহণ করতে চায়। আর এই দলটির ভ্রান্তি হলো, এরা বুদ্ধিবৃত্তিকে মোটেই প্রয়োগ করেনা অথবা করলেও তা না করারই সমান! একজন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে এর চাইতে লজ্জাজনক বিষয় আর কী হতে পারে যে, সে যে ধর্মমতের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার সপক্ষে এছাড়া আর কোনো প্রমাণ নেই যে, তার বাপ দাদাও এমনি বিশ্বাস পোষণ করতো অথবা অমুক উন্নতিশীল জাতিও এই ধর্মমতের প্রতি বিশ্বাসী? অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি তার ধর্মীয় বা পার্থিব ব্যাপারে কতক প্রক্রিয়া এ জন্যেই অনুসরণ করে যে, বাপ দাদার আমল থেকে এমনি প্রক্রিয়া চলে আসছে কিংবা কতক প্রক্রিয়া এ জন্যেই অবলম্বন করে যে, সমকালীন প্রতিপত্তিশীল জাতিগুলোর মধ্যে তা প্রচলিত রয়েছে, সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে একথাই প্রমাণ করে যে, তার মাথার ভেতর মগজ এবং মগজের ভেতর চিন্তা করার শক্তি বলে কিছুই নেই। তার ভেতর সত্য মিথ্যা ও ভুল নির্ভুলের মধ্যে পার্থক্য করার মতো কোনোই যোগ্যতা নেই। ঘটনাক্রমে সে হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে বলেই হিন্দু ধর্মকে সঠিক মনে করেছে। এমনিভাবে মুসলমান পরিবারে ভুমিষ্ঠ হলে ইসলামকেই সত্যাশ্রয়ী বলে মানতো। আবার খ্রীস্টানের সন্তান হলে খ্রীস্টধর্মের জন্যেই সে প্রাণপাত করতো। অনুরূপভাবে ঘটনাচক্রেই তার আমলে ফিরিঙ্গি জাতিগুলো ক্ষমতাশালী হয়ে পড়েছে; এ জন্যেই সে ফিরিঙ্গি রীতিনীতিকে সভ্যতার মানদন্ড বলে মনে করেছে। যদি চীনারা ক্ষমতাশালী হতো তো নিশ্চিন্তভাবে চীনা রীতিনীতিই তার কাছে সভ্যতার মানদণ্ড বলে স্বীকৃত হতো। আর আজকে দুনিয়ায় নিগ্রোদের আধিপত্য কায়েম হলে এই হীন বুদ্ধির লোকেরা নিঃসন্দেহে নিগ্রোত্বকেই মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ভাবতে শুরু করবে!

কোনো জিনিসের সত্য যথার্থ হবার জন্যে এটা কোনো প্রমাণই নয় যে, আমাদের পূর্ব পুরুষ থেকেই এমনিভাবে চলে আসছে কিংবা দুনিয়ায় আজকাল এমনই চলছে। দুনিয়ায় তো পূর্বেও অনেক নির্বুদ্ধিতাজনক কাজ হয়েছে এবং আজো হচ্ছে। কেবল অন্ধভাবে সেইসব নির্বুদ্ধিতার অনুসরণ করা আমাদের কাজ নয়।

অথবা শুধু চোখ বন্ধ করে প্রাচীন বা আধুনিক কালের যেকোনো প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে থাকা এবং যেকোনো পথিকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলাও – তা সে কাঁটাবনের দিকে নিয়ে যাক অথবা কোনো বিরাট গর্তের দিকে – আমাদের কাজ নয়। কারণ দুনিয়ার ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা, নকল ও আসলের পরখ করে দেখা এবং কাউকে দিশারীরূপে গ্রহণ করার আগে সে কোন্ দিকে চালিত করে তা খুব ভালমতো দেখে নেবার জন্যে আল্লাহ আমাদের বুদ্ধি-জ্ঞান দিয়েছেন। ইসলাম এই তিনটি দলকেই পথভ্রষ্ট বলে মনে করে।

প্রথম দলটি সম্পর্কে সে বলে, এরা যেমন কোনো আলোক প্রাপ্তকে নিজেদের দিশারী বলে মানেনা, তেমনি পথ চলার উপযোগী কোনো আলোকরশ্মিও এদের কাছে বর্তমান নেই। এদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির মতো, যে অন্ধকারে শুধু অনুমানে হাতড়িয়ে পথ চলছে। হয়তো কখনো সে সোজা পথে চলবে, আবার কখনো হয়তো গর্তে গিয়ে পড়বে। কেননা অনুমান কোনো নিশ্চিত জিনিস নয়। এতে ভুল ও নির্ভুল উভয়েরই সম্ভাবনা রয়েছে; বরং ভুলের সম্ভাবনাই অধিক ঃ

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ، اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ .

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে খোদায়ীর অংশীদার বলে মনে করে এবং তাদেরকে ডাকে, তারা কিসের অনুগামী জানো? তারা শুধু অনুমান ও কল্পনার অনুগামী এবং নিছক আন্দাজে তারা পথ চলে।' (সূরা ইউনুস ঃ ৬৬)

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لاَيُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا .

অর্থ ঃ তারা শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে চলে আর অনুমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তা অণু পরিমাণও সত্যের পথ নির্দেশ করেনা।' (সূরা নজম ঃ ২৮)

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ط اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى .

অর্থ ঃ তারা অনুমান ও প্রবৃত্তির বাসনা ছাড়া আর কোনো জিনিসের অনুসরণ করেনা। অথচ তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে। মানুষের জন্যে কি তা-ই সত্য, যা সে প্রত্যাশা করে?' (সূরা নজম ঃ ২৩-২৪)

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشَاوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ . (سوة الجاثية : ٢٣)

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আপন প্রবৃত্তির বাসনাকে নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তাকে দেখেছ? তার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাকে গুমরাহ করে দিয়েছেন। তার কান ও অন্তকরণের ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। তার চোখের ওপর

আবরণ টেনে দিয়েছেন। এখন আল্লাহর পর আর কে তাকে পথ নির্দেশ করবে?' (সূরা জাসিয়াহ ঃ ২৩)

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ .

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দেয়া হেদায়েতের পরিবর্তে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে, তার চাইতে অধিক গুমরাহ আর কে? এ ধরনের জালিম লোকদেরকে আল্লাহ্ কখনো হেদায়েত দান করেননা।' (সূরা কাসাস ঃ ৫০)

কুরআনের অবতরণকালে দ্বিতীয় দলের প্রতিভূ ছিলো বনী ইসরাঈল। তারা নিজেদেরকে মূসা আ.-এর অনুগামী ও তওরাতের অনুবর্তী বলে দাবি করতো। কিন্তু তাদের প্রত্যয় ও আচরণের বেশির ভাগই ছিলো মূসা আ.-এর অনুসৃত পন্থা এবং তওরাতে বিবৃত শিক্ষার পরিপন্থি। তদুপরি মজার ব্যাপার ছিলো এই যে, এহেন অন্যায়াচরণের জন্যে এরা এতোটুকু লজ্জাবোধও করতোনা। এরা নিজেদের চিন্তা ও কর্মধারাকে তওরাতের শিক্ষা অনুযায়ী ঢালাই করার পরিবর্তে তওরাতের মধ্যেই শাব্দিক ও অর্থগত বিকৃতি ঘটিয়ে তাকে নিজেদের চিন্তা ও কর্মানুযায়ী ঢালাই করে দিচ্ছিল। তওরাতের প্রকৃত শিক্ষাকে গোপন করে নিজেদের ধ্যান ধারণাকেই তারা তওরাতের শিক্ষা বলে প্রচার করতো। এইসব গুমরাহী ও ভ্রান্তিকর আচরণের জন্যে আল্লাহর যেসব বান্দা তাদেরকে সতর্ক করতেন এবং তাদের অভিলাষের বিরুদ্ধে খোদায়ী বাণীর অনুসৃতির জন্যে আহ্বান জানাতেন, তাঁদেরকে এরা গালিগালাজ করতো, মিথ্যাবাদী বলতো, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করতো। তাই এদের সম্পর্কে কুরআনে বলেছে ঃ

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ وَلَاتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ .

অর্থ ঃ তারা শব্দাবলীকে তাদের নিজস্ব স্থান থেকে বিচ্যুত করে; আর তাদের প্রতি প্রদত্ত বহুতরো সদুপদেশকে তারা ভুলিয়ে দিয়েছে। তোমরা বরাবরই তাদের কোনো না কোনো চুরির সংবাদ পেতে আছো। এই খেয়ানত থেকে তাদের খুব কম লোকই বেঁচে রয়েছে।' (সূরা মায়েদা ঃ ১৩)

يَااَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

অর্থ ঃ হে আহলি কিতাব! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করো আর কেনই বা বুঝে শুনে সত্যকে গোপন করো।' (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭১)

كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَاتَهْوٰى اَنْفُسُهُمْ فَرِيْقًا كَذَّبُوْاوَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ

অর্থ ঃ যখন কোনো নবী তাদের নফসের খায়েশের প্রতিকূল কোনো পয়গাম নিয়ে এসেছেন, তখন কাউকে তারা মিথ্যাপবাদ দিয়েছে আর কাউকে হত্যা করেছে।' (সূরা মায়েদা ঃ ৭০)

অতপর তাদেরকে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে ঃ

لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ـ

অর্থ ঃ তোমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত সঠিক পথ পাবেনা, যতোক্ষণ না তওরাত ও ইঞ্জিলকে কায়েম করবে এবং তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব (অর্থাৎ কুরআন)-কে না মানবে।' (সূরা মায়েদা ঃ ৬৮)

তৃতীয় দল সম্পর্কে কুরআন বলছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ـ

অর্থ ঃ যখনি তাদের বলা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান পালন করে চলো, তখন তারা এই জবাবই দিয়েছে যে, আমাদের বাপ দাদাদের যে পথে চলতে দেখেছি, আমরা কেবল সে পথেই চলবো। তাদের বাপ দাদারা যদি কিছু না বুঝে না জেনে থাকে এবং সৎ পথের সন্ধান ও না পেয়ে থাকে, তবু কি তারা আপন বাপ দাদারই অনুসরণ করবে?' (সূরা বাকারা ঃ ১৭০)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا ـ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ـ

অর্থ ঃ যখনি তাদের বলা হয়েছে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে এসো, তখন তারা এই জবাবই দিয়েছে যে, আমাদের বাপ দাদাদের যে পথে চলতে দেখেছি, আমাদের জন্যে তা-ই যথেষ্ট। কিন্তু তাদের বাপ দাদারা যদি কিছুই না জেনে থাকে এবং সৎ পথেরও সন্ধান না পেয়ে থাকে, তবু কি সেপথ তাদের জন্যে যথেষ্ট?' (সূরা মায়েদা ঃ ১০৪)

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ـ

অর্থ ঃ তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের পায়রবী করো তাহলে তারা তোমায় আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে; তারা তো শুধু অনুমানের সাহায্যে পথ চলে। তাদের পথ হচ্ছে সম্পূর্ণ আন্দাজ ও অনুমাননির্ভর।' (সূরা আনয়াম ঃ ১১৬)

যারা নিজেদের বিচার বুদ্ধিকে কাজে লাগায়না, আসল ও নকলকে পরখ করে দেখেনা; বরং চোখ বুজে শুধু অন্যের তকলিদ করে যায় – কুরআন তাদেরকে অন্ধ, বোবা ও কালা বলে আখ্যা দিয়েছে ঃ

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ .

অর্থ ঃ তারা অন্ধ, বোবা, কালা। তাই তারা কিছুই বুঝেনা।' (বাকারা ঃ ১৭১)

এবং জানোয়ারের সঙ্গে তাদের তুলনা করেছে, বরং তার চাইতেও নিকৃষ্টতর বলা হয়েছে। কারণ জানোয়ারের তো আদতেই বিচার বুদ্ধি নেই; কিন্তু তাদের বিচার বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তারা তা প্রয়োগ করে না ঃ

اُوْلٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ.

অর্থ ঃ এদের উদাহরশণ হলো পশু, বরং এরা তার চাইতে ও নিকৃষ্ট এবং এরা অচেতন।' (সূরা আ'রাফ ঃ ১৭৯)

এই তিনটি প্রান্তিকধর্মী দলকে নাকচ করে দেবার পর কুরআন এমন লোকদের নিয়ে একটি দল গঠন করতে চায়, যারা হবে একান্তভাবে মধ্যমপন্থার অনুসারী (اُمَّةً وَّسَطًا)। এই দলটি হামেশাই সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতার ওপর কায়েম থাকবে' (قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ)।

এই মধ্যম পন্থাটা কি? তাহলো এই যে, প্রাচীন রীতিনীতি ও আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা লোকদের দৃষ্টিশক্তির ওপর যে আবরণ ফেলেছে, তাকে ছিন্ন করতে হবে – সুস্থ বিচার বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোয় চোখ মেলতে হবে এবং কোনটি সত্য ও কোনটি মিথ্যা তা তলিয়ে দেখতে হবে। বিচার করতে হবে যে, নাস্তিক্যবাদ ঠিক, না খোদায়ী মতবাদ? তাওহীদ ঠিক, না শিরক? মানুষের সৎ পথে চলার জন্যে খোদায়ী বিধানের প্রয়োজন আছে কি নেই? আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদী ছিলেন, কি (খোদা মাফ করুন) মিথ্যাবাদী? কুরআনের পেশকৃত জীবন পথ সোজা কি বাঁকা? লোকদের দিল যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস মানব প্রকৃতির স্বভাবিক দাবি এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ যাঁর কোনো শরিক নেই, লোকদের বিবেক যদি স্বীকার করে যে, মানুষের সোজা পথে চলবার জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত আলোর একান্তই প্রয়োজন এবং এ হচ্ছে সেই আলো যা মানব জাতির সাচ্চা দিশারী আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম নিয়ে এসেছেন; যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনধারা দেখে লোকদের বিশ্বাস জন্মে যে, এমন উন্নত চরিত্রের মানুষ দুনিয়াকে কখনো ধোঁকা দিতে পারেননা এবং আল্লাহ্‌র রসূল হওয়া সম্পর্কে তাঁর দাবি নিসন্দেহে সত্য দাবি, যদি কুরআন অধ্যয়ন করার পর লোকদের বিচার বুদ্ধি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এই মহাগ্রন্থ যা কিছু পেশ করেছে, তা-ই হচ্ছে মানুষের মতবিশ্বাস ও আচরণের একমাত্র সোজাপথ – তাহলে সমগ্র দুনিয়ার নিন্দাবাদ ও বিরুদ্ধাচরণ থেকে নি:শঙ্ক হয়ে এবং সর্ববিধ ক্ষতির ভয় ও লাভের হাতছানি থেকে হৃদয় মনকে পবিত্র করে সেই বস্তুটির প্রতি – যার সত্যতা সম্পর্কে লোকদের বিবেক সাক্ষ্যদান করছে – ঈমান পোষণ করা

একান্তই কর্তব্য।

পরন্তু সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যখন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে নেয়া হয়েছে এবং মিথ্যাকে ত্যাগ করে সত্যের প্রতি ঈমান পোষণ করা হয়েছে, তখন বুদ্ধিবৃত্তির যাচাই পরিক্ষা এবং তার সমালোচনার কাজও শেষ হয়ে গিয়েছে। ঈমান পোষণের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নির্দেশ দানের ইখতিয়ার বুদ্ধিবৃত্তির হাত থেকে আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও তাঁর কিতাবের হাতে চলে গিয়েছে। অতপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা লোকদের কাজ নয়; বরং তাদের কাজ শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতিটি বিধানকে মাথা পেতে বরণ করা। তারা আপন বুদ্ধিবৃত্তিকে সেই বিধানের অনুধাবন, তার সুক্ষ্মতা ও যৌক্তিকতা উদ্‌ঘাটন এবং তাকে নিজ জীবনের খুঁটনাটি বিষয়ে প্রয়োগ করার ব্যাপারে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু কোনো খোদায়ী বিধানে এতোটুকু রদবদল করার অধিকার কারো নেই। কোনো বিধানের যৌক্তিকতা ও সমীচীনতা লোকদের বোধগম্য হোক আর না হোক, কোনো বিধান বুদ্ধিবৃত্তির মানদন্ডে উত্তীর্ণ হোক আর না হোক আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও রসূলের ফরমান দুনিয়ার রসম রেওয়াজ ও রীতিনীতির অনুকূল হোক কি প্রতিকূল – লোকদের কাজ হচ্ছে তার সামনে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করা। তারা যখন আল্লাহ্‌র মেনে নিয়েছে, রসূলকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে স্বীকার করেছে এবং এই বিশ্বাস পোষণ করেছে যে, রসূল যাকিছু পেশ করেন আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই করেন নিজের মনগড়া কোনো জিনিস তিনি পেশ করেননা (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى) তখন এই বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের যুক্তিসঙ্গত দাবি এই যে, লোকেরা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্‌কে নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির ওপর অগ্রাধিকার দেবে এবং যে সকল প্রত্যয় ও বিধিনিষেধ আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রসূল বিবৃত করেছেন, সেগুলোকে নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি বিদ্যাবত্তা, অভিজ্ঞতা কিংবা অন্য মানুষের চিন্তা ও কর্মের মানদন্ডে যাঁচাই করা থেকে বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে খোদায়ী বিধানের অবাধ্যতা করে, সে নিজেই নিজ দাবির প্রতিবাদ জানায়। কারণ সে জানেনা যে, ঈমান ও অবার্ধ্যতার মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট বৈপরিত্য। তার এইকথাও জানা নেই যে, শৃঙ্খলা ও নিয়মানূবর্তিতা (Discipline) কেবল মানা ও আনুগত্য করার ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অবাধ্যতা হচ্ছে অরাজকতারই নামান্তর মাত্র।

এই ভারসাম্য ও মধ্যপন্থার নামই হচ্ছে 'ইসলাম'। আর যারা এই পথ অনুসরণ করে চলে, তাদেরকেই বলা হয় 'মুসলিম'।

ইসলামের মানে হচ্ছে আনুগত্য, আজ্ঞানুবর্তিতা ও মেনে নেয়া। আর যে ব্যক্তি আদেশ দানকারীর আদেশ ও বারণকারীর বারণকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়, তাকেই বলা হয়-মুসলিম। কাজেই এ নামটি নিজেই এ সত্যের সন্ধান বলে দিচ্ছে যে, উল্লিখিত তিনটি দল এবং তাদের অনুসৃত কর্মপন্থা ছেড়ে এই চতুর্থ দলটিকে এক নতুন মতাদর্শ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই জন্যে যে, এরা আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশকে মেনে চলবে এবং তার সামনে মাথা নতো করবে। প্রত্যেক ব্যাপারেই কেবল নিজস্ব বিচার বুদ্ধির পায়রবী করা এ দলটির কাজ নয়। কিংবা আল্লাহর বিধানের মধ্যে যেটুকু তার স্বার্থের অনুকূল, কেবল সেকুটুই সে

মেনে চলবে আর যেটুকু তার স্বার্থের বিরোধী, তাকে নাকচ করে দেবে, অথবা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নত বর্জন করে মুর্দা জিন্দা নির্বিচারে সকল মানুষের অনুসরণ করবে – এ-ও তার কাজ হতে পারেনা।

বস্তুত এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কুরআন বলে, যে কোনো ব্যাপারে যখন আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ আসে, তখন মুমিনদের তা মানা বা না মানার কোনো ইখতিয়ার বাকি থাকেনা ঃ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا .

অর্থ ঃ কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা নারীর এ অধিকার নেই যে, যখন কোনো ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ফয়সালা করে দেবেন, তখন সে ব্যাপারে তারা নিজেরাও ফয়সালা করার ইখতিয়ার বাকি রাখবে; যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের হুকুম অমান্য করলো, সে স্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত হয়ে পড়লো।' (সূরা আহ্যাব ঃ ৩৬)

সে বলে, আল্লাহর কিতাবের কতকাংশ রহিত করা দুনিয়া ও আখিরাতে চরম অবমাননাকর ঃ

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَااللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ .

অর্থ ঃ তোমরা কি (আল্লাহর) কিতাবের কতকাংশ বিশ্বাস করো আর কতকাংশ করো অবিশ্বাস? তোমাদের ভেতরে যে কেউ এরূপ কাজ করবে, তার শাস্তি এছাড়া আর কিছু নয় যে, দুনিয়ার জীবনে সে হবে চরম অপমানিত আর আখিরাতে এমন লোককে কঠিনতম শাস্তির দিকে ঠেলে দেয়া হবে। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে গাফিল নন।' (সূরা বাকারা ঃ ৮৫)

সে বলে, বিচার ফয়সালা লোকদের পসন্দনীয় হোক আর না-ই হোক, তা আল্লাহর কিতাব অনুসারেই হওয়া উচিত ঃ

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَتَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ .

অর্থ ঃ অতএব তাদের মধ্যে আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অনুসারেই বিচার ফয়সালা করো এবং আল্লাহর কাছ থেকে আগত সত্যকে বর্জন করে তাদের খায়েশাতের অনুসরণ করোনা।' (সূরা মায়েদা ঃ ৪৮)

সে বলে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব অনুসারে বিচার ফয়সালা করেনা, সে ফাসিক ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ .

অর্থ ঃ এবং আল্লাহর কিতাবের বিরোধী প্রতিটি ফয়সালাই হচ্ছে জাহেলী ফয়সালা।' (সূরা মায়িদা ঃ ৪৭)

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنَ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ .

অর্থ ঃ তারা কি জাহেলী হুকুম-ফায়সালা চায়। অথচ বিশ্বাসীদের কাছে আল্লাহর ফায়সালার চাইতে উত্তম ফায়সালা আর কার হতে পারে?' (সূরা মায়িদা ঃ ৫০)

সে বলে,

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং নিজেদের দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসনকর্তার আনুগত্য করো। আর তোমরা যদি সত্যিকারভাবে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করো, তাহলে যে কোনো ব্যাপারেই তোমাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হোক না কেন, তার মীমাংসার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকেই প্রত্যাবর্তন করো – এটাই হচ্ছে উত্তম পথ আর পরিণতির দিক থেকেও এটাই হচ্ছে উত্তম। (হে নবী!) তুমি কি ঐসব লোকদের দেখেছো, যারা দাবি করে যে, তারা ঈমান এনেছে তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি; কিন্তু তারা চায় আল্লাহর না-ফরমান লোকদেরকে নিজেদের ব্যাপারে বিচারক বানাতে; অথচ সেসব লোককে বর্জন করার জন্যেই তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আর শয়তান তো তাদের বিভ্রান্ত করে সত্য পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতেই চায়। যখনি তাদের বলা হয়েছে, আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের দিকে এসো আর এসো রসূলের দিকে, তখন মুনাফিকদের দেখেছো যে, তারা তোমার পাশ কেটে চলে যায়। ...আমরা যে রসূলই পাঠিয়েছি, তার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, আল্লাহর বিধান অনুসারে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। ...নয়, তোমার পরোয়ারদিগারের শপথ! তারা আদৌ মুমিন নয়, যতোক্ষণ না তারা নিজেদের পারস্পারিক বিরোধে তোমাকেই বিচারক মানবে। শুধু এটুকুই যথেষ্ট নয়; বরং যে ফয়সালাই তুমি করবে, সে ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনো দ্বিধাবোধ থাকবেনা এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তার সামনে তাদের মাথা নতো করে দিতেই হবে।' (সূরা আন নিসা ঃ আয়াত ৫৯-৬৫)

এই বাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' নামকরণের যৌক্তিকতাটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবার আমাদের – যারা আদম শুমারীর তালিকায় মুসলমান নাম লিখিয়েছি – তাদের প্রতি মুসলিম শব্দটি কতোখানি প্রযোজ্য হতে পারে এবং আমাদের আচরণ ও কর্মধারাকে ইসলাম নামে অভিহিত করা কতোটা সঙ্গত হতে পারে – তা সবারই গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত।

❖ ❖ ❖

১৬

মুসলমানদের শক্তির আসল উৎস*

হিজরী দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকের কথা। সাজস্তান ও দুরখজের** তৎকালীন শাসক যার খান্দানী উপাধি ছিলো রুত্‌বেল – বনী উমাইয়ার প্রতিনিধিকে খাজনা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এ জন্যে ক্রমাগত তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছিলো। কিন্তু সে কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করলোনা। ইয়াজিদ বিন্ আব্দুল মালিক একবার তার কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্যে দূত প্রেরণ করেছিলো। তখন সে মুসলিম দূতকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

'আগে যেসব লোক খাজনা আদায় করতে আসতো, তারা কোথায় গেলো? তাদের পেট অভুক্ত লোকদের ন্যায় পিঠের সঙ্গে চিপটে থাকতো, কপালে কালো দাগ পড়ে থাকতো এবং তারা খেজুর পাতা পরিধান করতো।'

বলা হলো, তারা তো অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন। রুতবেল বললো ঃ 'তোমাদের চেহারা সুরাত যদিও তাদের চাইতে শানদার; কিন্তু তাঁরা তোমাদের চাইতে বেশি প্রতিশ্রুতি পালনকারী এবং অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন।'

ঐতিহাসিকগণ বলেন, একথা বলেই রুত্‌বেল রাজস্ব দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিলো এবং প্রায় অর্ধ শতক পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র থেকে স্বাধীন রইলো।

এ হচ্ছে এমন সময়ের কথা, যখন বিপুল সংখ্যক তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ বর্তমান ছিলেন। সেটা ছিলো ইমাম মুজতাহিদগণের যুগ। তখন নবী করীম সা.-এর তিরোধানের পর মাত্র একটি শতক অতিক্রান্ত হয়েছিলো। মুসলমানরা একটি জীবন্ত ও শক্তিশালী জাতি হিসেবে দুনিয়ার উপর বিরাজ করছিলো। তারা ইরান, ইরাক, রোম, মিসর, আফ্রিকা, স্পেন প্রভৃতি দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। সাজ সরঞ্জাম, জাঁক জমক ও ধন সম্পদের দিক থেকে দুনিয়ার কোনো জাতিই তখন তাদের সমকক্ষ ছিলোনা। এসব কিছুই পুরোপুরি বর্তমান ছিলো। তাদের হৃদয়ে ঈমানও সতেজ ছিলো। 'শরয়ী' বিধি বিধানের অনুবর্তিতা আজকের চাইতে অনেক বেশি ছিলো। নেতৃত্বের আদেশ ও তা পালন করার ব্যবস্থা ছিলো। গোটা জাতির মধ্যে এক প্রচন্ড নিয়মানুবর্তিতা বর্তমান ছিলো। কিন্তু তা সত্বেও যারা সাহাবাদের আমলের অভুক্ত, দরিদ্র ও মরুবাসীদের সঙ্গে শক্তি পরিক্ষা করেছিল, তারা এই সরঞ্জামে সুসজ্জিত এবং ঐ সাজ সরঞ্জামহীন লোকদের আসমান জমিনের পার্থক্য অনুভব করলো। এটা কিসের পার্থক্য

---

* প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম ১৯৩৫ সালের জানুয়ারিতে তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। - সম্পাদক

** বর্তমান আফগানিস্তানের প্রাচীন নাম। - সম্পাদক

ছিলো? ইতিহাসবেত্তাগণ হয়তো একে শুধু গ্রামীণ সভ্যতার ও নাগরিক সভ্যতার পার্থক্য বলে অভিহিত করতে চাইবেন। তারা বলবেন, প্রাচীন মরুবাসিগণ বেশি কষ্ট সহিষ্ণু ছিলো আর পরবর্তী লোকেরা ধনদৌলত ও তামদ্দুনিক সমৃদ্ধির ফলে বিলাসপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি বলব ঃ আসলে এ পার্থক্য ছিলো ঈমান, আন্তরিকতা, চরিত্রগুণ এবং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি আনুগত্যের পার্থক্য। মুসলমানদের আসল শক্তি এই জিনিসগুলোর মধ্যেই নিহিত ছিলো। সংখ্যার প্রাচুর্য, সাজ সরঞ্জামের বাহুল্য, ধনদৌলতের সমৃদ্ধি, জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলার নৈপুণ্য, তমদ্দুন ও সভ্যতার উপকরণাদি এর কোনোটাই তাদের শক্তির উৎস ছিলোনা। তারা শুধু ঈমান ও সৎ কর্মের উপর নির্ভর করেই সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিল। এই জিনিসটিই দুনিয়ায় তাদের সমুন্নত করেছিল। এটিই অন্যান্য জাতির হৃদয়ে তাদের খ্যাতির আসন প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিল। যখন শক্তি ও সম্ভ্রমের এই সম্পদ তাদের কাছে বর্তমান ছিলো, তখন সংখ্যার অপ্রতুলতা এবং সাজ সরঞ্জামের অভাব সত্ত্বেও তারা শক্তিমান ও সম্মানিত ছিলো। আর যখন এই সম্পদ তাদের কাছ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেলো, তখন সংখ্যার প্রাচুর্য এবং সাজ সরঞ্জামের বাহুল্য সত্ত্বেও তারা দুর্বল ও সম্ভ্রমহীন হয়ে পড়তে লাগলো।

রুতবেল একজন শত্রু হিসেবে যা বলেছে তা মিত্র ও সদুপদেষ্টাদের হাজারো ওয়াযের চাইতেও বেশি শিক্ষাপ্রদ। সে প্রকৃতপক্ষে এই সত্যটিই তুলে ধরেছে যে, কোনো জাতির প্রকৃত শক্তি তার সুসজ্জিত সেনাবাহিনী, তার সমরাস্ত্র, তার সুদক্ষ সৈন্য সামন্ত এবং বিপুল উপায় উপকরণের মধ্যে নিহিত নয়, বরং তা রয়েছে তার সৎ স্বভাব, দৃঢ় চরিত্র, নির্ভুল আচরণ ও উন্নত চিন্তাধারার মধ্যে। এ হচ্ছে এমন এক আধ্যাত্মিক শক্তি, যা বস্তুগত উপকরণ ছাড়াই দুনিয়ায় নিজের কর্তৃত্ব চালিয়ে থাকে। এ জিনিস মাটিতে উপবেশনকারীদেরকে সিংহাসনোপবিষ্টদের ওপর জয়যুক্ত করে তোলে। এ শুধু ভূমিরই অধিকারী নয়, বরং লোকদের হৃদয়েরও মালিক বানিয়ে দেয়। এই শক্তির বলে খেজুরপাতা পরিধানকারী, শুষ্ক কঙ্কলসার, অনুজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট ন্যাকড়া জড়ানো তরবারীর ধারককগণ দুনিয়ায় এমন খ্যাতি প্রতিপত্তি, শৌর্য বীর্য, মান মর্যাদা ও শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যা শানদার পোশাক পরিধানকারী, বিপুল ও বলিষ্ঠদেহী, উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট, উচ্চ দরবারসম্পন্ন, বড় বড় কামানধারী ও প্রচণ্ড পরাক্রমশালী লোকেরাও ঐ শক্তি ছাড়া প্রতিষ্ঠা করতে পারেনা। বস্তুত **নৈতিক শক্তির প্রাচুর্য বস্তুগত উপকরণের অভাব পূর্ণ করে দিতে পারে, কিন্তু বস্তুগত উপকরণের প্রাচুর্য নৈতিক শক্তির অভাবকে কখনো পূর্ণ করতে পারেনা।** এই শক্তি ছাড়া শুধু বস্তুগত উপকরণের সঙ্গে প্রতিপত্তি লাভ করতে পারলেও তা হবে অপূর্ণ ও অস্থায়ী – তা কখনো পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় হবেনা, তাতে লোকদের হৃদয় কখনো অবনমিত হবেনা, শুধু মাথাটাই নতো হবে মাত্র। তা-ও আবার প্রথম সুযোগেই বিদ্রোহ করার জন্যে তৈরি হয়ে থাকবে।

কোনো ইমারত তার বর্ণ বৈচিত্র্য, কারুকার্য, শোভা সৌন্দর্য, পুষ্পময় আঙ্গিনা ও বাহ্যিক মনোহারিত্ব দ্বারা স্থিতি লাভ করেনা। বাসিন্দাদের আধিক্য, সাজ সরঞ্জামের

বাহুল্য, উপায় উপাদানের প্রাচুর্য তাকে সুদৃঢ় করতে পারেনা। তার ভিত্তি যদি দুর্বল হয়, প্রাচীরগুলো যদি ঠুনকো হয়, খুঁটিগুলো ঘুণে ধরে ফেলে, তবে তা বাসিন্দাদের দ্বারা যতোই পূর্ণ হোক, তাতে যতো কোটি টাকার মালমাত্তা ও আসবাবপত্রই থাকুক, তার সাজসজ্জা লোকদের দৃষ্টিকে ঝলসিয়ে দিক এবং তাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করুক এর কোনোটাই তাকে ধ্বসে পড়া থেকে রক্ষা করতে পারেনা। লোকেরা শুধু বহিরাকৃতিকেই দেখে থাকে, তাদের দৃষ্টি লক্ষ্যস্থলেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু যুগের ঘটনাপ্রবাহ বাহ্যদৃশ্যের সঙ্গে নয়, অন্তর্নিহিত সত্যের সাথে মোকাবিলা করতে আসে। তা ইমারতের ভিত্তির সঙ্গে শক্তি পরিক্ষা করে। তার প্রাচীরের দৃঢ়তা ও পরিপক্কতা যাচাই করে দেখে। খুঁটিগুলোর বিন্যাস ও সংস্থাপনকে পরখ করে দেখে। এই জিনিসগুলো যদি সঠিক, সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল হয়, তবে যুগের ঘটনাপ্রবাহ এমনি ইমারতের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। সে ইমারতের কোনো কারুকার্য বা সৌন্দর্য সুষমা না থাকলেও ঘটনা প্রবাহের ওপর সে নিশ্চিতরূপে জয়যুক্ত হবে। নতুবা ঘটনার সংঘাত শেষ পর্যন্ত তাকে চুর্ণবিচুর্ণ করে ফেলবে এবং নিজের সঙ্গে তাবৎ অধিবাসী এবং সৌন্দর্যোপকরণ নিয়েই বিধ্বস্ত হবে।

জাতীয় জীবনের অবস্থাও এমনি। কোনো জাতিকে তার গৃহ, পোশাক পরিচ্ছদ, সওয়ারী, বিলাসদ্রব্য, চারুকলা, কল কারখানা এবং স্কুল কলেজই জীবন্ত, শক্তিশালী ও সমুন্নত করে তোলেনা; বরং তাকে সমুন্নত ও শক্তিশালী করে তার সভ্যতার মূলগত আদর্শ, তার হৃদয়ে সে আদর্শের স্থিতিলাভ এবং তার আচরণে সে আদর্শে'র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। এই তিনটি জিনিস অর্থাৎ আদর্শের বিশুদ্ধতা তার প্রতি পোখতা ঈমান এবং বাস্তব জীবনে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব জাতীয় জীবনে ঠিক তেমনি গুরুত্ব রাখে, একটি ইমারতের বেলায় তার সুদৃঢ় ভিত্তি, তার পরিপক্ক প্রাচীর এবং তার মজবুত খু'টিগুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি জিনিস যে জাতির মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান থাকবে, দুনিয়ায় সে জয়যুক্ত হবে। তার বাণীই সমুন্নত হবে। আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় তারই কর্তৃত্ব চলবে। লোকদের হৃদয়ে তারই খ্যাতির আসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের মস্তক তারই নির্দেশের সামনে অবনত হবে। সে জীর্ণ কুটিরে বাস করুক, শতছিন্ন কাপড়ই পরিধান করুক, অনশনে তার পেটের চামড়া পিঠের সঙ্গে চিপটে থাকুক, তার দেশে একটি কলেজও না থাকুক, তার লোকালয়ে একটি কারখানাও পরিদৃষ্ট না হোক, বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় সে সম্পূর্ণ পশ্চাদপদ হোক – দুনিয়ায় সে-ই সম্ভ্রমের অধিকারী হবে। লোকেরা যে জিনিসগুলোকে উন্নতির পাথেয় বলে মনে করে, তা শুধু ইমারতের কারুকার্য মাত্র, তার প্রাচীর বা স্তম্ভ নয়। অথচ ঠুনকো প্রাচীরের ওপর সোনার পাত বসিয়ে দিলেও তাকে ধ্বসে পড়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এ কথাটাই কুরআন মজীদে বিবৃত করা হয়েছে বারবার।

কুরআন ইসলামের মুলনীতি সম্পর্কে বলেছে যে, আল্লাহ মানুষেকে যে অটল ও অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির (فطرت) ওপর সৃষ্টি করেছেন, ইসলামের নীতি হচ্ছে সেই প্রকৃতিসম্মত। কাজেই এ নীতির ওপর যে 'দীন'কে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে,

তা-ই হচ্ছে 'সুপ্রতিষ্ঠিত দীন' (دين قيم) অর্থাৎ এ হচ্ছে এমন দীন যা ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়কেই সঠিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দেয় ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ . (الروم : ٣٠)

অর্থ ঃ তুমি একনিষ্ঠভাবে এই দীনমুখী হয়ে যাও। আল্লাহ যে প্রকৃতির ওপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাতে কোনো পরিবর্তন হয়না। এটাই সঠিক দীন। তবে অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।' (সূরা রূম ঃ ৩০)

অতপর সে বলে ঃ এই সুপ্রতিষ্ঠিত দীনের ওপর দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকো, এর প্রতি ঈমান পোষণ করো এবং তদনুযায়ী কাজ করো। এর সুফল আপনা আপনিই প্রকাশ পাবে। দুনিয়ায় তোমরাই সমুন্নত হবে। তোমাদেরকেই পৃথিবীর রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করা হবে। তোমরাই খিলাফতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে।

اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ . (الانبياء : ١٠٤) وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . (ال عمران : ١٥) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ . (النور : ٥٥) وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ . (مائده : ٥٦)

পক্ষান্তরে যারা দৃশ্যত দীন ইসলামের চৌহদ্দীর মধ্যে প্রবেশ করেছে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে না দীনের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, না ইসলাম তাদের জীবন বিধানে পরিণত হয়েছে – তাদের বাহ্য চেহারা খুব জমকালো সন্দেহ নেই :

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ। তাদের কথাবার্তাও খুব মধুর : وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে প্রাণহীন কাঠের পুত্তলি : كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ। তারা আল্লাহর চাইতে মানুষকে বেশি ভয় করে ঃ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً। তাদের ক্রিয়াকাণ্ড মরীচিকার মতো; দেখতে তা পানির মতো মনে হলেও আসলে তা কিছুই নয় : اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً حَتّٰى اِذَا جَاءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا। এমন লোকেরা কখনো সামগ্রিক শক্তি অর্জন করতে পারেনা। কারণ তাদের হৃদয় থাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন। তারা নিষ্ঠা ও

আন্তরিকতার সঙ্গে কোনো কাজেই ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনা : بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى । তারা কখনোই মুমিন ও সৎ লোকদের ন্যায় শক্তির অধিকারী হতে পারেনা : لَايُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلاَّ فِىْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ । তারা কখনো দুনিয়ার নেতৃত্বের আসন লাভ করতে পারেনা : لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ । তাদের জন্যে দুনিয়ায় যেমন অপমান ও লাঞ্ছনা, আখেরাতেও তেমনি কঠিন শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নেই : لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

একথায় হয়তো অনেকে বিস্মিত হবে যে, কুরআন মুসলমানদের উন্নতি, তাদের শক্তি কর্তৃত্ব লাভ এবং অন্যান্য সকল জাতির ওপর বিজয়ী হবার জন্যে শুধু ঈমান ও সৎ কর্মকেই একমাত্র উপায় বলে ঘোষণা করেছে। তারা অবাক হবে যে, কোথাও মুসলমানদেরকে ইউনিভার্সিটি বানাবার, স্কুল কলেজ খুলবার, কল কারখানা প্রতিষ্ঠা করার, জাহাজ গড়বার, কোম্পানী কায়েম করার, ব্যাংক খুলবার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করার, কিংবা পোশাকাদি, সামাজিকতা ও চালচলনে উন্নত জাতিগুলোর অনুকরণ করবার কথা বলা হয়নি। অন্যদিকে কুরআন মুনাফিকীকেই অধোগতি, অধপতন, দুনিয়া আখেরাতে লাঞ্ছনা ও অপমানের একমাত্র হেতু বলে অভিহিত করেছে – আজকের দুনিয়ায় যে জিনিসগুলোকে তরক্কীর হেতু বলে গণ্য করা হয় তার অভাবকে কোথাও পতনের হেতু বলে উল্লেখ করা হয়নি।

কিন্তু কুরআনের মূল ভাবধারাটি অনুধাবন করতে পারলে এ বিস্ময় স্বভাবতই দূর হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম অনুধাবনীয় বিষয় হলো এই যে, যে জিনিসটিকে 'মুসলমান' বলে আখ্যা দেয়া হয় তার ভিত্তি একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর কিছুই নয়। মুসলিম হিসেবে তার স্বরূপ একমাত্র ইসলামের দ্বারাই নির্ণীত হতে পারে। সে যদি মুহাম্মদ সা. কর্তৃক আনীত পয়গামের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং তাঁরই মাধ্যমে অবতীর্ণ বিধি বিধানের আনুগত্য করে, তবে ইসলাম বহির্ভূত আর কোনো জিনিস তার কাছে না থাকলেও তার ইসলাম পূর্ণত্ব লাভ করবে। পক্ষান্তরে সে যদি পার্থিব জীবনের তামাম সৌন্দর্যোপকরণে সুসজ্জিত হয়, কিন্তু তার হৃদয়ে ঈমানের প্রভাব না থাকে এবং তার বাস্তব জীবনও ইসলামী বিধি বিধানের আনুগত্য থেকে মুক্ত হয় তবে সে গ্রাজুয়েট, ডাক্তার, শিল্পপতি, ব্যাংকার, সেনাধ্যক্ষ ইত্যাধি সবকিছুই হতে পারে, কিন্তু মুসলমান হতে পারেনা। কাজেই কোনো ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলামের মর্মবাণী বদ্ধমূল না হলে তাদের কোনো উন্নতিই মুসলিম ব্যক্তি বা জাতির উন্নতি আখ্যা পেতে পারেনা। এমতাবস্থায় যতো বড় উন্নতিই করা হোক না কেন, তা কিছুতেই মুসলমানের উন্নতি বলে গণ্য হবেনা। আর স্পষ্টত এমনি উন্নতি কখনো ইসলামের লক্ষ্য হতে পারেনা।

অবশ্য কোনো জাতি আদৌ মুসলমান না হলে এবং তার চিন্তাধারা, নৈতিক চরিত্র ও সমাজ বিধানের মূলভিত্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু হলে আলাদা কথা। নিসন্দেহে, এমনি জাতি ইসলাম থেকে ভিন্নতর নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক নীতির উপর দাঁড়াতে পারে, এমনকি সে নিজেও ঈপ্সিত তরক্কীর শেষ প্রান্ত অবধিও পৌঁছুতে পারে। কিন্তু অপর পক্ষে কোনো জাতির চিন্তাধারা, নৈতিক চরিত্র, অর্থনীতি ও রাজনীতির ভিত্তি ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর ইসলামের ব্যাপারেই তার প্রত্যয় ও আচরণ উভয় দিক থেকে দুর্বল হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্নকথা। এমনি জাতি বস্তুগত উন্নতির উপায় উপকরণ যতো বিপুল পরিমাণে সংগ্রহ করুক না কেন, একটি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী জাতি হিসেবে সমুত্থিত হওয়া এবং দুনিয়ার বুকে সমুন্নতি লাভ করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। কারণ তার জাতিয়তা, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলভিত্তিই দুর্বল। তার ভিত্তিমূলের দুর্বলতা এমনি মারাত্মক যে, নিছক বাহ্যিক সৌন্দর্যোপকরণ তা কখনো দূর করতে পারেনা।

একথার অর্থ এই নয় যে, জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং বস্তুগত উন্নতির অন্যবিধ উপায় উপকরণের যথার্থ গুরুত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এই যে, মুসলিম জাতির পক্ষে এই জিনিসগুলোর গুরুত্ব হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের। ভিত্তির দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা হচ্ছে এই সবগুলোর ওপরই অগ্রগণ্য। ভিত্তি স্থিতিশীল হয়ে গেলে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তামাম বস্তুগত উপকরণই অবলম্বন করা যেতে পারে এবং তা করাও উচিত। কিন্তু এটিই দুর্বল হয়ে পড়লে, হৃদয়ে তার শিকড় দৃঢ়মূল না হলে এবং বাস্তব জীবনে তার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়লে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই জাতির নৈতিক চরিত্র, স্বভাব প্রকৃতি ও কাজ কারবার বিকৃত, বিপর্যস্ত ও বিশৃংখল হয়ে যেতো, তার সমাজ পদ্ধতি শিথিল হয়ে পড়তো এবং তা শক্তি সামর্থ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। এর অনিবার্য ফলে জাতির সামগ্রিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়তো এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তার গুরুত্ব হ্রাস পেতো। এমনকি এর ফলে অন্যান্য জাতি তার ওপর প্রাধান্য পর্যন্ত বিস্তার করতে পারে। এমতাবস্থায় বস্তুগত উপকরণের প্রাচুর্য, ডিগ্রীধারী ও পন্ডিত ব্যক্তিদের বাহুল্য এবং বাহ্যিক শোভা সৌন্দর্যের চাকচিক্য কোনোই কাজে আসতে পারেনা।

এর চাইতেও বড় আর একটি কথা রয়েছে। কুরআনে হাকীম অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে, 'তোমরা যদি মুমিন হও তো তোমরাই সুমুন্নত হবে,' 'আল্লাহর দলই জয়যুক্ত হবে।' এবং 'যারা ঈমান ও সৎ কর্মের দ্বারা ভূষিত হবে, তারা অবশ্যই দুনিয়ার খিলাফত লাভ করবে।' এই দৃঢ়তার ভিত্তি কি? অন্যান্য জাতি যতোই বস্তুগত উপকরণের অধিকারী হোকনা কেন, মুসলমানরা শুধু ঈমান ও সৎ কর্মের অস্ত্রবলেই তাদের ওপর জয়যুক্ত হবে এতো বড় দাবি কোন্ ভিত্তির ওপর করা হয়েছে?

কুরআনই এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ط وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّايَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ، مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ .

অর্থ ঃ হে মানবগণ! একটি উপমা বর্ণিত হচ্ছে, একে মনোযোগ দিয়ে শোনো। আল্লাহকে ত্যাগ করে তোমরা যে জিনিসগুলোকে ডাকো, তারা একটি মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেনা। যদি তারা সবাই মিলে এই কাজে শক্তি প্রযোগ করে, তবুও নয়। তেমনিভাবে একটা মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো জিনিস ছিনিয়ে নেয় তো তার কাছ থেকে সে জিনিসটি ছাড়িয়ে আনবার ক্ষমতাও তাদের নেই। প্রার্থনাকারী যেমন দুর্বল, তেমনি প্রার্থিত বস্তুটিও দুর্বল। এই লোকেরা আল্লাহকে উপযুক্ত মর্যাদাই প্রদান করেনা। অথচ আল্লাহই হচ্ছেন প্রকৃত ক্ষমতা ও মর্যাদাবান।' (সূরা হজ্জ ঃ ৭৩-৭৪)

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ –

অর্থ ঃ যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শক্তিকে পৃষ্ঠপোষক মনে করছে, তাদের উপমা হচ্ছে মাকড়সা; সে ঘর তৈরি করে বটে, কিন্তু সমস্ত ঘরের চাইতে মাকড়সার ঘরই হচ্ছে বেশি দুর্বল।' (সূরা ঃ আনকাবূত ঃ ৪১)

অর্থাৎ যারা শুধু বস্তুগত শক্তির উপর নির্ভর করে, তাদের নির্ভরের জিনিসগুলোই হচ্ছে এমনি যে, তারা নিজেরাই কোনোরূপ শক্তির অধিকারী নয়। এমন শক্তিহীন বস্তুনিচয়ের ওপর নির্ভর করার স্বাভাবিক ফলে তারা নিজেরাও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের মতে যে দুর্ভেদ্য কেল্লা নির্মাণ করে তা মাকড়সার জালের মতোই ঠুনকো। যারা প্রকৃত ক্ষমতাবান ও সম্ভ্রমশালী তারা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করে সমুত্থিত হয়, তাদের মোকাবিলা করার মতো শক্তি কখনোই এদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারেনা :

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَاانْفِصَامَ لَهَا .

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি তাগূত বা খোদাদ্রোহী শক্তিকে ছেড়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, সে এমন দৃঢ় রজ্জু আঁকড়ে ধরেছে, যা কখনো ছিন্ন হবার নয়।' (সূরা বাকারা ঃ ২৫৬)

কুরআন দৃঢ়তার সঙ্গে এ-ও দাবি জানিয়েছে যে, যখনই ঈমানদার ও কাফিরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, তখন ঈমানদার লোকেরাই বিজয়ের অধিকারী হবে।

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لاَيَجِدُوْنَ وَلِيًّاوَّلاَنَصِيْرًا ـ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً .

অর্থ ঃ কাফিররা যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তো অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে; অতপর তারা কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবেনা। এটাই আল্লাহ তায়ালার নীতি, যা আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। আর তোমরা কখনো আল্লাহর নীতিতে ব্যতিক্রম দেখতে পাবেনা।' (সূরা আল-ফাতাহ্ ঃ ২২-২৩)

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنَ .

অর্থ ঃ আমরা কাফিরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো; কেননা তারা আল্লাহর সঙ্গে সেসব বিষয়কে শরীক করেছে, যেগুলোকে তিনি কোনো মর্যাদাই দান করেননি।' (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫১)

এর কারণ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে লড়াই করে, আল্লাহর শক্তি তার সহায়ক হয় আর আল্লাহ যাকে সহায়তা করেন, তার মোকাবিলায় কারো কোনো জোরাজুরিই চলতে পারেনা ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لاَمَوْلٰى لَهُمْ ـ

অর্থ ঃ এর কারণ হলো, ঈমানদারদের সাহায্যকারী হচ্ছেন আল্লাহ আর কাফিরদের কোনো সাহয্যকারীই নেই।' (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১১)

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى .

অর্থ ঃ তুমি যখন তীর ছুঁড়েছিলে, তখন তুমি ছুঁড়োনি; বরং তা ছুঁড়েছিলেন আল্লাহ।' (সূরা আনফাল ঃ ১৭)

এই হচ্ছে মুমিন ও সৎ লোকদের শক্তিমত্তার কথা। অপরদিকে এটাও আল্লাহ্র চিরন্তন নিয়ম যে, যে ব্যক্তি ঈমানদার ও সচ্চরিত্রবান, যার আচরণ ও ক্রিয়াকান্ড স্বার্থপরতার কলুষতা থেকে মুক্ত, যে প্রবৃত্তির অভিরুচি ও জৈবিক বাসনার পরিবর্তে আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধানের যথাযথ পায়রবী করে – তার জন্যে লোকদের মনে প্রীতির আসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। লোকদের মন স্বভাবতই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের সশ্রদ্ব দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ হয়। লেনদেন ও কাজ কারবারে নিশ্চিন্তে তার প্রতি নির্ভর করা হয়। শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সবাই তাকে সত্যবাদী বলে মনে করে এবং তার শালীনতা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার ওপর ভরসা করে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

অর্থ ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আল্লাহ লোকদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালোবাসার সঞ্চার করবেন।' (সূরা মরিয়ম ঃ ৯৬)

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ .

অর্থ ঃ আল্লাহ ঈমানদার লোকদেরকে একটি সুদৃঢ় বাণীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করে দেন – দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতেও।' (সূরা ইব্রাহিম ঃ ২৭)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক আর নারী, মুমিন হলে অব্যশই আমরা তাকে উত্তম জিন্দেগী প্রদান করবো এবং তার উত্তম কৃতকর্মের প্রতিফলন দান করবো।' (সুরা নাহ্‌ল ঃ ৯৭)

কিন্তু এগুলো কিসের ফলাফল? কেবল মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করার, মুসলমানের ন্যায় নাম রাখার, কতিপয় নির্দিষ্ট সামাজিক রীতি গ্রহণ করার এবং কয়েকটি হিসাব করা রসম রেওয়াজ পালন করার ফল এগুলো নয়। এই ফলাফল প্রকাশের জন্যে কুরআনে হাকীম ঈমান ও নেক কাজের শর্ত আরোপ করেছে। তার লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, তাদের চিন্তাধারা, ধ্যান ধারণা, নৈতিক চরিত্র, কাজ কারবার সর্বত্রই তার কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে। তাদের গোটা জীবনধারা এই পবিত্র কালেমার যথার্থ ছাঁচে গড়ে উঠবে, তাদের মন মগজে এই কালেমার বিপরীত কোনো কল্পনাই ঠাঁই পাবেনা এবং তার প্রতিকুল কোনো কাজেও তারা লিপ্ত হবেনা। বস্তুত মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করার ফল এমনিভাবে প্রকাশ পেতে হবে যে, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই লোকদের জীবনে এক প্রচন্ড বিপ্লব সৃষ্টি হবে, তাদের শিরা উপশিরায় তাকওয়ার ভাবধারা অনুপ্রবিষ্ট হবে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো শক্তির সামনে তাদের মস্তক নতো হবেনা। আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে তাদের হাত প্রসারিত হবেনা। তাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ভয় থাকবেনা। তাদের ভালবাসা ও শত্রুতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্যে হবেনা। আল্লার বিধান ছাড়া আর কারো বিধান তাদের জীবনে কার্যকর হবেনা। আপন প্রবৃত্তি ও তার যাবতীয় বাসনা এবং তার কাম্য ও মনোপুত বস্তুগুলোকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কুরবানী করতে তারা হামেশা প্রস্তুত থাকবে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের সামনে কেবল 'শুনলাম ও মেনে নিলাম' – এটুকু বলা ছাড়া তাদের আর কোনোই কথা বা কাজ থাকবেনা। এমনি অবস্থা যখন সৃষ্টি হবে, তখন তাদের শক্তি কেবল নিজেদের প্রাণ ও দেহের শক্তিই হবেনা; বরং তা হবে সেই মহাপরাক্রমশালীর শক্তি, যার সামনে আসমান ও জমিনের প্রতিটি

জিনিসই অবনমিত হয়ে আছে। তারা সেই মহাজ্যোতির্ময়ের দীপ্তিতে দীপ্তিমান হবে, যিনি তামাম জাহানেরই প্রকৃত মাহবুব ও মাশুক।

নবী করীম সা. ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এই বস্তুটিই ছিলো মুসলমানদের আয়ত্তাধীন। অতপর এর কী ফলাফল প্রকাশ পেয়েছিল ইতিহাসই তার সাক্ষী। সে যুগে যে ব্যক্তিই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কথাটি উচ্চারণ করেছে, তার গোটা আকৃতিই বদলে গিয়েছে। কাঁচা তামা থেকে সে হঠাৎ নিখাঁদ সোনায় পরিণত হয়েছে, তার ভেতরে এমনি আকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি হয়েছে যে, লোকদের হৃদয় স্বভাবতই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তার প্রতি কারো দৃষ্টি পড়লেই সে অনুভব করেছে, যেনো তাকওয়া ও পরহেযগারীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি সে প্রত্যক্ষ করছে। সে হয়তো অশিক্ষিত, দরিদ্র, উপবাসী, ছেড়া কাপড় পরিহিত এবং চাটাইয়ের ওপর উপবিষ্ট ছিলো, তবু লোকদের হৃদয় মনে তার ভীতি এমনি আসন জুড়ে বসতো, যা বড় বড় জমকালো শাসকদের ভাগ্যেও জুটতোনা। একজন মুসলমানের অস্তিত্ব ছিলো একটি দীপের মতো; সে যেখানে থাকতো বা যেদিকেই যেতো, চারদিকে তাঁর দীপ্তি ছড়িয়ে পড়তো। সে দীপের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ দীপ দীপ্তিমান হতো। পরন্তু সে দীপ্তিকে যে গ্রহণ না করতো, কিংবা তার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধাতে চাইতো, তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবার ক্ষমতাও রাখতো।

এমনি ঈমানী শক্তি ও চরিত্রের অধিকারী মুসলমানই তারা ছিলো যে, তাদের সংখ্যা যখন মাত্র সাড়ে তিন শো'র মতো ছিলো, তখন গোটা আরবকেই তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসলো। আর যখন তাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষে গিয়ে উন্নিত হলো, তখন গোটা দুনিয়াকেই তারা পদানত করবার দুর্বার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলো এবং তখন তাদের মোকাবিলায় যে শক্তি এসে দাঁড়িয়েছে, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

উপরে যেমন বলা হয়েছে, মুসলমানদের প্রকৃত শক্তি হচ্ছে এমনি ঈমান ও সচ্চরিত্রের শক্তি। এ শক্তি কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কথাটির তাৎপর্য হৃদয় মনে বদ্ধমূল হবার ফলেই অর্জিত হতে পারে। কিন্তু এই তাৎপর্য যদি অন্তরে দৃঢ়মূল না হয়, কেবল মুখেই এই শব্দটি উচ্চারিত হতে থাকে এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মজীবনে কোনো বিপ্লবের সৃষ্টি না হয় – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার পরও যদি মানুষের অবস্থা অবিকল পূর্বের মতোই থাকে এবং তার ও এই কালেমায় অবিশ্বাসীদের মধ্যে নৈতিক ও বাস্তব দিক থেকে কোনো পার্থক্য না থাকে, সেও যদি অবিশ্বাসীদের মতো গায়রুল্লাহর সামনে মাথা নতো করে এবং হাত বাড়িয়ে দেয়, তাদেরই মতো গায়রুল্লাহকে ভয় করে, তার সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তার প্রেমে আসক্ত হয়, তাদেরই মতো ইচ্ছা প্রবৃত্তির গোলাম হয়, আল্লাহ্‌র বিধান ত্যাগ করে মানবীয় আইন কিংবা আপন প্রবৃত্তির আনুগত্য করে, তার চিন্তাধারা, ইচ্ছা বাসনা ও মনন শক্তিতে একজন অমুসলিমের চিন্তা বাসনা মননের ন্যায়ই

কলুষতা থাকে, তার কথাবার্তা, কাজকর্ম ও আচার ব্যবহারও যদি একজন অমুসলিমের মতোই হয়, তাহলে মুসলমান কিসের ভিত্তিতে অমুসলমানের ওপর প্রতিপত্তি লাভ করবে? ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি না থাকলে মুসলমান ঠিক অমুসলমানের মতোই একজন মানুষ বই তো কিছু নয়! অতপর মুসলমান ও অমুসলমানের প্রতিযোগিতা কেবল দৈহিক শক্তি ও বস্তুগত উপকরণের ভিত্তিতেই হবে এবং এ প্রতিযোগিতায় যে শক্তিমান, সে-ই দুর্বলের ওপর বিজয়ী হবে।

এ দুটি অবস্থার পার্থক্য ইতিহাসের পাতায়ও এমনি সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে যে, এক নজরেই তা প্রত্যক্ষ করা চলে। কোথাও হয়তো দেখা যাবে যে, মুষ্টিমেয় মুসলমান বড় বড় রাষ্ট্রশক্তিকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে এবং আটকের* দুই তীর থেকে আটলান্টিকের উপকূল পর্যন্ত ইসলামের কর্তৃত্বকে বিস্তৃত করে দিয়েছে। অপরদিকে আজকে যেমন দেখা যাচ্ছে, কোটি কোটি মুসলমান দুনিয়ায় বাস করছে, অথচ তারা অমুসলিম শক্তির পদানত হয়ে আছে। পরন্তু যে জনপদগুলোতে কোটি কোটি মুসলমান কয়েক শতক ধরে বসবাস করছে, সেখানেও আজ কুফর ও শিরকের প্রাবল্যই বার্তমান রয়েছে।

❖ ❖ ❖

* পাঞ্জাব ও সীমান্তের মধ্যস্থলে অবস্থিত সিন্ধুর একটি উপনদী। - সম্পাদক

১৭

ধর্ম বীর পুরুষের জন্যে, কাপুরুষের জন্যে নয়*

আমার (সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং) গ্রন্থটি দেখে বারবার একটি মন্তব্য প্রকাশ করা হচ্ছে। তা হলো এই যে, বর্তমান যুগে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রাজনৈতিক শক্তির পোষকতায় আমাদের চারিদিকের আর্থিক জগতের উপর কর্তৃত্বশীল হয়ে আছে। অর্থনীতির গোটা গাড়ীই চালিত হচ্ছে পুঁজিবাদী নীতির নির্দেশিত পথে। শুধু পুঁজিদাররা হচ্ছে এর পরিচালক আর এর সাহায্যে সেইসব জাতি প্রগতির পথে এগিয়ে চলছে, যাদের জন্যে ধনোৎপাদন ও ধনব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় বা নৈতিক বন্ধন নেই। অন্যদিকে আমাদের সামাজিক ও সামগ্রিক শক্তি আজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত। দুনিয়ার গোটা অর্থব্যবস্থা বদলে ফেলা তো দূরের কথা, নিজ জাতির মধ্যে ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে পুরোপুরি কায়েম করতেও আমরা সামর্থ নই। এমতাবস্থায় আমাদের ধর্মীয় বন্ধন যদি আমাদেরকে যুগের চলমান অর্থব্যবস্থায় পুরোপুরি অংশগ্রহণে বিরত রাখে, তাহলে আমাদের জাতির পক্ষে আর্থিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির উপায় উপকরণ থেকে উপকৃত হবার ব্যাপারে অন্যান্য জাতির চাইতে পেছনে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোনোই ফলোদয় হবেনা। এর ফলে আমরা ক্রমাগত দরিদ্র হতে থাকবো, আর প্রতিবেশি জাতিগুলো ধনবান হতে থাকবে। পরন্তু এই আর্থিক দুর্বলতা নৈতিক, রাজনৈতিক ও তামাদ্দুনিক দিক থেকেও আমাদের নিস্তেজ ও হীনবল করে ফেলবে। এ শুধু আন্দাজ অনুমানের কথা নয়; বরং বাস্তব দুনিয়ায়ও আমরা এই অবস্থায়ই দেখতে পাচ্ছি বছরের পর বছর ধরেই। আর ভবিষ্যতে আমাদের যে পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে, তার লক্ষণগুলোও এমনকিছু অস্পষ্ট ব্যাপার নয় যে, তা কারো চোখেই পড়বেনা। কাজেই শুধু শরীয়তের আইন রচনা করে আমাদের কী লাভ? ইসলামের আর্থিক নীতি বিবৃত করেই বা আমাদের কী ফায়দা? বরং এই পরিস্থিতিতে ইসলামী আইনের অনুসৃতির সাথে সাথে আমাদের আর্থিক দূরবস্থারও প্রতিকার করা এবং উত্তরোত্তর তরক্কির দিকে এগিয়ে চলার কোনো পথ আছে কিনা, আমরা তাই জানতে চাই। যদি তা না থাকে তো দুটি অবস্থার মধ্য থেকে একটির অবশ্যই মুখোমুখি হতে হবে – হয় মুসলমানরা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে, নতুবা যেসব আইনকানুন যুগের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম, অন্যান্য জাতির ন্যায় মুসলমানরাও সেগুলোর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু এ প্রসংগে আমাদের বক্তব্য হলো, এই প্রশ্নটি তো শুধু সুদ পর্যন্তই সীমিত নয় – এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও প্রশস্ত। যদি জীবনের তামাম দিক ও

---

* প্রবন্ধটি সর্ব প্রথম ১৯৩৬ সালের মে মাসে তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। - সম্পাদক

বিভাগের মধ্যে শুধু অর্থনৈতিক বিভাগেই একটি অনিসলামী ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত থাকতো, তাহলে বিষয়টি হয়তো তুলনামূলকভাবে অনেক হাল্কা হতো। কিন্তু বাস্তব অবস্থা অন্য রকম। নিজের চারিদিকের দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন – খোদ নিজের অবস্থাটা পর্যালোচনা করে দেখুন। অনিসলামী প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে জীবনের কোন্ দিকটি মুক্ত রয়েছে? ধর্মবিশ্বাস, চিন্তধারা ও মতাদর্শের ওপর কি জড়বাদ ও নাস্তিকতা কিংবা অন্তত সন্দেহ ও সংশয়ের প্রাধান্য বিস্তৃত নয়? শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর কি খোদাবিমূখতা কর্তৃত্বশীল নয়? তাহযীব ও তমদ্দুনের ওপর কি ফিরিঙ্গীপনার প্রভূত্ব কায়েম নয়? পাশ্চাত্যপনা কি সমাজের গভীর তলদেশ অবধি দৃঢ়মূল নয়? তার প্রতিপত্তি থেকে নৈতিক চরিত্র কি নিরাপদ? লেনদেনের ব্যাপার কি তার প্রাধান্য থেকে মুক্ত? আইন কানুন ও রাষ্ট্রনীতি, সরকারী পলিসি ও কর্মধারা, মতাদর্শ ও কর্মকান্ড এর কোনো একটিও কী তার প্রভাব থেকে মুক্ত?

পরিস্থিতি যখন এই, তখন আলোচ্য প্রশ্নটিকে শুধু অর্থনীতি এবং তারও একটিমাত্র দিকের মধ্যে কেন সীমিত রাখতে চান? একে আরো ব্যাপক ও প্রশস্ত করে তুলুন এবং সমগ্র জীবনের উপর ছড়িয়ে দিন। বরং বলুন যে, জীবননদী তার গতিপথ বদলে ফেলেছে। প্রথমে সে ইসলামের পথে প্রবহমান ছিলো, এখন সে অনিসলামী পথে প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা তার গতিপথ বদলাতে সক্ষম নই। এমনকি তার স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটবার মতো শক্তি সামর্থও আমাদের নেই। অথচ আমাদের দাঁড়িয়ে থাকাতেও রয়েছে মৃত্যুর বিভিষিকা। এমতাবস্থায় আমরা মুসলমানও থাকতে পারি আর এই প্রবহমান নদীর স্রোতে নিজেদের তরীও ভাসিয়ে দিতে পারি – আমাদেরকে এমন কোনো পথ দেখানো হোক। অর্থাৎ আমরা কা'বার যাত্রিও থাকবো আর তুর্কীস্তানগামী কাফেলার সঙ্গেও সম্পর্ক রাখবো। আমরা আমাদের ভাবধারা, মতাদর্শ, জীবনলক্ষ্য, জীবনাদর্শও কর্মপন্থায় অমুসলমানও হবো আবার মুসলমানও থাকব। যদি এই বৈপরীত্যগুলোকে কেউ একত্রিত করার কোনো পথনির্দেশ দান করতে না পারেন, তা হলে তার পরিণতিতে হয় আমরা এই নদীর তীরেই বসে থাকব, নতুবা আমাদের নৌকার ওপর আঁটা ইসলামের এই লেবেলটিকে একদিনে ছেঁড়ে ফেলব। অতপর অন্যান্য নৌকার সাথে আমাদের এই নৌকাটিকেও নদীর স্রোতে সমানে চলমান দেখা যাবে।

আমাদের আলোকপ্রাপ্ত ও 'প্রগতিবাদী'রা যখন কোনো সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন, তখন তারা সর্বশেষ যুক্তি হিসেবে – যা তাদের কাছে সবচাইতে শক্তিশালী যুক্তি বলে পরিগণিত – বলেন যে, এ হচ্ছে যুগের ধর্ম, এ দিকেই হাওয়ার গতি প্রবাহিত, দুনিয়ায় এরকমই হচ্ছে! সুতরাং আমরা কি করে এর বিরোধিতা করতে পারি? আর বিরোধিতা করেই বা কিভাবে বেঁচে থাকতে পারি! নৈতিকতার প্রশ্ন তোলা হলে এরা বলেন, দুনিয়ার নৈতিক মানদন্ড বদলে গিয়েছে। এর মানে হলো মুসলমানরা সেই পুরনো নৈতিক মানকে কী করে আঁকড়ে থাকতে পারে? পর্দা সম্পর্কে কথা উঠলে এরা বলেন, দুনিয়া থেকে

পর্দার চলন উঠে গিয়েছে। অর্থাৎ যে জিনিসটি দুনিয়া থেকে উঠে গিয়েছে, মুসলমানরা তাকে কি না উঠিয়ে পারে? শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা হলে এর সর্বশেষ দলিল হিসেবে এরা বলেন, দুনিয়ায় ইসলামী শিক্ষার চাহিদা নেই। এর উদ্দেশ্য হলো, বাজারে যে বস্তুটির চাহিদা নেই, মুসলমান শিশু তেমনি বস্তু কি করে হতে পারে? আর যেরূপ পণ্যের চাহিদা আছে, তেমনি পণ্য সে হবেনা কেন? সুদ সম্পর্কে আপত্তি তোলা হলেই এরা বলেন, এখন সুদ ছাড়া দুনিয়ায় কাজ চলতে পারেনা। আর দুনিয়ার কাজ সম্পাদনের জন্যে যে জিনিসটি নিতান্ত আবশ্যক, মুসলমান তা কি করে পরিহার করতে পারে? ফলকথা, শিক্ষা নৈতিকতা, সমাজ, তমদ্দুন, অর্থনীতি, আইন কানুন, রাজনীতি এবং জীবনের অন্যান্য যে কোনো বিভাগে তারা ইসলামী নীতি বর্জন করে ফিরিঙ্গীপনার অনুসরণ করতে চায়, তার জন্যে যুগের ধর্ম, হাওয়ার গতি ও দুনিয়ার চলনই তাদের কাছে অকাট্য দলিল হয়ে দাঁড়ায়। আর এই দলিলটিকে পাশ্চাত্যানুসরণ তথা আংশিক ধর্মত্যাগের বৈধতার পক্ষে অমোঘ হাতিয়ার ভেবে পেশ করা হয় এবং ধারণা করা হয় যে, এই দলিলের দ্বারা ইসলামী ইমারতের যে অংশটির ওপরই হামলা করা সম্ভব, তাকে ধ্বসিয়ে দেয়াই কর্তব্য।

আমরা বলি, ভাঙ্গাচুরার এই প্রস্তাবগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে পেশ না করে সবগুলো মিলিয়ে একটি পুর্ণাঙ্গ প্রস্তাব কেন তৈরি করেননা? গৃহের এক একটি দেয়াল, এক একটি খুঁটি এবং এক একটি কামরাকে বিধ্বস্ত করার পৃথক পৃথক প্রস্তাব তৈরি করায় এবং প্রতিটি বিষয়ের উপর স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করায় তো অযথা সময়ের অপচয় হয়। তার চাইতে এটা কেন বলেননা যে, গোটা বাড়িটাই ধ্বসিয়ে দেয়া দরকার। কেননা এর রং যুগের রং থেকে ভিন্ন, এর গতি হাওয়ার গতির বিপরীত, এর গঠন প্রকৃতি দুনিয়ার প্রচলিত ইমারতগুলোর গঠন প্রকৃতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ!

যারা প্রকৃতই এমনি চিন্তাধারা পোষণ করেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা করা নিস্ফল। তাদের জন্যে তো সোজা ও সুস্পষ্ট জবাব হচ্ছে এই যে, এই বাড়িটি ধ্বসানো এবং এর জায়গায় অন্য বাড়ি তৈরি করার ঝুঁকি কেন আপনারা গ্রহণ করেছেন? অন্য যেসব সুন্দর, সুদৃশ্য ও সুরম্য বাড়ি আপনাদের পছন্দ হয় সেখানেই গিয়ে উঠুন। যদি নদীর স্রোতে প্রবাহিত হবারই ইচ্ছা হয় তো এই নৌকার লেবেল ছেঁড়ার কষ্ট কেন স্বীকার করতে যাবেন? যেসব নৌকা আগে থেকেই প্রবাহিত হচ্ছে, তার কোনো একটিতেই জায়গা করে নিন। যারা আপন চিন্তাধারা, নৈতিকতা, সামাজিকতা, অর্থনীতি, শিক্ষাদীক্ষা তথা জীবনের কোনো একটি জিনিসেও মুসলমান নয় এবং মুসলমান থাকতে ইচ্ছুকও নয়, তাদের নামমাত্র মুসলমান থাকায় ইসলামের আদৌ কোনো ফায়দা নেই; বরং ক্ষতিই সমধিক। তারা খোদা পূজারী নয়, হাওয়া পূজারী। দুনিয়ায় যদি মূর্তি পূজার প্রাবল্য দেখা দেয় তো এরা নিশ্চিতভাবে মূর্তি পূজা শুরু করে দেবে। দুনিয়ায় যদি নগ্নতার প্রচলন হয় তো এরা অবশ্যই পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলবে। দুনিয়ায় যদি অপবিত্র বস্তু খাওয়া শুরু হয় তো এরা নিসন্দেহে অপবিত্রতাকে বলবে

পবিত্রতা, আর পবিত্রতাকে অপবিত্রতা। এদের মন মগজ হচ্ছে গোলাম, তাই গোলামির জন্যে এরা উন্মুখ হয়ে আছে। এদের জীবনে ফিরিঙ্গিপনার প্রাবল্য রয়েছে, এজন্যেই নিজেদের গোপন থেকে প্রকাশ্য পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরা ফিরিঙ্গি হতে ইচ্ছুক। আবার কাল যদি হাবশীদের প্রাধান্য দেখা দেয়, তাহলে অবশ্য এরা হাবশী হবার প্রয়াস পাবে নিজেদের মুখমন্ডলে কালি মেখে নেবে, ওষ্ঠাধর মোটা করবে, মাথার চুল হাবশীদের ন্যায় কুঞ্চিত করবে এবং হাবশীদের কাছ থেকে আগত প্রতিটি জিনিসেরই পূজা শুরু করে দেবে। ইসলামের পক্ষে এমন গোলামদের কোনোই প্রয়োজন নেই। যদি কোটি কোটি লোকের তালিকা থেকে এইসব মুনাফিক ও গোলামি প্রবৃত্তির লোকের নাম বাদ দেয়া হয় ঃ

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَايَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ .

অর্থ ঃ তারা আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহও তাদের ভাল বাসেন। তারা মুমিনদের প্রতি নম্র, কাফিরদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে লড়ে, চলে এবং একাজে কারো তিরস্কারের ভয় করেনা।" (সূরা মায়েদা : ৫৪)

এমনি চরিত্রবিশিষ্ট মাত্র কয়েক হাজার মুসলমানও থেকে যায়, তাহলে বর্তমান সময়ের চাইতে ইসলাম অনেক বেশি শক্তিশালী হবে। ঐ কোটি কোটি লোকের নিষ্ক্রমণ তার পক্ষে রোগীর দেহ থেকে দূষিত রক্ত নির্গত হবারই শামিল বলে গণ্য হবে।

نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের ওপর কোনো বিপদ এসে পড়বে।' – এটা কোনো নতুন আওয়াজ নয়। এ আওয়াজটি বহু আগে থেকেই মুনাফিকদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়ে আসছে। এ আওয়াজই তো লোকদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন কপটতার সন্ধান বলে দেয়। এই আওয়াজ উচ্চারণকারীরা হামেশাই ইসলাম বিরোধী শিবিরের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরা আল্লাহর নির্ধারিতত সীমা ও বিধি নিষেধকে হামেশাই পায়ের বেড়ি এবং গলার ফাঁস মনে করে। আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য চিরকালই এদের কাছে অপ্রীতিকর। এরা চিরদিনই আল্লাহর আনুগত্যের ভেতর জান ও মালের ক্ষতি এবং তাঁর নাফরমানীতেই ইহজীবনের তাবত সাফল্য দেখতে পেয়েছে। কাজেই এদের মুখ চেয়ে আল্লাহর বিধানকে আগে কখনো বদলানো হয়নি, এখনো বদলানো যেতে পারেনা আর ভবিষ্যতেও বদলানো হবেনা। আল্লাহর বিধান ভীরু কাপুরুষদের জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। নফসের দাস ও দুনিয়ার গোলামদের জন্যে নাযিল হয়নি। বাতাসের বেগে উড়ে চলা খড় কুটো, পানির স্রোতে ভেসে চলা কীট পতঙ্গ এবং প্রতি রঙে রঙ্গীন হওয়া রংহীনদের জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। এমন দুসাহসী নরশার্দুলদের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বাতসের গতি বদলে দেবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, যারা নদীর তরঙ্গের সাথে লড়তে এবং তার স্রোতধারা ঘুরিয়ে দেবার মতো সৎ সাহস রাখে। যারা আল্লাহর রংকে দুনিয়ার সকল রঙের

চাইতে বেশি ভালবাসে এবং সে রঙেই যারা গোটা দুনিয়াকে রাঙিয়ে তুলবার আগ্রহ পোষণ করে। যে ব্যক্তি মুসলমান তাকে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার জন্যে পয়দা করা হয়নি। তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো জীবন নদীকে তার ঈমান ও প্রত্যয় নির্দেশিত সোজা ও সরল পথে চালিত করা। যদি সেই সোজা পথ থেকে নদী তার স্রোত ফিরিয়ে নেয় আর সেই পরিবর্তিত স্রোতধারায়ই কেউ ভসে চলতে সম্মত হয়ে যায় তো এমন ব্যক্তির ইসলামের দাবি একেবারেই মিথ্যা। বস্তুত যে ব্যক্তি সাচ্চা মুসলমান, সে এই ভ্রান্তমুখী স্রোতের সঙ্গে লড়াই করবে, তার গতি ঘুরিয়ে দেবার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করবে, সাফল্য ও ব্যর্থার কোনো পরোয়াই সে করবেনা। এই লড়াইয়ের যে কোনো সম্ভাব্য ক্ষতিই সে বরণ করে নেবে। এমনকি নদীর স্রোতের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তার বাহু যদি ভেঙ্গেও যায়, কিংবা তার শক্তিও যদি শিথিল হয়ে পড়ে এবং পানির তরঙ্গঘাত তাকে আধমরা করে কোনো তীরের দিকে ছুড়ে ফেলেও দেয়, তবুও তার আত্মা কখনো পরাজয় বরণ করবেনা। তার দিলে এই বাহ্যিক ব্যর্থতার জন্যে এক মুহূর্তের তরেও কোনো অনুতাপ জাগবেনা, কিংবা নদীর স্রোতে ভেসে চলা কাফির ও মুনাফিকদের সাফল্যের জন্যে ঈর্ষার ভাবধারা ও প্রশ্রয় পাবেনা।

কুরআন মুসলমানদের সামনে রয়েছে। পয়গম্বরদের আদর্শ ও জীবন চরিত তাদের সামনে রয়েছে। শুরু থেকে আজ পর্যন্তকার ইসলামের অমর পতাকাবাহীদের জীবন ও ইতিবৃত্ত তাদের সামনে রয়েছে। ঐসব থেকে কি তারা এই শিক্ষাই পাচ্ছে যে, হাওয়া যেদিকে যাবে, তারাও সেদিকেই উড়ে চলবে? পানি যেদিকে প্রবাহিত হবে, তারাও সেদিকে ভেসে চলবে? যমানা যে রং ধারণ করবে, তারাও সেই রঙ্গে রঙ্গিন হবে? এই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে কোনো কিতাবের অবতরণ এবং কোনো নবী প্রেরণেরই বা কি প্রয়োজনটা ছিলো? তাদের হেদায়েতের জন্যে বাতাসের ঢেউ, তাদের পথনির্দেশের জন্যে দুনিয়ার জীবনপ্রবাহ এবং তাদেরকে টিকটিকির চরিত্র শেখানোর জন্যে যমানার রঙহীনতাই তো যথেষ্ঠ ছিলো। এই ধরনের নাপাক শিক্ষার জন্যে আল্লাহ কোনো কিতাব অবতরণ করেননি আর এ উদ্দেশ্যে কোনো নবীও প্রেরণ করেননি। মহান সত্তার কাছ থেকে যে পয়গাম এসেছে, তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে, দুযনিয়া যেসব ভ্রান্ত পথে এগিয়ে চলছে, সেগুলোকে বর্জন করে একটি সোজা পথ নির্ধারণ করতে হবে, তার বিপরীত পথগুলোকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে এবং দুনিয়াকে সেসব পথ থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে। ঈমানদার লোকদের একটি জামায়াত গঠন করতে হবে এবং সে জামায়াত শুধু নিজেই সোজা পথে চলবেনা; বরং দুনিয়াকেও সেদিকে টেনে আনবার চেষ্টা করবে।

নবী রসূল এবং তাঁদের অনুবর্তিগণ হামেশা এই উদ্দশ্যেই জিহাদ করেছেন। এ জিহাদে তাঁরা শুধুমাত্র দুখ কষ্টই করেননি বরং সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন – এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন। তবু তাঁদের কেউ বিপদের ভয়ে কিংবা স্বার্থের প্রলোভনে যুগের গতিকে কখনো নিজের মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেননি। এখন যদি কোনো ব্যক্তি বা দল আসমানী হেদায়েতের নির্দেশিত পথে চলার

ভেতর ক্ষতি, অসুবিধা বা বিপদ দেখতে পায় এবং ঐসবে ভীত হয়ে এমন কোনো পথে চলতে চায়, যে পথের পথিকদেরকে স্বচ্ছল, কৃতকাম ও উন্নতিশীল বলে মনে হয় – তাহলে সে সানন্দেই নিজের পছন্দনীয় পথে যেতে পারে। কিন্তু সে নির্বোধ ও লোভাতুর মানুষ নিজেকে এবং গোটা দুনিয়াকে এ ধোকা দেবার কোন চেষ্টা করছে যে, আল্লাহর কিতাব এবং নবীর নির্দেশিত পন্থা বর্জন করেও সে তারই অনুবর্তী? অবাধ্যতা স্বতই এক বড় অপরাধ; তার সঙ্গে মিথ্যা, প্রতারণা ও কপটতা যুক্ত করে কোন্ ফায়দাটা অর্জন করা যাবে?

জীবন নদী একবার যেদিকে প্রবাহিত হয়, সেদিক থেকে আর তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়া যায়না – এ ধারণাটি যুক্তির দিক দিয়ে যেমন ভ্রান্ত, তেমনি অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণও এর প্রতিকূল সাক্ষ্য দেয়। দুনিয়ায় একবার নয়, অসংখ্যবার বিপ্লব এসেছে এবং প্রত্যেক বিপ্লবই এ নদীর গতি বদলে দিয়েছে। এর সবচাইতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তো ইসলামের ইতিহাসেই বর্তমান রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ সা. যখন দুনিয়ায় আগমন করেন, তখন জীবনের এই নদী কোন্ দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল? তামাম দুনিয়ায় কি তখন কুফর ও শিরকের প্রাধান্য বর্তমান ছিলোনা? জালিম ও স্বৈরাচারী শাসনশক্তি কি তখন কায়েম ছিলোনা? শ্রেণী ভেদের জুলুমমূলক বৈষম্য কি মানবতাকে কালিমালিপ্ত করে রাখেনি? নৈতিকতায় অশ্লীলতা, সমাজ জীবনে আত্মপূজা, অর্থনীতিতে জুলুমমূলক সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ এবং আইন কানুনে কি অবিচারের প্রাবল্য বর্তমান ছিলোনা? কিন্তু একটিমাত্র লোক দাঁড়িয়েই গোটা দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসলেন! তৎকালীন দুনিয়ার সমস্ত ভ্রান্ত চিন্তা, মতবাদ ও গলদ পন্থাকে তিনি রহিত করে দিলেন এবং সেগুলোর মোকাবিলায় একটি নিজস্ব মত প্রচার ও জিহাদের দ্বারা দুনিয়ার গতিকে তিনি ঘুরিয়ে দিলেন এবং এইভাবে যামানার রংও বদলে ফেললেন।

এর অধুনাতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে কম্যুনিস্ট আন্দোলন। ঊনিশ শতকে পুজিবাদের আধিপত্য চরম প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিলো। যে ব্যবস্থাটি এতোবড় ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির পোষকতায় দুনিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাকে উৎখাত করাও সম্ভবপর – কোনো নির্বোধ ও কাপুরুষ ব্যক্তি তখন একথা ধারণাও করতে পারতোনা। কিন্তু এমনি পরিস্থিতির মধ্যেই কাল মার্কস্ নামক এক ব্যক্তি কম্যুনিজমের প্রচার শুরু করলেন। বিভিন্ন দেশের সরকার তার বিরোধিতা করলো। আপন দেশ থেকে তিনি বিতাড়িত হলেন। দেশে দেশে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন – অনটন ও দু:খ কষ্টের মুখোমুখি হলেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে কম্যুনিস্টদের একটি শক্তিশালী দল তিনি সৃষ্টি করে গেলেন। এই দলটি মাত্র চল্লিশ বছরের মধ্যে শুধু রাশিয়ার সবচাইতে ভয়ঙ্কর শক্তিকেই উৎখাত করে ছাড়লনা; বরং তামাম দুনিয়ায়ই পুজিবাদের ভিত্তিমূলকে কাঁপিয়ে দিলো। সেই সঙ্গে সে এতো বড় শক্তিশালী এক অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা পেশ করলো যে, আজ দুনিয়ায় তার অনুবর্তীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

এমনকি যেসব দেশে পুজিবাদের কর্তৃত্ব গভীরভাবে বদ্ধমূল, সেসব দেশের আইন কানুনও আজ এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।*

কিন্তু এই বিপ্লব শক্তির প্রভাবেই সংঘটিত হয়েছে আর শক্তি হচ্ছে ঢালাই করার নাম – ঢালাই হবার নাম নয়। অন্যকথায় ঘুরিয়ে দেয়াকে বলা হয় শক্তি – ঘুরে যাওয়াকে নয়। দুনিয়ায় কখনো কাপুরুষ ও নির্বোধেরা কোনো বিপ্লব সৃষ্টি করেনি। যাদের কোন নিজস্ব নীতি বা কোনো জীবন লক্ষ্য নেই, কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে কুরবানী দেবার মতো আগ্রহ যাদের নেই, দু:খ কষ্ট ও বিপদ আপদের মোকাবিলা করার সাহসিকতা যাদের নেই; বরং দুনিয়ায় শুধু আরাম আয়েশ ও সুযোগ সুবিধাই যাদের একান্ত কাম্য, যে কোনো ছাচে ঢালাই হওয়া এবং যে কোনো চাপে নতো হওয়াই যাদের স্বভাব – মানবেতিহাসে এমন লোকদের কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বই দেখা যায়না। কারণ ইতিহাস তো কেবল বীর পুরুষরাই সৃষ্টি করতে পারেন। তারাই অক্লান্ত সাধনা, কুরবানী ও জিহাদের দ্বারা জীবন নদীর গতি ঘুরিয়ে দিয়েছেন। দুনিয়ার ধ্যান ধারণা বদলে দিয়েছেন। আচরণ ও কর্মনীতিতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন। পরন্তু যমানার রঙে রঙিন হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের রঙেই তাঁরা যমানাকে রাঙিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং 'দুনিয়া যে পথে এগিয়ে চলছে, সেপথ থেকে তাকে ফেরানো যেতে পারেনা, যুগের যা ধর্ম, তার অনুসরণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নেই' – এসব কথা বলবার কোনোই অবকাশ নেই। অক্ষমতার মিথ্যা দাবি করার চাইতে নিজেদের দুর্বলতার সত্যতা স্বীকার করাই উচিত। আর যখন তার স্বীকৃতি দেয়া হবে, তখন এ-ও স্বীকার করতে হবে যে, দুর্বল লোকদের জন্যে দুনিয়ায় না কোনো ধর্ম হতে পারে, আর না পারে কোনো নীতি বা বিধি বিধান। এমনি ব্যক্তিকে তো যে কোনো বলবানের সামনেই নতো হতে হবে। যে কোনো শক্তিমানের ভয়েই স্তব্ধ হয়ে থাকতে হবে। সে কখনো কোনো নীতি বা বিধি বিধানের অনুগত হতে পারেনা। আর কোনো ধর্ম যদি তার জন্যে আপন নীতি পরিবর্তন করতে থাকে, তাহলে তা আদতে কোনো ধর্মই নয়।

'ইসলামের বিধি-নিষেধ সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক' – এ-ও একটি ধোকা ছাড়া কিছু নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের কোন্ বিধি নিষেধটি মুসলমানরা পালন করছে? কোন্ সীমাটি তারা লংঘন করেনি? যে জিনিসগুলো তাদের ধ্বংস করছে, ইসলাম তার কোন্‌টির অনুমতি দিয়েছে? তারা ধ্বংস হচ্ছে অপব্যয় ও অপচয়ের ফলে। এরই কারণে বার্ষিক কোটি কোটি টাকা তাদের পকেট থেকে মহাজনদের ভান্ডারে চলে যাচ্ছে। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ইসলাম কি তাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছে? আপন বদ স্বভাবই তো তাদেরকে ধ্বংস করছে। এই চরম দারিদ্রের ভেতরও তাদের লোকদের দ্বারা সিনেমা ও খেল তামাশাগুলো পরিপূর্ণ থাকে। তাদের প্রতিটি ব্যক্তি বেশভূষা ও

* উল্লেখ্য, এটা রাশিয়ায় কমুনিস্ট শাসনের জয়কয়কার যুগের কথা। প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৩৬ সাল।

রূপচর্চার উপকরণে আপন সামর্থের চাইতেও বেশি ব্যয় করে। অর্থহীন প্রথা, প্রর্দশনীমূলক ক্রিয়াকান্ড ও মূর্খতাব্যঞ্জক রং তামাশায় প্রতি মাসে তাদের পকেট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। এর কোন্ কাজটিকে ইসলাম তাদের জন্যে হালাল করেছে? তাদেরকে সবচাইতে বেশি ধ্বংস করছে যাকাত আদায়ে ঔদাসীন্য এবং পারস্পারিক সহযোগিতার প্রতি বেপরোয়া মনোভাব। ইসলাম কি এ জিনিসগুলোকে তাদের প্রতি ফরয করেনি? কাজেই প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তাদের অর্থনৈতিক দুর্গতি ইসলামী বিধি নিষেধের অনুসৃতির ফল নয়; বরং এ হচ্ছে তা থেকে মুক্ত হবারই পরিণতি। বাকি থাকে শুধু সুদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা; কিন্তু তা-ই বা কোথায় কায়েম রয়েছে? শতকরা অন্তত ৯৫ ভাগ মুসলমান কোনো যথার্থ অক্ষমতা ছাড়াই সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। একেই কি বলে ইসলামী আইনের বিধি-নিষেধ? বিত্তবান মুসলমানদেরও এক বিরাট অংশ কোনো না কোনো রূপে সুদ গ্রহণ করছে। যথারীতি মহাজনী কারবার না করলেই বা কি আসে যায়! ব্যাংক, বীমা, সরকারী বন্ডস, প্রভিডেন্ড ফান্ডস্ ইত্যাদির সুদতো বেশিরভাগ বিত্তবান মুসলমানই খাচ্ছে! তাহলে যে সুদ সংক্রান্ত বিধি নিষেধকে তারা নিজেদের আর্থিক দুরবস্থার জন্যে দায়ী করে, তার অস্তিত্ব রইলো কোথায়?

অধিকতর বিস্ময় ও কৌতুকের ব্যাপার এই যে, মুসলমানদের সম্ভ্রম ও জাতীয় শক্তিকে ঐশ্বর্যের ওপর আর ঐশ্বর্যকে সুদের বৈধতার ওপর নির্ভরশীল বলে যুক্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে! মনে হয় সম্ভ্রম ও শক্তি জিনিসটা আসলে কিসের ওপর নির্ভরশীল এ খবরটাই ঐ যুক্তিবাদীদের জানা নেই। বস্তুত নিছক ধনমাল কখনো কোনো জাতিকে সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী বানাতে পারেনি। মুসলমানদের প্রতিটি ব্যক্তি যদি লাখপতি বা কোটিপতিও বনে যায়, আর তাদের মধ্যে চারিত্রিক শক্তি না থাকে, তাহলে বিশ্বাস করুন দুনিয়ার কেউ তাদের সম্ভ্রম করবেনা। পক্ষান্তরে তাদের ভেতর যদি প্রকৃত ইসলামী চরিত্র বর্তমান থাকে, তারা সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বাসপরায়ণ হয়, প্রলোভন ও ভয়ভীতি থেকে মুক্ত হয়, নীতির প্রশ্নে অটল এবং লেনদেনে পরিচ্ছন্ন হয়, সত্যকে সত্য এবং কর্তব্যকে কর্তব্য জ্ঞান করে, হারাম ও হালালের পার্থক্যের প্রতি হামেশা লক্ষ্য রাখে আর তাদের অন্তর্নিহিত নৈতিক শক্তির কারণে কোনো ক্ষতির ভয় ও লাভের হাতছানি তাদেরকে ন্যায়নীতি থেকে বিচ্যুত করতে এবং কোনো মূল্যের বিনিময়েই তাদের ঈমানকে খড়িদ করেত না পারে – তাহলে দুনিয়ায় তাদের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হবে। লোকদের হৃদয়ে তাদের সম্ভ্রম আসন পেতে বসবে। তাদের কথা লাখপতির গোটা সম্পদের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। তারা পর্ণকুটিরে থেকে তালি দেয়া কাপড় পরিধান করলেও সম্পদের স্তুপের ওপর অবস্থানকারীর চাইতে বেশি সম্ভ্রমের দৃষ্টিতেই তাদের দেখা হবে। তারা জাতি হিসেবে এতোখানি শক্তি অর্জন করবে যে, তাকে কখনো পরাজিত করা যাবেনা। সাহাবা রা.-দের আমলের মুসলমানরা কি রকম দারিদ্রক্লিষ্ট ছিলো! কম্বল, তাঁবু ও পর্ণকূটীরে তাঁরা বাস করতেন। নাগরিক সভ্যতার জাঁকজমকের সাথে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁদের বেশভূষা,

খাদ্যবস্তু, অস্ত্রপাতি কোনোটাই যথোপযোগী ছিলোনা – তাঁদের কাছে জমকালো ধরনের সওয়ারীও ছিলোনা। কিন্তু তাঁদের যে সুনাম ও সুখ্যাতি ছিলো, তা উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের মুসলমানরা না অর্জন করতে পেরেছে, আর না পেরেছে পরবর্তী কোনো কালের মুসলমানরা। তাঁদের ধন দৌলত ছিলো না, কিন্তু চারিত্রিক শক্তি ছিলো – এই শক্তিই তাঁদের সম্ভ্রম ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি দৃঢ়মূল করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালের লোকেরা ধন দৌলত সঞ্চয় করে এবং রাষ্ট্রশক্তি লাভ করে জমকালো শহর ও সভ্যতা গড়ে তোলে; কিন্তু এর কোনোটাই তাদের চারিত্রিক দুর্বলতার বিকল্প পেশ করতে পারেনি।

মুসলমানরা ইসলামী ইতিহাসের শিক্ষা তো বিস্মৃতই হয়েছে; কিন্তু দুনিয়ার যে কোনো জাতির ইতিহাসের প্রতি তারা তাকিয়ে দেখতে পারে। দুনিয়ার কোনো জাতি শুধু সুবিধাবাদ, আরামপ্রিয়তা ও স্বার্থ পূজার দ্বারা শক্তি ও সম্ভ্রম অর্জন করেছে – এমন একটি দৃষ্টান্তও তারা খুঁজে পাবেনা। কোনো নীতি ও নিয়মানুবর্তিতার অনুবর্তী নয়, কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে কষ্টক্লেশ, শ্রম, মেহনত ও কঠোরতা বরদাশ্‌ত করতে সক্ষম নয়, নীতি ও লক্ষ্যের জন্যে প্রবৃত্তির দাবি এবং আপন সত্তাকে উৎসর্গ করে দেবার মতো প্রেরণা পোষণ করেনা – এমন কোনো সম্ভ্রান্ত ও সমুন্নত জাতির অস্তিত্ব তারা খুঁজে পাবেনা। এই শৃংখলা, নীতিনিষ্ঠা এবং বৃহৎ লক্ষ্যের জন্যে আরাম আয়েশ ও স্বার্থ ত্যাগের কোনো না কোনো রূপ তারা সর্বত্রই দেখতে পাবে। ইসলামে এর রূপ এক ধরনের। এখান থেকে বেরিয়ে অন্য কোনো সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও, ভিন্ন কোনো রূপে তাদের একটা না একটা বিধি বিধানের অনুবর্তী হতে হবেই। কোনো না কোনো নিয়মানুবর্তিতার বাঁধনকে স্বীকার করতে হবেই। কতিপয় নির্দিষ্ট নীতির শিকলে তারা অবশ্যই বাঁধা পড়বে এবং কোনো নীতি ও লক্ষ্যের খাতিরে তাদের কাছে কুরবানী দাবি করা হবেই। যদি তাদের মধ্যে এর আগ্রহ বর্তমান না থাকে, তারা শুধু কোমলতা ও মাধুর্যেরই পিয়াসী হয় এবং কোনো কঠোরতা ও তিক্ততা স্বীকার করার মতো শক্তি তাদের মধ্যে না থাকে তাহলে ইসলামের বিধি বন্ধন থেকে বেরিয়ে তারা যেখানে খুশি গিয়ে দেখতে পারে – কোথাও তারা সম্ভ্রমের আসন পাবেনা। কোথাও থেকে, তারা শক্তি অর্জন করতে পারবেনা। এই সাধারণ নিয়মটিকে ইসলাম মাত্র চারটি শব্দে বিবৃত করছে। আর পৃথিবীর গোটা ইতিহাসই এই শব্দ চারটির সত্যতার সাক্ষ্য বহন করেছে ঃ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (নিশ্চয়ই কঠোরতার সঙ্গে রয়েছে কোমলতা)। এই কোমলতা (يسر) হামেশাই কঠোরতার (عسر) সাথে সংশ্লিষ্ট। যার ভেতরে কঠোরতাকে সহ্য করার মতো শক্তি নেই, সে কখনো কোমলতার গুণে বিভূষিত হতে পারেনা।

❖ ❖ ❖

১৮

ব্যাধি ও তার প্রতিকার*

ইসলাম নিছক একটি বিশ্বাস মাত্র নয়, কিংবা কতিপয় 'ধর্মীয়' অনুষ্ঠান এবং রসমেরও সমষ্টি নয়, বরং তা হচ্ছে মানুষের গোটা জীবনের জন্যে এক বিস্তৃত পরিকল্পনা (Scheme)। এতে ধর্ম বিশ্বাস, ইবাদত বন্দেগী আর বাস্তব জীবনের নিয়ম নীতি আলাদা আলাদা নয়; বরং এ সবকিছু মিলে এমন এক অখন্ড ও অবিভাজ্য সমষ্টি গড়ে তোলে যার অংশগুলোর পারস্পারিক সম্পর্ক হচ্ছে ঠিক তেমনি, একটি জীবন্ত দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর সম্পর্ক যেমন হয়ে থাকে।

আপনি কোনো জীবন্ত মানুষের হাত পা কেটে দিন। চোখ, কান ও জিহ্বা বিচ্ছিন্ন করে ফেলুন। পাকস্থলী ও কলিজা বের করে ফেলুন। ফুসফুস ও মূত্রাশয় পৃথক করে দিন। মগজেরও কম বেশি কিছু অংশ বের করে দিন এবং তার বুকের মধ্যে নিছক একটি হৃদয় রেখে দিন। এ জিনিসটি কি দেহের বাকি অংশকে জিন্দা রাখতে পারবে? আর জিন্দা রাখলেও তা কি কোনো কাজের উপযোগী থাকবে?

ইসলামের অবস্থাও ঠিক এমনি। প্রত্যয় বা বিশ্বাস হচ্ছে তার অন্তকরণ। আর ঐ প্রত্যয় থেকে উদ্ভুত মনোভঙ্গি, জীবনাদর্শ, জীবন লক্ষ্য ও মূল্যমান হচ্ছে তার মস্তিষ্ক। ইবাদত বন্দেগী হচ্ছে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এগুলোর উপর নির্ভর করেই সে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আপন কর্তব্যকর্ম পালন করে যায়। অর্থনীতি, সামাজিকতা, রাষ্ট্রনীতি ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ইসলাম যেসব মূলনীতি দিয়েছে, তা হচ্ছে তার পাকস্থলী, কলিজা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের শামিল। তার সুস্থ ও স্বচ্ছ চোখ এবং নির্দোষ কানের প্রয়োজন, যাতে করে সে যুগের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে মগজকে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারে এবং মগজ সেগুলো সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তার নিজের আয়ত্তাধীন ভাষার প্রয়োজন, যাতে করে সে সুষ্ঠুভাবে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশ করতে পারে। তার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার প্রয়োজন। তার পবিত্র ও বিশুদ্ধ খাদ্যের প্রয়োজন, যা তার পাকস্থলীর সাথে সঙ্গতি রেখে উত্তম রক্ত উৎপাদন করতে সক্ষম।

এই গোটা ব্যবস্থাপনায় অন্তকরণটা (অর্থাৎ প্রত্যয়) যদিও গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তার গুরুত্বটা এ জন্যেই যে, সে তামাম অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জীবনীশক্তি দান করে। যখন বেশির ভাগ অঙ্গ প্রত্যঙ্গই কেটে যায়, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, অথবা বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন একা অন্তকরণ বাকী সামান্য পঙ্গু ও রুগ্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের

---

* প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। – সম্পাদক

সাথে কিভাবে জিন্দা থাকতে পারে? আর জিন্দা থাকলেও সে জীবনের কী মূল্য হতে পারে?

এবার এই ভারতবর্ষে (বাংলা পাক ভারত)[১] ইসলামের কি দশা পরিলক্ষিত হচ্ছে, একবার ভেবে দেখুন। এখানে ইসলামী আইন কানুন প্রায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। নৈতিকতা, সামাজিকতা, অর্থনীতি এবং জীবনের অন্যান্য সব ব্যাপারে ইসলামী নীতি শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি কার্যকরী নয়। অনিসলামী শিক্ষা, ট্রেনিং ও পরিবেশ লোকদের মন মগজকে কোথাও সম্পূর্ণ এবং কোথাও একটু কমবেশি অমুসলিম বানিয়ে দিয়েছে। তাদের চোখ দেখতে পায়, কিন্তু দৃষ্টিকোণ বদলে গিয়েছে। কান শুনতে পায় কিন্তু তার পর্দা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। মুখ থেকে কথা বেরোয়, কিন্তু বোলচালে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। চারদিকে এক বিষাক্ত পরিবেশ বিরাজ করার দরুন তার ফুসফুস নির্মল বাতাস গ্রহণ করতে পারছেনা। গোটা খাদ্য ভান্ডার বিষদুষ্ট হবার ফলে পাকস্থলী পবিত্র ও বিশুদ্ধ খাদ্য পাচ্ছেনা। ইসলামী দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে ইবাদত, তার শতকরা ৬০ ভাগই পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বাকি ৪০ ভাগই সুস্থ থাকলেও তার কোনো প্রভাবই পরিলক্ষিত নয়। কারণ অন্যান্য অঙ্গগুলোর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ জন্যেই তাদের মধ্যে পক্ষাঘাতের ব্যাধি ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। এমতাবস্থায় আমাদের সামনের এই জিনিসটাকে কি পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলা যায়? এর কতকগুলো অঙ্গ কেটে গিয়েছে, কতক বর্জন করা হয়েছে, কতক বর্তমান থাকলেও রুগ্ন এবং সঠিক কাজ করতে অক্ষম। এগুলোর সঙ্গে নিছক একটি অন্তকরণ বাকি রয়েছে এবং তাও পীড়িত হচ্ছে। কারণ তা ঐ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে যেমন জীবনী শক্তি দান করতো তেমনি নিজেও সেগুলো থেকে শক্তি আহরণ করতো। কাজেই মগজ, ফুসফুস, পাকস্থলী, কলিজা ইত্যাদির ক্রিয়াকর্মই যখন বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন একা অন্তকরণ কি করে সুস্থ ও সবল থাকতে পারে? তবু সেই অন্তরের মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি নিহিত রয়েছে, তার ফলে সে শুধু জীবিত নয়; বরং বাকি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকেও কোনো প্রকারে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ দেশবাসীর জীবনে নিজস্ব প্রভাব প্রতিষ্ঠার মতো শক্তি কি তার ভিতরে আছে? বরং আল্লাহ না করুন, আমি তো এ প্রশ্নই করতে চাই যে, দুর্যোগের বন্যাবেগ দিন দিন যেভাবে তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে, তার মোকাবিলায় এমনি অবস্থা নিয়ে সে কি বাকি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে অধিকতর কাটাছেঁড়া এবং নিজেকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে?

বস্তুত এরই ফলে আজ মুসলিম সমাজের يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا . (তারা দলে দলে আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রবেশ করছে) সম্পূর্ণ বিপরীত ইসলামের প্রতি বিদ্রোহ ও বিমুখিতার ব্যাধি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। সমগ্র ভারতে এবং তার আশে পাশে কোথাও ইসলামী জীবন পদ্ধতিকে তার পূর্ণ মেশিনারীসহ ক্রিয়াশীল দেখা যায়না। তাই লোকেরাও তার সৌন্দর্য ও পূর্ণত্বকে অবলোকন

---

১. মনে রাখতে হবে যে, প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে ১৯৩৭ সালে গোলামী যুগকে সামনে রেখে; কিন্তু এর বক্তব্য বর্তমান সাধীন পরিবেশেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। – সম্পাদক

এবং ফুলের সাহায্যে বৃক্ষের পরিচিতি লাভ করতে পারছেনা। তারা শুধু এই অঙ্গবিহীন ইসলামকে দেখেই ভাবছে ব্যাস, এটুকুই ইসলাম। এটুকু দেখে কেউ কেউ তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা করছে যে, আমরা 'মুসলমান নই'। অনেকে আবার মুসলমানিত্বকে অস্বীকার করেনা বটে, তবে কথাবার্তা যা বলে তাতে তাদের এবং ইসলামের প্রতি অবিশ্বাসীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুজে পাওয়া যায়না। অনেকের মন তো ফিরে গিয়েছে কিন্তু এখনো প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দেয়নি বলে মুনাফিকীর সঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে শামিল রয়েছে। অবশ্য ব্যাপক গোলযোগ শুরু হলে নিজেরাও যাতে ঝান্ডা নিয়ে দাঁড়াতে পারে, সে জন্যে গোপনে গোপনে এরা বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লোকেরা স্পষ্টভাবে না বললেও অনুচ্চস্বরে বলছে, 'নতুন জাতীয়তাবাদ ও নতুনতর সভ্যতায় বিলীন হবার জন্যে তৈরি হও। কারণ তোমরা যে মৃতদেহ নিয়ে বসে আছো, তা নিজে তো তোমাদের কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারছেই না; বরং অন্যের মধ্যে বিলীন হবার ফলে যে কল্যাণ লাভের সাম্ভবনা আছে; তার থেকেও তোমাদের সমৃদ্ধ হতে দিচ্ছেনা।' কারো কারো মতে, এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ইসলামকে খন্ড খন্ড করে ফেলা। তারা বলেন, শুধু ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ড পর্যন্তই মুসলমান থাকা উচিত। জীবনের আর বাকি অংশে অমুসলিমদের শেখানো এবং তাদের অনুসৃত কর্মসূচী আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এই লোকগুলো নিজেরা ধোকার মধ্যে রয়েছে কি অপরকে ধোকা দিতে চাচ্ছে, জানিনা। তবে এরা এই সত্যটি ভুলে গিয়েছে কিংবা ভোলাতে চাচ্ছে যে, জীবনের তাবৎ বিষয়ে অনিসলামী মর্তাদশ গ্রহণ করা এবং অনিসলামী নিয়মনীতিতে অভ্যস্ত হবার পর ধর্মীয় প্রত্যয় ও ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ড সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। কারণ প্রত্যয় ও ইবাদতগুলোই হচ্ছে আসল ভিত্তি জীবনের গোটা ইমারতকে গড়ে তুলবার জন্যেই এগুলোকে স্থাপন করা হয়েছে। এই ইমারত যদি ভিন্ন বুনিয়াদের ওপর গড়ে উঠে তো এই প্রাচীন নিদর্শনগুলোর সাথে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় আকর্ষণ কতোদিন বজায় থাকবে? যে শিশু নতুন জীবনধারায় প্রতিপালিত হয়ে যৌবনে উপনীত হবে, সে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে; কতিপয় অহেতুক বিশ্বাস ও কতিপয় নিস্ফল প্রথার শিকল কেন আমার গলায় পরিয়ে রেখেছে? যে কুরআনের সমস্ত বিধি বিধানই আজ অকেজো হয়ে গিয়েছে। তা কেন আমি পড়বো এবং কেনই বা তার প্রতি ঈমান পোষণ করবো? যে লোকটি সাড়ে তের'শ বছর আগে চলে গিয়েছেন, আজ তাঁকে কেন আমি আল্লাহ্র রসূল বলে মানবো? আমার এই জীবনেই যখন তিনি কোনো পথনির্দেশ করতে পারেননা তখন শুধু তাঁর নবুয়তের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতিতেই কি লাভ আর অস্বীকৃতিতে বা কি ক্ষতি? আমি যে জীবনধারা পালন করে চলছি, তাতে নামায পড়া বা না পড়ায়, রোযা রাখা বা না রাখায় কী পার্থক্য সূচিত হয়? কী সম্পর্ক রয়েছে এই জীবনধারা ও এই ক্রিয়াকান্ডগুলোর মধ্যে? কেন আমার জীবনে এমনি বেখাপ্পা জোড়া লাগিয়ে রাখা হবে?'

এই হচ্ছে দীন ও দুনিয়াকে বিভক্ত করার অতি স্বাভাবিক পরিণাম। এই বিভক্তি নীতিগত ও কার্যত যখন পরিপূর্ণ হবে, তখন এমনি ফলাফল প্রকাশ পাবেই।

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর যেমন অন্তকরণটা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়, তেমনি বাস্তব জীবন থেকে সম্পর্কহীন হবার পর প্রত্যয় ও ইবাদতগুলোরও কোনো গুরুত্ব বাকি থাকেনা। প্রত্যয় ও ইবাদতগুলো ইসলামী জিন্দেগীকে জীবনী শক্তি দান করে আবার ইসলামী জিন্দেগী প্রত্যয় ও ইবাদতগুলোকে শক্তি সরবরাহ করে। উপরে যেমন বলেছি, এই দুটি জিনিসের মধ্যে আসলে জীবন্ত দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় সম্পর্ক বর্তমান। এই সম্পর্ক ছিন্ন করলে উভয়েরই মৃত্যু অনিবার্য। পরন্তু অনিসলামী জীবনধারার সাথে ইসলামী প্রত্যয় ও ইবাদতকে জুড়ে দিলে তা হবে গরিলার দেহে মানুষের মগজ বা হাত পা জুড়ে দেয়ার মতোই উদ্ভট ব্যাপার।

একথা কেউ মনে করবেন না যে, আধুনিক শিক্ষিতদের একটি ক্ষুদ্র দলই শুধু ইসলামের বর্তমান দুরবস্থায় প্রভাবিত হচ্ছে, তা মোটেই নয়। আজকে যারা সাচ্চাদিল মুসলমান, যাদের হৃদয়ে এই ধর্মের প্রতি ভালবাসা ও সম্ভ্রমবোধ বর্তমান নতুন প্রাচীন নির্বিশেষে সবাই কম বেশী এই অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে। ইসলামী জীবনধারার বিপর্যয় হচ্ছে এক সাধারণ দুর্যোগ – এর স্বাভাবিক পরিণাম থেকে কোনো মুসলমানই নিরাপদ নয়, আর নিরাপদ থাকা সম্ভবও নয়। আপন আপন যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই আমরা তার থেকে অংশ লাভ করছি। এতে আমাদের আলিম ও পীর সাহেবান স্কুল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের মতোই সমান অংশীদার।

কিন্তু সবচাইতে বেশি দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে ১৬ লক্ষ বর্গ মাইলব্যাপী এ বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাসকারী আমাদের কোটি কোটি জনসাধারণ। এদের কাছে শুধু ইসলামের নামটাই বাকী রয়ে গেছে এবং এর প্রতি তারা অসাধারণ ভালবাসাও পোষণ করে। কিন্তু যে বস্তুটির জন্যে তারা এভাবে প্রাণপাত করছে, জ্ঞানগত দিক থেকে সে সম্পর্কে তারা মোটেই অবহিত নয় বলা চলে। আর বাস্তব ক্ষেত্রেও তাদেরকে অনিসলামী প্রভাব থেকে রক্ষা করার উপযোগী কোনো জীবন পদ্ধতি বর্তমান নেই। তাদের এই অজ্ঞতার সুযোগে যে কোনো বিভ্রান্তকারী শক্তি তাদের ঈমান আকীদা ও বাস্তব জীবনকে ইসলামের সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তাদেরকে এইটুকু প্রবোধ দেয়াই যথেষ্ট যে, তাদের সামনে পেশকৃত এই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতাই হচ্ছে প্রকৃত সুপথ কিংবা অন্তত এটি ইসলামের বিরোধী কিছু নয়। তারপর কাদিয়ানীবাদ, কম্যুনিজম, ফ্যাসিবাদ ইত্যাদি যে কোনো পথে খুশী তাদেরকে ঠেলে নেয়া যেতে পারে। কোনন তাদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ও ভয়াবহ দুর্গতি থেকে যে সমস্যাগুলোর উদ্ভব হয়েছে, বর্তমান বিশৃংখল ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে সেগুলোকে ইসলামী নীতির আলোকে সমাধান করবার কোনো প্রচেষ্টাই হচ্ছেনা।

আজকের কম্যুনিজমের মোকাবিলায় ইসলামের অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক আদর্শ নিয়ে সামনে এগোবার এবং সাধারণ লোকদের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর সমাধান পেশ করবার মতো কোনো সংঘবদ্ধ দল মুসলমানদের মধ্যে নেই। এর ফলে এই কোটি কোটি দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মুসলিম জনতা

কম্যুনিস্ট প্রচারকদের পক্ষে সহজ লভ্য শিকারে পরিণত হয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যারা একটু মাত্রাতিরিক্ত সাহসী ও ক্ষমতালিপ্সু, তারা রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করার জন্যে হামেশাই নতুন নতুন ফন্দি ফিকির তালাশ করে থাকে। রুশ বিপ্লবের পর এই শ্রেণীর লোকেরা একটি নতুন কৌশলের সন্ধান পেয়েছে। আর তা হলো কিষাণ মজুরদের দরদী সেজে গরিব জন সাধারণকে নিজেদের হাতের মঠোয় পুরে নেয়া। তাদের ভেতর স্বর্থপরতা, লালসা ও প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্জ্বলিত করা। তাদেরকে সঙ্গত অধিকারের চাইতে বেশি সম্পদ দেবার প্রলোভন দেখানো। বিত্তবান সম্প্রদায়ের সঙ্গত সম্পদ পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া। এইভাবে দেশের অধিকাংশ লোককে আপন মুঠোয় পুরে এরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সম্রাট, ডিরেক্টর ও ক্রোড়পতিদের হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে কেড়ে নিতে চায়। এরা অমুসলিম জনগণের চাইতে মুসলিম জনগণ সম্পর্কে বেশি আশাবাদী। কেননা আর্থিক দিক থেকে মুসলমানরাই বেশি দুর্দশাগ্রস্ত! এরা তাদের হৃদয় জয় করার জন্যে পেটের দিক থেকে পথ তৈরি করছে। কারণ ক্ষুধার্ত মানুষের গোটা দেহের মধ্যে এটি হচ্ছে সবচাইতে নাজুক অংশ! এরা তাদেরকে বলে; 'এসো, ধনী ও দরিদ্র্যের বৈষম্য মুছে ফেলে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আনবার পথ তোমাদের বাতলে দেই।' একথা শুনে বেচারা ক্ষুধার্ত মুসলমান দু'টুকরো রুটি আর এক মুঠো ভাতের আশায় এদের পেছনে ছুটে যায়। এরা তখন তাকে খোদা পরস্তির পরিবর্তে উদরপূজার ধর্ম গ্রহণের উপদেশ দেয়। তার মনে এই ভাবধারা সৃষ্টির প্রয়াস পায় যে, দীন ও ঈমান কোনো কাজের জিনিস নয়, আসল জিনিস হচ্ছে উদরান্ন। যে পন্থায় সেটি সংস্থান করা যায়, তাই হচ্ছে তার ধর্ম এবং তাতেই নিহিত রয়েছে তার মুক্তি ও কল্যাণ ঃ

> নি:স্ব, দরিদ্র ও গোলামদের কোনো ধর্ম বা তমদ্দুন নেই। তাদের সবচাইতে বড় ধর্ম হচ্ছে এক টুকরো রুটি। তাদের সবচাইতে বড় তমদ্দুন হচ্ছে এক প্রস্থ পুরনো কাপড়। তার সবচাইতে বড় ঈমান হচ্ছে দারিদ্র ও লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি লাভ। কারণ এই রুটি ও কাপড়ের জন্যে সে চুরি করতে বাধ্য হয়। আজকে দারিদ্র ও গোলামির দুনিয়ায় তার আর কোনো ধর্ম নেই।"

এই হচ্ছে সাম্যবাদী ধর্মের (Communism) প্রথম পাঠ। এই পাঠ দানকালে বেচারা অজ্ঞ ও দরিদ্র মুসলমানকে এই বলে ভুয়া প্রবোধও দেয়া হয় যে, আমরা তোমাদের ধর্মের প্রতি কোনো হস্তক্ষেপ করিনা। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো ঃ

> এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের ভয়ের কি কারণ রয়েছে? এগুলোর সাথে তার সম্পর্কই বা কি? ধর্ম তো তার নিজস্ব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বলে হামেশাই জীবন্ত ও দীপ্তিমান রয়েছে।[১]

বিশ বছরে রাশিয়ার মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের ওপর কম্যুনিজম যে প্রভাব বিস্তার করেছে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রই তা জানেন। উপমহাদেশীয় মুসলমানদের

---

১. এ অংশ দু'টি জনৈক মুসলমান লেখকের একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রবন্ধটি এক বহুল প্রচারিত মুসলিম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো।

সামনেও এমন দুর্যোগময় ভবিষ্যৎ প্রচণ্ড হুমকির সাথে এগিয়ে আসছে। উদরাগ্নি তাদের ঈমানের সম্পদকে ভস্ম করে দেয়ার জন্যে লেলিহান শিখা বিস্তার করেছে। এখনো তার ছিদ্রপথ ক্ষুদ্র এবং একটিমাত্র সেলাই দ্বারাই বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু গাফলতির মধ্যে আর কয়েকটি বছর এমনি অতিক্রান্ত হলে তা এতো বড় বন্যাবেগ নিয়ে আসবে যে, তার মোকাবিলায় প্রকাণ্ড বাঁধও খড় কুটোর ন্যায় ভেসে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে শুধু খ্রীস্টান মিশনারীর কায়দায় ইসলামের তবলীগ করে বেড়ানো একেবারেই অর্থহীন। আকীদা বিশ্বাসের পরিশুদ্ধির জন্যে একটি নয়; বরং লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা প্রকাশ করলেও এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেনা। নিছক মুখে মুখে বা লেখনীর সাহায্যে ইসলামের মাহাত্ম কীর্তন করেই বা কি লাভ? আজকে তো প্রয়োজন ইসলামের সৌন্দর্যকে বাস্তব দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করে দেখানো। ইসলামী আদর্শের ভেতরই আমাদের জীবন সমস্যার সমাধান নিহিত কেবল এটুকু কথা বলে দিলেই আমাদের সমস্যাবলীর আপনা আপনি সমাধান হয়ে যাবেনা। ইসলামের মধ্যে যা কিছু শক্তি ও সৌন্দর্য রয়েছে, তা কার্যকরী করা প্রয়োজন। এ দুনিয়াটা সংঘাত ও সংগ্রামের দুনিয়া। নিছক বুলির সাহায্যে এর গতি বদলানো যেতে পারেনা। একে বদলাতে হলে এক বিপ্লবাত্মক জিহাদের প্রয়োজন। কম্যুনিস্টরা তাদের ভ্রান্ত আদর্শ নিয়ে যদি অর্ধ শতকের মধ্যে দুনিয়ার এক বিশাল অংশে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি কায়েম করতে পারে; ফ্যাসিস্টরা যদি একটি অসামঞ্জস পদ্ধতি নিয়ে দুনিয়ার বুকে নিজেদের খ্যাতি-যশ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, গান্ধীর অহিংস নীতি একটি অস্বাভাবিক বস্তু হওয়া সত্ত্বেও নিছক চেষ্টা সাধনার বলে প্রকাশ লাভ করতে পারে, তাহলে সততা ও সুবিচারের সনাতন আদর্শবাহী মুসলমানদের পক্ষে দুনিয়ায় আবার প্রতিষ্ঠা লাভ না করার কোনোই কারণ নেই। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা শুধু ওয়ায নসীহত আর সদুপদেশ দ্বারা লাভ করা যাবেনা। এর জন্যে বাস্তব প্রয়াস প্রচেষ্টা আবশ্যক এবং আল্লাহর মনোনীত পন্থায় কাজ করা প্রয়োজন।

'বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম' একটি অস্পষ্ট কথা। বাস্তবক্ষেত্রে এর অনেক প্রক্রিয়া রয়েছে এবং আরো অনেক প্রক্রিয়া হতে পারে। তবে যে ধরনের বিপ্লব সৃষ্টিই কাম্য হোক, তার জন্যে বিপ্লবের প্রকৃতির সাথে সুসামঞ্জস্য প্রক্রিয়াই অবলম্বন করতে হবে। আমরা যে বিপ্লব সৃষ্টি করতে চাই, তার জন্যে নতুন কোনো প্রক্রিয়া খোঁজার প্রয়োজন নেই। কারণ এর আগেও দুনিয়ায় এ বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে। যে মহাপুরুষ এই বিপ্লব প্রথম সৃষ্টি করেন, এর প্রকৃতি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্যকরূপে অবহিত। তাঁর অনুসৃত পথে আজো এ বিপ্লব সৃষ্টি করা যেতে পারে। সে মহাপুরুষের জীবন চরিত্র একটি বিস্ময়কর বস্তু। কিন্তু অন্যদিক থেকে তা একটি নির্ভুল আদর্শও বটে। অমন উন্নত চরিত্র পরহেযগারী, বিচার বুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণতা, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও মহাপরুষোচিত গুণাবলীর বিপুল দৃষ্টান্ত আজ কে পেশ করতে পারে? কার পক্ষেই বা অতো উন্নতমানের বিপ্লব সৃষ্টি সম্ভবপর? এদিক থেকে তাঁর জীবন চরিত্র বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর বস্তু এবং

কিয়ামত পর্যন্ত এ বিস্ময় মানুষকে মুগ্ধ করবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সে মহাপুরুষ যে আদর্শ রেখে গিয়েছেন, তার মেজাজ ও প্রকৃতি সাড়ে তের'শ বছর পূর্বেকারো মতোই বিপ্লবাত্মক। সে আদর্শ যতো বেশি অনুসরণ করা হবে এবং যতো বেশি তার অনুকরণ করা হবে, ততো বেশি বিপ্লবাত্মক ফলাফলই প্রতিভাত হবে। পরন্তু যে বিপ্লব মূল আদর্শের বলে সাধিত হয়েছিলো এ ফলাফল ততো বেশি তার ঘনিষ্ট হয়ে উঠবে। এদিক থেকে তা একটি নির্ভুল আদর্শ, সন্দেহ নেই। এ আদর্শ কিয়ামত অবধি মানুষের পক্ষে অনুকরণযোগ্য। এই মহান আদর্শ অনুসরণ করে বিংশ শতকে কি চতুর্বিংশ শতকে, এ উপমহাদেশে কি আমেরিকায় কি রাশিয়ায় – যে কোনো দেশে, যে কোনো সময় এ ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি করা যেতে পারে।

রসূলে করীম স. যে প্রক্রিয়ায় সাড়ে তের'শ বছর পূর্বে দুনিয়ায় বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন, তা সবিস্তারে বিবৃত করার অবকাশ এখানে নেই। এখানে শুধু এটুকু আভাস দেয়াই আমার উদ্দেশ্য যে, দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠান[১]-এর পরিকল্পনা সেই মহান আদর্শের গভীরতর অধ্যয়ন থেকেই উদ্ভূত।

মহানবী স. যখন আভির্ভূত হন, তখন দুনিয়ায় একটি লোকও মুসলমান ছিলোনা। এমনি অবস্থায় তিনি দুনিয়ার সামনে তাঁর দাওয়াত পেশ করেন। ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্নভাবে দু'একজন করে লোক মুসলমান হতে লাগলো। এই লোকগুলো পাহাড়ের চাইতেও সুদৃঢ় ঈমান পোষণ করতেন। এরাঁ ইসলামের জন্যে এমনি উৎসর্গপ্রাণ ছিলেন যে, দুনিয়ায় তার কোনো নজীর নেই। কিন্তু এরাঁ বিচ্ছিন্নভাবে কাফিরদের মধ্যে বেষ্টিত থাকার ফলে স্বভাবতই অসহায় ও দুর্বল ছিলেন। এই কারণেই আপন পরিবেশের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করে তাদের শক্তি শুধু ক্ষয়ই হচ্ছিলো; কিন্তু যে অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে তারা এবং তাদের মহান নেতা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তার কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারছিলেননা। এভাবেই রসূলে করীম সা. ১৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালালেন। এ সময়ে তিনি উৎসর্গপ্রাণ ঈমানদার লোকদের ক্ষুদ্র দলমাত্র সংগঠিত করতে সমর্থ হলেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিলেন। আর তাহলো সেই উৎসর্গপ্রাণ লোকদেরকে নিয়ে কুফরী পরিবেশ ত্যাগ করা, তাদেরকে এক জায়গায় জমায়েত করে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করা, ইসলামী জীবনধারায় গোটা কর্মসূচী কার্যকরী করার উপযোগী একটি গৃহনির্মাণ করা, মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ও সামগ্রিক শক্তি পয়দা করার জন্যে একটি কেন্দ্র তৈরি করা, তামাম বিদ্যুৎ-শক্তিকে এক জায়গায় জমায়েত করে একটি সুনিয়ন্ত্রিত পন্থায় বিকীর্ণ করা ও দুনিয়ার প্রতিটি ভূ-খন্ডকে তার দ্বারা উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করে তোলার জন্যে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Power House) নির্মাণ করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'মদীনায়ে তাইয়্যেবা'য় হিজরাত করলেন। যেসব মুসলমান আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ছিলেন, তাদের সবাইকে এই কেন্দ্রস্থলে জমায়েত হবার নির্দেশ দেয়া হলো। এখানে বাস্তব অনুশীলনের

---

১. এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতপর ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে 'জামায়াতে ইসলামী' গঠিত হলে তার সঙ্গেই এই প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে দেয়া হয়।

মাধ্যমে ইসলামকে কার্যকরি করে দেখানো হলো। এই পুত-পবিত্র আবহাওয়ায় গোটা দলকে ইসলামী জীবনধারা সম্পর্কে এমনি ট্রেনিং দেয়া হলো যে, তার প্রতিটি ব্যক্তিই এক চলমান ইসলামে পরিণত হলো। ইসলাম কি জিনিস আর কেনই বা তা এসেছে, যে কোনো লোককে দেখেই তা উপলব্ধি করা যেতো। তাঁদেরকে আল্লাহর রঙে এমনি প্রগাঢ়ভাবে রাঙিয়ে তোলা হলো ঃ

(صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً)

যেনো তাঁরা অন্যের রং কবুল না করে নিজেদের রঙেই অপরকে রাঙিয়ে তোলে। তাঁদের মধ্যে এমনি চরিত্রবল সৃষ্টি করা হলো, যেনো তারা অন্যের দ্বারা কখনো প্রভাবান্বিত না হন; বরং অপর কেউ তাদের সংস্পর্শে এলে প্রভাবিত হয়ে যায়। তাঁদের শিরা উপশিরায় ইসলামী জীবন ধারার লক্ষ্যকে এমনিভাবে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো, যেনো জীবনের প্রতিটি কাজেই তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং বাকি সব দুনিয়াবী লক্ষ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরুত্ব পায়। তাঁদেরকে শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের সাহায্যে এমনি যোগ্য করে তোলা হলো, যেনো কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত জীবন ধারাকে যে কোনো মূল্যে কার্যকরী করেন এবং সর্ববিধ বিকৃত অবস্থাকে চুরমার করে তারই আলোকে পুর্ণগঠিত করেন।

এই বিস্ময়কর সংগঠনের প্রতিটি অংশই গভীরভাবে অধ্যয়ন ও প্রণিধানযোগ্য। এই সংগঠনের গোটা কার্যক্রমকে চারটি বড় বড় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিলো ঃ

১. দীন ইসলামে বুৎপত্তি লাভ এবং লোকদেরকে ইসলামের বিধিব্যবস্থা উত্তমরূপে বোঝানোর উদ্দেশ্যে একদল লোক গঠন করা ঃ

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ
وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ .

২. ইসলামের আচরণ বিধিকে রূপায়িত করা এবং তার প্রচার ও প্রসারকাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার জন্যে কিছু লোককে তৈরি করতে হবে। এই লোকগুলোকে অর্থোপার্জনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া সংগঠনের কর্তব্য। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা নিজেরা কোনো পরোয়া করবেনা। অর্থ সংস্থানের কোনো ব্যবস্থা হোক বা না হোক, নিজেদের ঐকান্তিক আগ্রহের বশবর্তী হয়ে এবং সর্ববিধ দুঃখ ক্লেশ অগ্রাহ্য করেই তারা তাদের জীবনের পরম লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার কাজে লিপ্ত থাকবে ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ . (ال عمران : ١٠٤)

৩. দলের প্রতিটি ব্যক্তি যাতে আল্লাহ্‌র কলেমা প্রচারকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করে, তাদের মধ্যে এমনি ভাবধারা উজ্জীবিত করা হবে। তারা দুনিয়ার কাজ কারবার চালাতে থাকবে বটে, কিন্তু প্রত্যেক কাজেই এই লক্ষ্য তাদের

সামনে থাকবে। ব্যবসায়ী তার ব্যবসা বাণিজ্য, কিষাণ তার কৃষিকাজে, শিল্পপতি তার শিল্পকর্মে, চাকুরে তার চাকরিতে এই লক্ষ্য কখনো বিস্মৃত হবেনা। তারা হামেশাই মনে রাখবে যে, এই কাজগুলো হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্যে আর বেঁচে থাকাটা এই কাজের জন্যে। তারা জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রেই কাজ করুক না কেন, নিঁজেদের কথায় ও কাজে, চরিত্র ও ব্যবহারে ইসলামের নীতি ও আদর্শ পালন করবে – কোথাও দুনিয়ার স্বার্থ ও ইসলামী আদর্শের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে স্বার্থের মাথায় পদাঘাত হানবে, কিন্তু নীতিচ্যুত হয়ে ইসলামের অমর্যাদা করবেনা। পরন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন থেকে যতোটা সময় ও ধনমাল তারা বাঁচাতে পারবে, তাকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করবে এবং এই কাজের জন্যে যাঁরা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করছেন, তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করবে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ . (ال عمران : ١١٠)

৪. বাইরের লোকদেরকে দারুল ইসলামে আসবার এবং তাদেরকে কাল্লামুল্লাহর বাস্তব জীবনধারাও ইসলামী পরিবেশে কুরআনকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারবে এবং অপেক্ষাকৃত গভীর প্রভাব নিয়ে ফিরে যেতে পারবে ঃ

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهُ . (التوبة : ٦)

এমনিভাবে মাত্র আট বছরের স্বল্প সময়ে দুনিয়ার সবচাইতে বড় দিশারী ও পথিকৃৎ মদীনার বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Power House) এক প্রচন্ড শক্তির সঞ্চার করলো, সে শক্তি দেখতে না দেখতে গোটা আরব ভূমিকে আলোকোজ্জ্বল করে দিলো। অতপর সে আলোকরশ্মি আরব থেকে বেরিয়ে দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এমনকি দীর্ঘ সাড়ে তের'শ বছর অতিক্রান্ত হবার পর আজো সে বিদ্যুৎ কেন্দ্র শক্তি সম্পদে পরিপূর্ণ।

খিলাফতে রাশেদার পরই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নানারূপ বিশৃংখলার সৃষ্টি হলে আমাদের সূফী সম্প্রদায়ও এই প্রক্রিয়ার অনুকরণে বিভিন্ন জায়গায় খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ খানকাহ কথাটির এমনি অর্থ বিকৃতি ঘটেছে যে, শব্দটি শোনামাত্রই লোকদের মনে আলো হাওয়া বর্জিত এক বিদঘুটে জায়গার চিত্রই ভেসে ওঠে। কিন্তু আসলে এই খানকাহ ছিলো মদীনায় বিশ্বনবী স. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদর্শেরই একটি অনুকরণমাত্র। যেসব লোকের মধ্যে কিছুটা প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যেতো, শ্রদ্ধেয় সূফী সম্প্রদায় তাদেরকে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে কিছুদিনের জন্যে খানকায় রেখে দিতেন এবং মহানবী স.ও সাহাবায়ে কিরামের অনুকরণে সেখানে তাদেরকে উন্নতমানের ট্রেনিং দান করতেন।

আজকে যাঁরা ইসলামী ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি করতে চান, তাদেরও এমনি প্রক্রিয়া অবলম্বন করা উচিত। যদি এ উপমহাদেশের বাইরে কোথাও মদীনার ন্যায় 'দারুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠার উপযোগী স্বাধীন পরিবেশ না পাওয়া যায়, তাহলে অন্তত এদেশেই এমনি ট্রেনিংকেন্দ্র স্থাপন করা উচিত যেখানে খালেস ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। যেখানে ইসলামী চরিত্র ও সামাজিকতা প্রতিফলিত হবে, মুসলমানের ন্যায় বাস্তব জীবনধারা গড়ে উঠবে এবং চারদিকে ইসলামী ভাবধারা ও আকৃতি সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। যেখানে শুধু আল্লাহ ও রসূলের অনুমতি বা নির্দেশই কোনো জিনিসকে অভ্রান্ত ঘোষণার পক্ষে যথেষ্ট হবে এবং আল্লাহ ও রসূলের বারণ বা অপসন্দই কোনো জিনিসকে ভ্রান্ত বিবেচনার জন্যে একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে স্বীকৃত হবে। যেখানে এই সর্বগ্রাসী অবাধ্যতা ও বিদ্রোহাত্মক পরিবেশ, এ অনিসলামী পারিপার্শ্বিকতার কোনো অস্তিত্ব থাকবেনা; যেখানে অন্তত ইসলামী ভাবধারার অনুকূল বহিপ্রভাবকে গ্রহণ করবার এবং প্রতিকূল প্রভাব থেকে নিজেদের জীবনধারা ও মন মগজকে রক্ষা করার মতো ক্ষমতা আমাদের থাকবে। যেখানে আমরা মুসলমানের মতো ভাবা, মুসলমানী অর্ন্তদৃষ্টি পয়দা করা এবং দারুল কুফরের বিষাক্ত আবহাওয়ায় বিলুপ্তপ্রায় গুণরাজিকে বিকাশ দান করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবো। সর্বোপরি, অনিসলামী পরিবেশে ভূমিষ্ঠ ও লালিত হবার ফলে আমাদের ধ্যান ধারণা ও ক্রিয়াকর্মে অনুপ্রবিষ্ট নোংরামী ও মলিনতা যা কখনো কখনো আমাদের অনুভূত পর্যন্ত হয়না, আর অনুভূত হলেও শক্তি এমনি প্রচন্ড মূর্তি নিয়ে দাড়ায় যে, শত চেষ্টা করেও আমরা তার থেকে আত্মরক্ষা করতে পারিনা - যেখানে গিয়ে আমরা নিজেদের জীবনকে পবিত্র করতে পারবো। এই ধরনের ট্রেনিং কেন্দ্রে শুধু সাচ্চা দিলে ইসলামের খেদমত করতে ইচ্ছুক লোকদেরই জমায়েত করা হবে এবং সেখানে তাদের যথার্থ শিক্ষা ও ট্রেনিং দিয়ে এই খেদমতের জন্যে তৈরি করা হবে। সেখানে নবী করীম স.-এর অনুসৃত পরিকল্পনাই গ্রহণ করতে হবে। তেমনিভাবে গোটা কাজকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে দিতে হবে এবং প্রত্যেক বিভাগেই মনুষ্যত্বকে ইসলামিয়াতের ছাঁচে ফেলে পুর্ণগঠিত করতে হবে।

১. এর একটি বিভাগে উন্নতমানের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এদের মধ্যে যাঁরা ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী তাঁদেরকে পাশ্চাত্য ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করাতে হবে। আর যাঁরা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করেছেন তাদেরকে আরবী ভাষা ও ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। সেই সঙ্গে তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে দীন ইসলাম সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি ও বিচক্ষণতা লাভ করতে হবে। এরপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিতে হবে।

প্রত্যেক দলেই জ্ঞানের এক একটি শাখা নিয়ে তাতে ইসলামী নীতি ও মতাদর্শকে আধুনিক পদ্ধতিতে সন্নিবিষ্ট করবেন এবং জীবনের আধুনিক সমস্যাবলী উপলব্ধি করে ইসলামী নীতির আলোকে সেগুলোর সমাধান তালাশ করবেন। পরন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে যে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি অনুপ্রবেশ করেছে, তাকে বহিষ্কৃত করে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানকে নতুন করে বিন্যস্ত করবেন এবং নিজস্ব গবেষণা ও অনুসন্ধানের সাহায্যে ইসলামের সপক্ষে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন সৎ সাহিত্য সৃষ্টি করবেন।

২. দ্বিতীয় বিভাগে ইসলামের খেদমতের জন্যে সুযোগ্য কর্মী তৈরির চেষ্টা করতে হবে। সৎ স্বভাব, দৃঢ় চরিত্র, কৃতসংকল্প এবং আপন লক্ষ্যের খাতিরে সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, এমন লোকদেরই এতে গ্রহণ করতে হবে। এরা একটা প্রচন্ড বিপ্লবী দলের আকারে সংঘবদ্ধ হবে। এদের জীবনযাত্রা হবে সরল ও সাদাসিধে। এদের মধ্যে কষ্ট সহিষ্ণুতা ও পূর্ণ নিয়ম শৃংখলা বর্তমান থাকবে। এদের বাস্তব জীবন হবে খাঁটি মুসলমানের মতো। এই দলটি ইসলামী নীতির ভিত্তিতে একটি নয়া সমাজ ব্যবস্থা এবং একটি নতুন সভ্যতা গড়ে তুলবার প্রোগ্রাম নিয়ে অগ্রসর হবে এবং জনসাধারণের সামনে সে প্রোগ্রাম পেশ করে সর্বাধিক পরিমাণে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করবে এবং প্রচলিত জুলুমমূলক শাসন ব্যবস্থাকে সুবিচারমূলক শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার জন্যে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করবে।

৩. তৃতীয় বিভাগে এমন লোকদের গ্রহণ করতে হবে, যারা কিছুকাল ট্রেনিং কেন্দ্রে থেকে ফিরে চলে যাবে। তাদেরকে সঠিক জ্ঞান ও নৈতিক টেনিং দিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে। তারা যেখানেই বাস করুক না কেন, মুসলমান হিসেবে বাস করবে। তারা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হবার পরিবর্তে তাদের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করবে। তারা নীতিতে অটল এবং নিজস্ব মতবিশ্বাসে সুদৃঢ় হবে। তারা কখনো উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করবেনা। একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য সর্বাবস্থায়ই তাদের সামনে থাকবে। তারা হালাল পন্থায় অর্থোপার্জন করবে এবং দ্বিতীয় বিভাগে কর্মরত লোকদেরকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। এরা তাদেরকে আর্থিক সাহায্যও করবে আর তাদের বাস্তব কাজেও অংশগ্রহণ করবে। পরন্তু এরা আপন পরিবেশকে বিপ্লবী দলের পক্ষে অনুকূল করে তুলবার জন্যেও চেষ্টা করবে।

৪. চতুর্থ বিভাগটি থাকবে এমন মুসলমান ও অমুসলমানের জন্যে, যারা সাময়িকভাবে ট্রেনিং কেন্দ্রে এসে কিছু শিক্ষাগত ফায়দা হাসিল করতে কিংবা সেখানকার জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করতে ইচ্ছুক। তারা যাতে ইসলাম ও তার শিক্ষার প্রগাঢ় ছাপ নিয়ে ফিরে যেতে পারে, সেজন্যে তাদেরকে সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

এ হচ্ছে একটি মোটামুটি পরিকল্পনা। ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে আমরা যে ব্যবস্থাটিকে একটি অপরিহার্য ভূমিকা বলে মনে করি, এটি হচ্ছে তারই খসড়ামাত্র। এই ব্যবস্থাটির সাফল্য নির্ভর করে সর্বোতোভাবে এর প্রাণবস্তু ও গুণাবলীর ওপর। এই ঈপ্সিত সাফল্য লাভ করতে হলে মদীনায় নবী করীম স.-এর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার সাথে এর অধিকতরো সাদৃশ্য স্থাপন করতে হবে।

মদীনায়ে তাইয়্যেবার সঙ্গে সাদৃশ্য স্থাপনের অর্থ এই নয় যে, আমরা বহিরাকৃতিতে সাদৃশ্য স্থাপনের পক্ষপাতী এবং বর্তমান তামদ্দুনিক স্তর থেকে পিছু হটে আরবের সাড়ে তের'শ বছর পূর্বেকার তামদ্দুনিক স্তরে ফিরে যেতে আগ্রহশীল। রসূলে করীম স. ও সাহাবায়ে কিরামের আনুগত্য সম্পর্কে এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের অধিকাংশ ধার্মিক লোক এই ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ করেন। তাদের মতে, প্রাচীন বুযর্গ ও মনীষীদের ন্যায় পোষাক পরা ও খাবার খাওয়াকেই বলা হয় তাদের পায়রবী। তেমনিভাবে তাঁদের পারিবারিক রীতিনীতি, তমদ্দুন ও নাগরিকতাকে হুবহু সেকেলে (Foscilised) রূপ কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করা, নিজেদের পরিবেশের বাইরের পরিবর্তন সম্পর্কে চোখ বন্ধ করে নিজস্ব মনমগজ ও জীবনধারার চারদিকে একটি প্রাচীর তুলে নেয়া এবং তার মধ্যে কালের গতি ও যুগের পরিবর্তনকে প্রবেশ করার অনুমতি না দেয়াই হচ্ছে তাঁদের অনুগতদের কর্তব্য। বস্তুত পতন যুগের কয়েক শতক ধরে ধার্মিক মুসলমানদের মন মগজে প্রভাবশীল এই ধারণাটি ইসলামী ভাবধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ জীবিত অবস্থায়ই প্রাচীন নিদর্শন হয়ে থাকা এবং জীবনটাকে প্রাচীন তমদ্দুনের একটি ঐতিহাসিক নাটকে পরিণত করা মোটেই ইসলামের শিক্ষা নয়। সে কখনো বৈরাগ্যবাদ বা প্রতিক্রিয়াশীলতা শিক্ষা দেয়না। দুনিয়ায় এমন কোনো জাতি সৃষ্টি করা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়, যারা শুধু পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করবে; বরং সে এমন একটি জাতি সৃষ্টি করতে চায়, যে পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশকে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে সঠিক পথে চালিত করবার প্রয়াস পাবে। ইসলাম আমাদেরকে খোলস নয়, প্রাণবস্তু দান করে। সে চায়, স্থান ও কালের পরিবর্তনের ফলে কিয়ামত পর্যন্ত জীবনের যতো বিভিন্ন খোলসই সৃষ্টি হোক, আমরা যেনো তাতে এই প্রাণবস্তুই সঞ্চার করতে থাকি। মুসলমান হিসেবে এই হচ্ছে দুনিয়ায় আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদেরকে 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' (خير امت)। বানাবার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আমরা ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর লোকদের পশ্চাৎ প্রহরী (Rear Guard) হিসেবে লেগে থাকবো; বরং আমাদের কাজ হচ্ছে ইমামত ও নেতৃত্ব দান করা। আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্রনায়ক হবার জন্যে এবং আমাদের 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' হবার রহস্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে اخرجت للنّاس কথাটির ভেতরে।

রসূলে করীম স. এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের প্রকৃত আদর্শ – যা আমাদের অনুসরণ করা কর্তব্য – হচ্ছে এই যে, তারা প্রাকৃতিক বিধানকে নৈতিক বিধানের আলোকে ব্যবহার করে দুনিয়ায় খোদায়ী খিলাফতের পরিপূর্ণ হক আদায় করেছেন। তাদের আমলের যে তামদ্দুনিক ব্যবস্থা বর্তমান ছিলো, তার খোলসের ভেতর তাঁরা ইসলামী সভ্যতার প্রাণবস্তু ফুঁকে দিয়েছিলেন। তখন যেসব প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের কর্তৃত্ব ছিলো, সেগুলোকে তাঁরা এই সভ্যতার খাদেম বানিয়েছিলেন। তখনকার তমদ্দুন উন্নতি ও প্রতিপত্তির যতো উপায় উপকরণই সংগ্রহ করেছিলো সেগুলোকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে তাঁরা কাফির ও মুশরিকদের চাইতেও অগ্রবর্তী ছিলেন, যাতে করে খোদাদ্রোহীদের মোকাবিলায় খোদানুগতদের সভ্যতা অর্জন করতে পারে। আল্লাহ পাক তাঁর কিতাবে এই জিনিসটিরই শিক্ষা দিয়েছেন – أَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ তাদেরকে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো যে, আল্লাহর সৃষ্ট শক্তিগুলোকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে কাফিরদের চাইতে মুসলমানদেরই অধিকার বেশি; বরং মুসলমানরাই হচ্ছে এর আসল হকদার। কাজেই নবী করীম স, ও তাঁর সাহাবাদের সঠিক আনুগত্য হলো এই যে, তামদ্দুনিক ক্রমবিকাশ ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর আবিষ্কারের ফলে আজকে যেসব উপায় উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে প্রথম যুগের মতোই ইসলামী সভ্যতার খাদেম বানাবার চেষ্টা করতে হবে। এই উপকরণগুলোর মধ্যে কোনো নোংরামী ও অপবিত্রতা নেই, তা রয়েছে এগুলোর দ্বারা সমৃদ্ধ কুফরী সভ্যতার মধ্যে। রেডিও কোনো নাপাক জিনিস নয়; বরং নাপাক হচ্ছে সেই সভ্যতা, যা রেডিও ডিরেক্টরকে নাচ গানের ব্যবস্থাপক কিংবা মিথ্যা ও অসত্যের প্রচারকে পরিণত করেছে। বিমানপোত কোনো নাপাক বস্তু নয়; বরং নাপাক হচ্ছে সেই সভ্যতা, যা বাতাসের ফেরেশতা থেকে খোদায়ী বিধানের পরিবর্তে শয়তানি চক্রান্তানুযায়ী এর সেবা গ্রহণ করেছে। তেমনিভাবে সিনেমা বা ছায়াছবিও কোনো অপবিত্র জিনিস নয়, অপবিত্র হচ্ছে আসলে সেই সভ্যতা, যা খোদার সৃষ্টি এই শক্তিটিকে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রচারে নিয়োগ করছে।[১] আজকে নাপাক সভ্যতার বিকাশ বৃদ্ধি লাভের কারণ এই যে, আজ পর্যন্ত মানুষ যতো প্রাকৃতিক শক্তি আবিষ্কার করতে পেরেছে, তার সবগুলোকেই এর বিকাশ বৃদ্ধির জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। আজকে খোদায়ী সভ্যতার বিকাশ বৃদ্ধি লাভের জন্যে আমাদের ওপর আরোপিত কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে ঐ শক্তিগুলোকেই ব্যবহার করতে হবে। বস্তুত এ শক্তিগুলো হচ্ছে তরবারির মতো; যে ব্যক্তি তাকে ব্যবহার করবে তা নাপাক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুক আর পাক উদ্দেশ্যে, সে-ই সফলকাম হবে। পাক উদ্দেশ্য পোষণকারী যদি তার উদ্দেশ্যের পবিত্রতা নিয়ে শুধু বসেই থাকে আর তরবারি ব্যবহার না করে, তবে

১. বর্তমানকালের টেলিভিশনের বেলায়ও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। – সম্পাদক

তা হবে তার গুরুতর অপরাধ এবং সে অপরাধের শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। কারণ, এই কার্যকারণের জগতে আল্লাহর প্রবর্তিত বিধানকে কারো মুখ চেয়েই বদলানো যেতে পারেনা।

এই ব্যাখ্যা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আমি যে আন্দোলনটি পেশ করতে যাচ্ছি, তা কোনো প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন নয়, কিংবা এমন কোনো প্রগতিশীল আন্দোলনও নয়, যার লক্ষ্য শুধু বৈষয়িক উন্নতি লাভ করা। আমার সামনে যে ট্রেনিংকেন্দ্র রয়েছে তার জন্যে গোকল কাংড়ী[১], সত্যাগ্রহ আশ্রম, শান্তিনিকেতন কিংবা দয়াল বাগে[২] কোনো আদর্শ নেই। এমনিভাবে যে বিপ্লবী দলের ধারণা আমি পোষণ করি, তার জন্যে ইটালীর ফ্যাসিস্ট এবং জার্মানীর ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টিতেও কোনো আদর্শ নেই। তার জন্যে আদর্শ রয়েছে শুধুমাত্র মদীনাতুর রসূল এবং নবী আরাবী স. কর্তৃক গঠিত 'হিজবুল্লাহ'র (আল্লাহর দলের) মধ্যে।

সমাপ্ত

---

২ ও ৩. এগুলো হিন্দুদের আশ্রম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। – সম্পাদক